সমীক্ষা

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

পাঁচ টাকা

মিত্র ও ঘোষ, ১০ নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীভানু রায় কর্তৃক
প্রকাশিত ও নিউ মহামায়া প্রেস, ৬৫।৭, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে
শ্রীঅবনীরঞ্জন মান্না কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনবিহাবী ভট্টাচার্যেব সাহিত্যানুশীলনেব পবিধি সুবিস্তৃত। ভাষাতত্ত্ব হইতে বসতত্ত্ব পর্যন্ত তাঁহাব সতেজ লেখনী স্বচ্ছন্দে সঞ্চবণ কবে, ইবানেব পুবাতত্ত্ব ও গুজবাটেব সাহিত্যকথা তিনি এক নিঃশ্বাসেই বলেন এবং বিশেষজ্ঞেব অধিকাব লইয়াই বলেন, পল্লীর ব্রতানুষ্ঠান দেখিতে দেখিতে ব্রতকথা শুনিতে শুনিতে তাঁহাব চক্ষু কর্ণ মন ভূগোলেব সীমা অতিক্রম কবিযা অবলীলাক্রমে বাজ্য হইতে বাজ্যান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়, ভানুসিংহেব পদাবলী পাঠ শেষ হইতে না হইতেই তিনি পবীক্ষক রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নপত্রেব ফাইল খুঁজিতে আবস্ত কবেন। নানা সময়ে লিখিত বিবিধ পত্রিকায প্রকাশিত যে অজস্র রচনাব মধ্য দিয়া লেখকের এই সর্বতোমুখী বহস্যানুসন্ধিৎসাব পবিচয পাই, তাহাবই কয়েকটি বাছাই কবিযা এই গ্রন্থে প্রকাশ কবা হইল।

—প্রকাশক

সূচীপত্র

ব্রতের ফল

সৃষ্টির প্রথম মন্ত্র, আমরা চাই। পৃথিবীর জন্মকাল হইতে সেই যে চাওয়া আরম্ভ হইয়াছে তাহার আর শেষ নাই। জগৎ গতিহারা হইবার পূর্বে কামনার মৃত্যু হইবে না।

ভূমিষ্ঠ হইয়াই মানুষ 'দেহি দেহি' রব তুলিয়াছে। প্রথমে সে অপরের কাছে চায়, না পাইলে যুদ্ধ করে। যুদ্ধেও যখন ফল ফলে না তখন আর কি করে? তখন সে তাহার অপরিতৃপ্ত পিপাসা, পুঞ্জীভূত আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ের অনির্বাপিত বেদনা সমস্তই দেবতার চরণে উৎসর্গ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়। তখন সে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে;—আয়ু দাও, যশ দাও, ভাগ্য দাও।

নিরুপায় নিরাশ্রয় হইলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা সকলেই করে। আবার যে যত দুর্বল, যে যত অসহায় তাহারই বিশ্বাস তত গভীর, তাহারই প্রার্থনা তত করুণ তত মর্মস্পর্শী। তাই দেখি ব্রত ও ব্রতকথা—এ দুইটি একান্তভাবে নারীজাতিরই সম্পত্তি। সহায়-সম্বলহীন নারীজাতিই ইহাদের জন্ম দিয়াছেন, তাঁহাদের হাতেই ইহারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালার ব্রতকথাগুলির মধ্যে আছে বাঙ্গালা দেশের প্রতিচ্ছবি। পটুয়ার পটের মত এক-একটি ব্রতকথা আমাদের চক্ষুর সম্মুখে এক-একটি গ্রাম্য চিত্র ধরিয়া দেয়। তাহাতে একদিকে দেখিতে পাই দেবীরূপে বাঙ্গালী মাতার অপার সন্তান-বাৎসল্য, বাঙ্গালী-ভগিনীর অপরিমেয় ভ্রাতৃস্নেহ; আবার অন্যদিকে দেখা যায় রাক্ষসী রূপে বাঙ্গালী বিমাতার নৃশংস আচরণ, বাঙ্গালী সপত্নীর অমানুষিক নিষ্ঠুরতা। এক দিকে দেখি—"আমার ভাই গাঁয়ের সোনা" "বাপমার ধন যাচাযাচি", অন্যদিকে দেখি—"তাল গাছেতে বাবুই বাসা। সতীন মরে দেখতে খাসা॥" "থুতকুড়ি থুতকুড়ি। সতীন বেটি আঁটকুড়ি॥"

ব্রত ও ব্রতকথা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ব্রতের অনুষ্ঠান ও ব্রতকথার মধ্য দিয়া তৎকালীন বঙ্গীয় রমণীসমাজের মনোজগতের যে পরিচয়টি পাওয়া যায়, তাহার সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করিব।

সে যুগের বাঙ্গালী মেয়েদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশা আকাঙ্ক্ষার কথা এই ব্রতকথাগুলির মধ্যে জলন্ত অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। এ যুগের নবীনারাও নিজ নিজ রুচির মানদণ্ডে ফেলিয়া তাঁহাদিগকে বিচার করিয়া দেখিতে পারিবেন।

কোন্ কোন্ ব্রতে কি কি কামনা প্রকাশ পাইয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইল।

সেঁজুতি

এটি কুমারীদের ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের পয়লা হইতে সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রত্যহ বিকালে মেজের উপর আলিপনা দিয়া শিব ঠাকুর, দোলা, গুয়াগাছ, অশ্বত্থগাছ প্রভৃতির চিত্র আঁকিয়া অঙ্কিত চিত্রগুলি পূজা করা হয়। এই পূজার মন্ত্রে কুমারীমনের কি কি কামনার পরিচয় পাওয়া যায়, দেখা যাউক।

প্রথম মন্ত্রে কুমারী পিতা-মাতার ধন ও পুত্র প্রার্থনা করিয়া দেবী সন্ধ্যাবতীকে আরাধনা করিতেছেন :

"বর্তি হয়ে মাগি বর।
ধনে পুত্রে বাপ মার ঘর॥"

অবিবাহিতা কুমারী। তাহার শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি পিতামাতাকে ছাড়াইয়া তখনও আর কোথাও যাইতে পারে নাই। সখীর পরিহাসে, সঙ্গিনীর রহস্যালাপে, প্রতিবেশিনীর পরিণয়ে তাহার মনে যে অতি অস্পষ্ট অথচ পরম সুন্দর একটি মুখের ছায়া পড়ে না এমন নহে। কিন্তু তথাপি তাহা ছায়া। বস্তুজগৎ হইতে সে কিছু দূরে। সুতরাং দেবতার কাছে প্রথম প্রার্থনা পাঠান হইল পিতামাতার উদ্দেশ্যে।

অন্যত্র সুপারি গাছের নিকটে পিতার দিল্লীশ্বরত্ব এবং ভ্রাতার রাজত্ব প্রার্থনা করিয়া কন্যা বলেন :

"গুয়া গাছ সুপারি গাছ মুঠিয়ে ধরে মাজা।
বাপ হয়েছে দিল্লীশ্বর, ভাই হয়েছে রাজা॥"

আরও কয়েকটি ছড়া পিতা ও ভ্রাতার কল্যাণেই রচিত দেখা যায়। কয়েকটি উদ্ধৃত করি।

"বাঁশের কোড়া, রূপের মোড়া।
বাপ রাজা ভাই প্রজা॥"
"যতগুলি নক্ষত্র ততগুলি ভাই।
বসোয়া পূজা করে ঘরে ফিরে যাই॥"
"ইন্দ্র পূজি জুড়ু হয়ে।
সাত ভাইয়ের বোন হয়ে।
সাবিত্রী সমান হয়ে।"

শরগাছকে সম্বোধন করিয়া বোন বলিতেছেন :

"শর শর শর।
আমার ভাই গাঁয়ের বর॥"

এরূপ "বেনা বেনা বেনা।
আমার ভাই গাঁয়ের সোনা॥"

অন্যত্র "আম কাঁটালের পিঁড়িখানি, গা ঝর্‌ঝর্ করে।
আমার ভাই (ভ্রাতার নাম), সে বসতে পারে॥"

তাহার পর শিবকে আহ্বান করিয়া বলা হইল :

"হে হর শঙ্কর দিনকর নাথং।
কখনো না পড়ি যেন মূর্খের হাতং॥"

নবীনা পাঠিকারা ব্যাকরণদোষ ধরিবেন না। মন্ত্রের গুরুত্ব বাড়াইবার জন্য তাঁহাদের প্রপিতামহীগণ যদি বাল্যকালে বাংলা মন্ত্রে অনুস্বর দুই একটা যোগ করিয়াই থাকেন শিক্ষিতা প্রপৌত্রীসম্প্রদায় বোধ হয় তাহা করুণার চোখেই দেখিবেন। কিন্তু সে কথা এখন থাক্।

পিতা-মাতার বিপুল সৌভাগ্য ও অতুল ঐশ্বর্যের কথা জানাইয়া এবার নিজের দিকে দৃষ্টি দিবার সময় আসিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী মেয়ের নিজের বলিতে আর কি আছে? সে নিজে তো একটা ধর্তব্য বস্তুর মধ্যেই গণ্য নয়। তাহার সুখ দুঃখ, তাহার আনন্দ বিষাদ, তাহার বলিতে যাহা কিছু সবই নির্ভর করে স্বামীর উপর। তাই বাঙ্গালার কুমারী শিবপূজা করিয়া ভাল বর প্রার্থনা করে। আমাদের সেঁজুতি-পূজারিনীও এমন বর প্রার্থনা করিতেছেন যাহার পেটে কিছু বিদ্যা আছে।

তাহার পর কন্যা প্রার্থনা করিলেন, তাঁহাকে যেন পায়ে হাঁটিয়া কোনো দিন পিতৃগৃহ ও শ্বশুরালয় যাতায়াত করিতে না হয়। তাঁহার 'বাপের বাড়ীর দোলা-খানি' চড়িয়াই যেন তিনি শ্বশুরবাড়ী যাইতে পারেন এবং তাঁহাকে বহন করিবার মান্যস্বরূপে দোলাখানির জন্যও যেন ঘৃত মধুর ব্যবস্থা করা হয়।

"বাপের বাড়ীর দোলাখানি শ্বশুরবাড়ী যায়।
আসতে যেতে দোলাখানি ঘৃত মধু খায়॥"

তাঁহার প্রসাধনের ডালায় যে দর্পণ থাকিবে তাহা স্বর্ণনির্মিত হওয়া চাই :

"দোলায় আসি দোলায় যাই।
সোনার দর্পণে মুখ চাই॥"

দর্পণপূজার একটি মন্ত্র স্থানান্তরে আছে :

"দর্পনাশী দর্পণে চায়।
সোনার দর্পণে মুখ চায়॥"

সেঁজুতি-পূজারিনীর মনে অপরের দর্পনাশ করিবার ইচ্ছাও প্রচ্ছন্ন আছে। এই দর্প যে রূপ সম্বন্ধে তাহা বেশ অনুমান করা যায়, যেহেতু দর্পণ প্রসঙ্গে ইহার কথা উঠিয়াছে।

পরবর্তী মন্ত্রে কুমারী কোঁড়ার মাথায় মৌ, ঘি ও মধু ঢালিয়া যথাক্রমে রাজার বৌ, রাজার ঝি এবং রাজার বধূ হইবার প্রার্থনা জানাইতেছেন :

"কোঁড়ার মাথায় ঢালি মৌ, আমি যেন হই রাজার বৌ।"
"কোঁড়ার মাথায় ঢালি ঘি, আমি যেন হই রাজার ঝি।"
"কোঁড়ার মাথায় ঢালি মধু, আমি যেন হই রাজার বধূ।"

কোনো কোনো অঞ্চলে কোঁড়ার মাথায় ফুল দিয়া সৃষ্টি সংসার 'ফুল থুল' করিবার প্রার্থনা আছে।

এইবার সপত্নীপ্রীতির নিদর্শন :

"অশথ্ তলায় বাস করি।
সতীন কেটে নির্মূল করি॥"

"সাত সতীনের সাত কৌটা।
তার মাঝে আমার এক অব্ভরের কৌটা।
অব্ভরের কৌটা নাড়ি চাড়ি।
সাত সতীনকে পুড়িয়ে মারি॥"

অশ্বত্থ বৃক্ষের নিকট সাত সতীনের স্বর্গবাস কামনা করিয়া কুলগাছকে বলা হইতেছে:

"কুলগাছটি ঝাঁকড়ি।
সতীন বেটি মাকড়ি॥"

বলিয়া রাখি, এখানে মাকড়ি শব্দ কর্ণাভরণ অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। মর্কট শব্দের অর্থ পাঠক-পাঠিকার অবশ্য জানা আছে।

অনন্তর পাখীকে ডাকিয়া কুমারী আপনার মনের গোপন অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন।

"পাখী পাখী পাখী।
সতীনকে গঙ্গায় নিয়ে যায়
আমি খাটে বসে দেখি॥"

সতীনের গঙ্গাযাত্রা খাটে বসিয়া দেখার মধ্যে আনন্দ যতই থাকুক অসপত্ন জীবনের যে অনাবিল শান্তি তাহার অপেক্ষা মধুরতর তো আর কিছুই হইতে পারে না। তাই ময়নাকে ডাকিয়া কন্যা বলেন:

"ময়না ময়না ময়না।
সতীন যেন হয় না॥"

ময়নার কাছে যতই আবেদন করা হউক মনের মধ্যে এ ধারণা অত্যন্ত বলবতীই আছে যে সতীন না হইয়া যায় না। সুতরাং তাঁহার সুমিষ্ট মস্তকটির দুই একজন খাদক পূর্বাহ্নেই সংগ্রহ করিয়া রাখা আবশ্যক। অতএব হাতাকে ডাকিয়া বলা হইল:

"হাতা হাতা হাতা।
খা সতীনের মাথা॥"

"উৎবেরালী উৎ যা।
স্বামী রেখে সতীন খা॥"

এই অনুরোধ উপরোধগুলি সমাপন করিয়াও বিপদের আশঙ্কা কমিল না। কি জানি হয়ত অপরের মৃত্যু কামনা করায় হাতা এবং উৎবেরালী তাহার ঈর্ষ্যাকুটিল মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়া অসন্তুষ্ট হইতে পারে। তাই অপেক্ষাকৃত লঘু শাস্তির প্রার্থনা জানান হইল। শাস্তি অবশ্য বিনাদোষেই।

"থুৎকুড়ি থুৎকুড়ি।
সতীন বেটী আঁটকুড়ি॥"

কন্যার একথা ভালরকমই জানা আছে যে বন্ধ্যাত্ব ও মৃত্যু রমণীর পক্ষে একই কথা। বন্ধ্যা রমণী স্বামী এবং শ্বশুর-শাশুডীর বিরাগভাজন হইবেই। তাহা হইলেই কার্যসিদ্ধি।

আর কতকগুলি ছড়া আছে ভাবী স্বামীর জন্য প্রার্থনাই সেগুলির বিষয়। অবশ্য স্বামীর প্রসঙ্গে শ্বশুর-শাশুড়ীর এবং অন্যান্য দুই একজন আত্মীয়-আত্মীয়ার নামও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। একটিতে বিধাতাপুরুষকে সম্বোধন করিয়া কন্যা বলিতেছেন:

"ধাতা কাতা বিধাতা তুমি যাও ঘর।
আমার জন্য খুঁজে রাখ সভাসুন্দর বর।"

মহাদেবকেও একবার বলা হইয়াছে:

"হে হর মাগি বর।
স্বামী হোক রাজ্যেশ্বর॥
সতীন হোক দাসী।
বছর অন্তর একবার করে বাপের বাড়ী আসি॥"

অন্যত্র

"আমসত্ত্ব পাকা পান।
আমার সোয়ামী নারায়ণ॥"

স্বামীর প্রেমই নারীজীবনের একমাত্র অবলম্বন। তাহা না হইলে রূপ যৌবন ঐশ্বর্য সবই নিষ্ফল।

"খাট পালঙ্ক লেপ দোলজ
গির্দে আশে পাশে।
রূপ যৌবন সদাই সুখী
স্বামী ভাল বাসে॥"

শেষ চরণে বোধ হয় একটি 'যদি' উহ্য আছে।

বিষয় অনুযায়ী ছড়াগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। শেষ ভাগে বিবিধ বিষয়ের ছড়া থাকিবে। অন্যান্য বিষয়ের সহিত এই ভাগে থাকিবে কুমারীর নিজের জন্য যে যে জিনিসের প্রয়োজন এবং আকাঙ্ক্ষা তাহারই একটি নাতিবৃহৎ তালিকা।

প্রথমে ধরা যাউক রান্নাঘর পূজার মন্ত্রটি :

"রান্নাঘর পুজ্যন।
সোনার থালে ভোজ্যন॥
সোনার থালে ক্ষীরের নাড়ু।
শাঁখের আগে সুবর্ণের খাড়ু॥"

সরলা বালিকা রান্নাঘর 'পুজ্যন' করিয়াই সোনার থালায় 'ভোজ্যন' করিবার আশা মনে পোষণ করিয়া রাখে। শুধু রান্নাঘর নয় গোয়াল ঘর 'পুজ্যন' করিয়া বালিকা গোয়াল ঘরকেও ঐরূপ বর প্রার্থনা করে। সোনার থালে ভোজন করাই সে কালের কুমারীগণ সৌভাগ্যের চূড়ান্ত বলিয়া মনে করিত। ক্ষীরের নাড়ুই ছিল তাহাদের রসনা তৃপ্তির পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ আহার্য। আর শঙ্খবলয়ের সম্মুখ ভাগে একখানি সুবর্ণের খাড়ু—অলঙ্কার সম্বন্ধে ইহার অধিক প্রার্থনা করা বোধ করি তাহারা অনাবশ্যক জ্ঞান করিত। আরও দুই এক স্থানে গহনার কথা শুনি বটে কিন্তু অলঙ্কারের আড়ম্বর কোথাও নাই। এক স্থলে সোনার গহনার আশায় কুমারী দেবতাকে পিঠুলির গহনা উৎকোচ দিতেছেন দেখিতে পাই।

"আমি দিই পিঠুলির শাঁখা।
আমার হোক সুবর্ণের শাঁখা॥"

পানের বাটা বাঙ্গালী গৃহস্থের একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় তৈজস। কাজেই পিঠুলির বাটা দিয়া দেবতাকে বলিয়া রাখা হইল, "আমার হোক সুবর্ণের বাটা।"

ইহা ছাড়া ধান আছে, ঢেঁকি আছে, গাই আছে, চন্দনের বাটি আছে, পাটের কাপড় আছে, খাট পালং আছে—ঘর করিতে হইলে এরকম নানা জিনিসেরই দরকার। সেঁজুতির ব্রতে এ-রকম অনেক বস্তুর খবর পাই।

"ঢেঁকি পড়ন্ত।
গাই বিয়ন্ত।
উনুন জলন্ত।
কালো ধানে রাঙা পুতে।
জন্ম যায় যেন এয়োস্ত্রীতে॥"

এই সকল ছড়ার অধিকাংশই "এয়োস্ত্রী" থাকিবার কামনায় পূর্ণ। বৈধব্যটাই যে জীবনের পরমতম দুঃখ, ইহা তাহারা শৈশবেই উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে। তাই তাহাদের সকল চাওয়ার বড় চাওয়া—হাতের শঙ্খ সীমন্তের সিন্দুর।

"আতাপাতা কুলদেবতা।
সিঁতেয় সিঁদুর পায়ে আলতা॥"
"পাড়া পড়শি প্রতিবাসী মৌ বর্ষে মুখে।
জন্ম এয়োস্ত্রী পুত্রবতী জন্ম যায় সুখে॥"

সে যুগের বাঙ্গালীর সম্পত্তি ছিল ধান এবং আয়রনচেস্ট ছিল মরাই ও গোলা। সেঁজুতির পূজারিনী তাই পিঠুলির গোলা আঁকিয়া বলিলেন:

"আমি দিই পিঠুলির গোলা।
আমার হোক সত্যিকারের গোলা॥"

রূপের জন্য প্রার্থনা এখানে সেখানে দেখা যায় বটে, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণে "তিলফুল জিনি নাসা" বা "গৃধিনী জিনিয়া কর্ণ" চাহিতে তেমন দেখা যায় না। ব্রতচারিণী বড় জোর চাহিয়াছেন:

"ঘট্টা ডুমুরের মত কাঁকালখানি।
হই যেন স্বামী-সোহাগিনী॥"

এই ডুমুরের সহিত উড়ুম্বর ফলের কোনো সম্পর্ক নাই। এ-ডুমুর ডমরুর রূপান্তর। ঘট্টা অবশ্যই ঘট্ট হইতে আসিয়াছে। ঘট্ট শব্দের অভিধানধৃত একটি অর্থ—গিরিসঙ্কট, পর্বতের মধ্যস্থ সংকীর্ণ পথ। ক্ষীণ কটির সহিত উপমায় উভয় শব্দেরই সার্থকতা আছে।

একটি ছড়ায় দেখি, সেঁজুতির পূজারিনী জন্মসুখী হইতে অভিলাষী হইয়া শুয়া পাখীকে নিবেদন করিতেছেন :

"শুয়া পাখী শুয়া পাখী।
আমি যেন হই জন্মসুখী ॥"

আর একটি ছড়ায় হিন্দুকন্যার এক অদ্ভুত প্রার্থনা শুনিয়া বিস্মিত হইতে হয়। পরে যখন ভাবিয়া দেখি যে ছড়াগুলি দুই একদিনেই সমগ্র দেশে প্রচারিত হয় নাই, যখন বুঝি যে একাধিক শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালী রমণীর বাল্য কৈশোর ও যৌবনের সাহচর্য লাভে ইহারা পরিপুষ্ট হইয়াছে, যখন বুঝিতে পারি যে মুসলমান রাজত্ব কালেই এই ব্রতগুলির মধ্যে কোনো কোনোটির উৎপত্তি হওয়া খুবই সম্ভব এবং স্বাভাবিক, তখন আর বিস্ময়ের কোনো কারণ থাকে না। ছড়াটি এই :

"আরশি, আরশি, আরশি।
আমার স্বামী পড়ুক ফারসি ॥"

আদর্শ স্বামী কে? আদর্শ শ্বশুর কে? আদর্শ দেবর কে? কুমারীর অর্চনামন্ত্রে তাহার উত্তর পাইবেন।

"রামের মত পতি পাব।
সীতার মত সতী হব।
লক্ষ্মণের মত দেবর পাব।
কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাব।
কুন্তীর মত পুত্রবতী হব।
দ্রৌপদীর মত রাঁধুনি হব।

দুর্গার মত সোহাগী হব।
ষষ্ঠীর মত জেঁওন হব।"

বাঙ্গালী মেয়ে জ্ঞান হইতে না হইতে রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনিয়া পৌরাণিক নর-নারী ও দেব-দেবীর আদর্শে নিজেদের সংসার গড়িতে চাহিত। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছড়াগুলি তাহার নিদর্শন।

পুত্র ও সুখের কামনা করিয়া কন্যা বলেন:

"হাতে পো কাঁখে পো।
পৃথিবীতে পড়ে নি যেন চক্ষের লো॥"

বঙ্গের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে বর্তমান কালেও নি ব্যবহৃত হয়। 'পড়ে নি' ইহার অর্থ 'পড়ে না'।

সপত্নীর মোহে স্বামী হয়তো ভুলিয়া যাইতে পারেন। সে জন্য আমসত্বের ন্যায় পুরু ও রক্তবর্ণ যে পাকা পান তাহাকে অনুরোধ করিয়া রাখা হইয়াছে যে কন্যার জীবনে সেই দারুণ দুঃসময় যদি কখনও আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে পাকা পানটি যেন দুর্ভাগিনীর কথা স্বামীকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

"আমসত্ব পাকা পান।
আমার সোয়ামী নারায়ণ॥
যদি যান পাস্তরে।
তবে দিও স্মুরে॥"

এই পূজার শেষ মন্ত্রটির দ্বারা "কুঁচকুঁচুতি" দেবীর পূজা হয়। এই মন্ত্রে কুঁচকুঁচুতি পূজারিনীর পিতামহী বা মাতামহী রূপে কল্পিত হন। মন্ত্রটি আর কিছুই নহে দিদিমা ও নাতি-নাতিনীর প্রশ্নোত্তর। দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন: নাতিনী, এত বেলা হইল কেন? নাতিনী উত্তর করিলেন: ছালা ছালা মোহর, ছালা ছালা টাকা, ছালা ছালা ধান-চাল এই সমস্ত আসিল। সেই সকল মাপিয়া জুখিয়া রাখিতে বেলা হইয়া গেল। বালিকা এতক্ষণ ধরিয়া যাহা কিছু চাহিয়াছিল তাহার অনেক কিছু যেন পাইয়া গিয়াছে। ইহাই বোধ হয় এই মন্ত্রের অর্থ। পাউক বা না পাউক পূজার শেষে পাইয়াছি বলার আনন্দেই কুমারীচিত্ত পূর্ণ হইয়া যায়। মন্ত্রটি এই:

"কুঁচকুঁচুতি কুঁচুই বন, কেন রে নাতি এতক্ষণ।
মোহর এল ছালা ছালা, তাই তুলতে এত বেলা।
টাকা এল ছালা ছালা, তাই তুলতে এত বেলা।" ইত্যাদি।

কুঁচকুঁচুতি কোন দেবী তাহা আবিষ্কার করিতে পারি নাই। ইঁহার নামে যে আলিপনা দেওয়া হয় তাহা হইতেও কিছু সাহায্য পাইলাম না। সম্ভবতঃ কুঁচফলের গাছই কন্যার লক্ষ্য, ছড়ার প্রথম চরণে বন শব্দটি থাকায় ঐ ধারণাই বলবতী হয়।

তুঁষতুঁষুলি

অগ্রহায়ণের সংক্রান্তিতে সেঁজুতির ব্রত শেষ হয়। ঐ দিন হইতেই তুঁষতুঁষুলির পূজা আরম্ভ। এ-পূজাও পৌষের শেষ পর্যন্ত চলে। পূজার পদ্ধতি বর্তমান আলোচনার বিষয় নয়। এখানে কেবল মন্ত্রগুলি তুলিয়া দেখিব কুমারীগণ সে যুগে দেবতার নিকট বা দেবতাজ্ঞানে গাছ-পালা, হাতা-খুন্তি প্রভৃতিকে পূজা করিয়া তাহাদের নিকট কি কি প্রার্থনা জানাইত। সেঁজুতির ন্যায় এ ব্রতেও পিতা মাতা ভ্রাতা ও স্বামীর সুখের জন্য নিবেদন আছে। ব্রতচারিণী 'দরবার-শোভা বেটা' চাহিয়াছেন, উপরন্তু চাহিয়াছেন 'রূপকৌটা ঝি' এবং 'সভা-আলো জামাই'। এ-ব্রতে ব্রতীদের ভক্তির পরিমাণ যেন কিছু বাড়িয়া যায়। কারণ তুঁষতুঁষুলি পূজার ফল হাতে হাতেই ফলিতে আরম্ভ হয়। পূজা শেষ হইলেই 'ছবড়ি ছটা' (ছ-বুড়ি ছ-টা) ক্ষীরের নাড়ু প্রসাদ পাওয়া যায়। তুঁষুলির মন্ত্রে বাঙ্গালী মেয়ের ঘরকরনার একটি অপরূপ আদর্শ দেখিতে পাই।

তুঁষতুঁষুলি কাঁধে ছাতি।
বাপ-মার ধন যাচাযাচি।
স্বামীর ধন নিজ পতি॥
ঘর করব নগরে।
মরব গিয়ে সাগরে।
জন্মাব উত্তম কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে॥
তুঁষলি গো রাই।
তুঁষলি গো মাই।

তোমায় পূজিয়ে আমি কি বর পাই ॥
অমর গুরু বাপ চাই।
ধনসাগুরে মা চাই।
রাজ্যেশ্বর স্বামী চাই ॥
সভা-আলো জামাই চাই।
সভাপণ্ডিত ভাই চাই ॥
দরবার শোভা বেটা চাই
রূপকৌটা ঝি চাই ॥
সিঁতের সিঁদুর দপ্ দপ করে।
হাতের নোয়া ঝক্ ঝক্ করে।
আলনার কাপড় টল্‌মল্ করে ॥
সিঁতেয় সিঁদুর মরায়ে ধান।
সেই যুবতী এই বর চান ॥

তুঁষলি গো রাই, তুঁষলি গো মাই।
তোমায় পূজিয়ে আমি ছ-বড়ি ছটা খাই ॥
ছ-বড়ি ছটা ক্ষীরের নাড়ু।
শাঁখার আগে সুবর্ণের খাড়ু ॥

ইহার পর তুঁষুলি ভাসানমন্ত্র আছে কিন্তু তাহার মধ্যে নূতনত্ব বিশেষ কিছু নাই বলিয়া সে মন্ত্র আর উদ্ধৃত করিলাম না।

যমপুকুর

যমপুকুর পূজার যে মন্ত্রটি শুনিতে পাই তাহাতে পিতা ও ভ্রাতার ঐশ্বর্যবৃদ্ধির কামনা আছে।

মারণ পক্ষী শুকোর বিল।
রূপার কৌটা সোনার খিল ॥
খিল খুলতে লাগল ছড়।
আমার বাপ ভাই হোক লক্ষেশ্বর ॥

ঐশ্বর্যের সঙ্গে বংশবৃদ্ধির প্রার্থনাও আছে।

"লক্ষ লক্ষ দিলে বর।
ধনে পুত্রে বাড়ুক ঘর॥"

এই ব্রতের একটি ব্রতকথাও আছে। ব্রতকথা হইতে বুঝা যায় যে এই ব্রত করিলে ইহকালে পরম সুখ এবং অন্তিমে নরকযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমাদের দেশের মেয়েরা কিছু দিন আগে বাল্য বয়সেই অন্তিমের ভাবনা ভাবিতে শিখিয়াছিল। এ প্রসঙ্গে কুমারীদের তুলসী পূজার মন্ত্রটি না তুলিয়া পারিলাম না। তাহাতেও অন্তিমের ভাবনার প্রমাণ আছে।

"……তোমার শিরে ঢালি জল।
অন্তিম কালে দিও স্থান॥"

পুণ্যিপুকুর

এই ব্রতের মন্ত্রটি প্রশ্নোত্তরের আকারে। প্রশ্ন হইল, "দুপুর বেলা কে পূজা করে?" উত্তর হইল—"আমি সতী লীলাবতী। সাত ভায়ের বোন ভাগ্যবতী॥" আবার প্রশ্ন হইল, "এ পূজনে কি হয়?" এবার উত্তরটি একটু বড়। কারণ, এই পূজা করিয়া কুমারী যাহা যাহা কামনা করেন, পূজার ফল স্বরূপে সেইগুলিই প্রকাশ করিয়াছেন। কাজেই তালিকাটি দুই কথায় শেষ হয় নাই। উত্তর হইল:

"নির্ধনীর ধন হয়।
সাবিত্রী সমান হয়।
স্বামী-আদরিনী হয়॥
স্বামীর কোলে পুত্র দোলে।
মরণ হয় তার একগলা গঙ্গাজলে॥"

ইহাতেও দেখা যায়—প্রচুর ধন, বহু ভ্রাতা, সাবিত্রীর ন্যায় পাতিব্রত্য, স্বামীর প্রীতি প্রভৃতির সঙ্গে একগলা গঙ্গাজলে মরণ কামনাও আছে।

হরির চরণ

হরির চরণ পূজার মন্ত্রে আছে—যে যুবতী এই ব্রত গ্রহণ করেন তিনি চান রাজ্যেশ্বর স্বামী, দরবার-জোড়া পুত্র, সভাসুন্দর জামাই, সর্বসুন্দরী কন্যা। তাহা ছাড়া ধান, গরু, কাপড়, বাসন এ-সকলও চান। তিনি যেন জীবনে কোনো শোক না পান। তাঁহাকে স্বামীপুত্রের এবং বন্ধুবান্ধবের মৃত্যু যেন না দেখিতে হয়। এ মন্ত্রটিও প্রশ্নোত্তরের আকারে।

"আজ কেন গো শীতল পা।
কোন্ যুবতী পুজে পা।
সে যুবতী কি চায়?"

উত্তর: "রাজ্যেশ্বর স্বামী চায়।
দরবারজোড়া বেটা চায়।
সভাসুন্দর জামাই চায়।
ঘরনী গৃহিণী বউ চায়।"

সবটা উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক কারণ এই মন্ত্রের অন্তর্বর্তী কামনাগুলি "সেঁজুতি" "যমপুকুর" প্রভৃতি পূজাতেও পাওয়া গিয়াছে। ইহার শেষছত্রে আছে:

"এক-হাঁটু গঙ্গার জলে ম'রে পায় যেন শ্রীহরির চরণ।"

এখানেও দেখি সেই অন্তিমের ভাবনা।

আশুদ (অশ্বত্থ) পাতা

ইহার মন্ত্রও প্রশ্নোত্তরের আকারের।

"হর বলেন গৌরীকে;—এ ব্রত করলে কি হয়?" ভগবতী উত্তর দেন: "পাকা পাতাটি মাথায় দিলে পাকা চুলে সিঁদুর পরে। কাঁচা পাতাটি মাথায় দিলে কাঞ্চনমূর্তি হয়। নবীন পাতাটি মাথায় দিলে নবকুমার কোলে হয়। শুকনো পাতা মাথায় দিলে সুখ ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়। ছেঁড়া পাতাটি মাথায় দিলে হীরা মুক্তার ঝুরি পায়। উজাইতে পারলে ইন্দ্রের শচী হয়, না পারলে ভগবানের দাসী হয়।" ইহাতে দেখি আর সবই আছে।

বেশির ভাগ—হীরা মুক্তার ঝুরি পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া ইন্দ্রের শচী হইবার সম্ভাবনাও আছে। ব্রত উদ্‌যাপন করিতে না পারিলে সে সম্ভাবনাটা লোপ পায় কিন্তু ভগবানের দাসী হওয়া আটকায় না।

পৃথিবী ব্রত

এ-ব্রতে 'রাজার রাণী' হইবার প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুই নাই।

"খাওয়াব ক্ষীর মাখাব ননী।
আমি যেন হই রাজার রাণী॥"

গোকাল ব্রত

ইহাতে আছে কেবল স্বর্গবাসের প্রার্থনা।

"গরুর মুখে দিয়ে ঘাস
আমার যেন হয় স্বর্গে বাস॥"

দশপুতুল

হিন্দু জন্মান্তরে বিশ্বাস করে। তাহার ধারণা মানবজন্মই শ্রেষ্ঠ জন্ম। বহু পুণ্যের ফলে জীব মনুষ্য হইয়া জন্ম লয়। কুমারী তাই কামনা করিতেছেন:

"মরিয়া মনুষ্য হব।
রামের মত পতি পাব।
মরিয়া মনুষ্য হব।
সীতার মত সতী হব।"

এই রকম দশটি মন্ত্রে দশ রকমের প্রার্থনা আছে। সেঁজুতির ব্রতের মধ্যেও দশ পুতুল পূজার নিয়ম আছে। তাহার মন্ত্রও প্রায় এক রকম।

জয়মঙ্গল বা মঙ্গলচণ্ডী

এই ব্রতে সেঁজুতি প্রভৃতি ব্রতের ন্যায় কোনো নির্দিষ্ট মন্ত্র নাই। তবে উহার ব্রতকথা হইতে পূজার ফল জানা যায়। পূজার ফল অনেক: "হারালে পাওয়া যায়, মরলে জিযানো যায়, খাঁড়ায় কাটে না, আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না, সতীন মেরে সব হয়, রাজা মেরে রাজ্য পায়।"

জষ্টিচাঁপা

এ ব্রত কেবল বিবাহিত মেয়েদের জন্যই। ব্রতের উদ্দেশ্য—সুখ, শান্তি, স্বতন্ত্র শয্যা, নিসতা ঘর, মহাদেবের ন্যায় স্বামী লাভ।

"চাঁপা চন্দনে পূজলাম হার।
শোক দুঃখ না পান নারী॥
স্বতন্ত্র শয্যে নিসতা ঘর।
শঙ্কর স্বামী অক্ষয় অমর॥
এই কথা বলো শ্রীমধুসূদনের পায়।
(নিজের নাম) ব্রত করে, শিব মাথায় নিয়ে যায়॥"

ফলগছান

এই ব্রতের ফল পুত্রলাভ।

নিত্যিসিঁদুর

এই ব্রত করিলে পাকা মাথায় সিঁদুর পরিবার সৌভাগ্য হয়। হাতের নোয়াখাড়ু অক্ষয় হয়। স্বামী-পুত্রের সম্মুখে একগলা গঙ্গাজলে মৃত্যু হয়।

অক্ষয়সিঁদুর

ইহার ফলও নিত্যি সিঁদুরের অনুরূপ।

অক্ষয়ঘট

এ ব্রত করিলে পুকুরের জল শুকায় না, মরাই ভরতি ধান থাকে, গোলা ভরতি চাল থাকে, গোয়াল ভরতি গরু থাকে, শোক দুঃখ পায় না, অন্তে স্বর্গবাস হয়।

ছাতুসংক্রান্তি

এই ব্রতের ফলও অক্ষয়ঘটেরই অনুরূপ।

মিষ্টিপূর্ণিমা ও মধুসংক্রান্তি

এ দুইটি ব্রতে প্রার্থনার একটু বিশেষত্ব আছে। কুমারী এই দুইটি ব্রত করিয়া কামনা করেন তাঁহার মুখ যেন মিষ্টি হয়, মুখ দিয়া যেন মধু ঝরে।

সংসার করিতে হইলে মিষ্টি মুখের যে কতখানি প্রয়োজন, তাহা ভুক্তভোগী-মাত্রেই জানেন।

রূপহলুদ, পদ্মপুর্ণিমা এবং নখছুটের ব্রত

এই তিনটি ব্রতের উদ্দেশ্য রূপলাভ। কন্যা রূপহলুদ ব্রত করিয়া স্বর্ণকান্তি এবং পদ্মপুর্ণিমার ব্রত করিয়া পদ্মফুলের ন্যায় মুখশ্রী প্রার্থনা করেন। নখছুটের মন্ত্রে একাধিক প্রার্থনা আছে।

"দুধে-আলতার মত রং হোক।
পানের মত মুখ হোক।
কলার মত আঙ্গুল হোক।
পাটের মত চুল হোক।"

আদর-সিংহাসন

শ্বশুরালয়ে প্রিয়তমের আদর রূপ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারে যে রমণী, সম্রাটের রত্নসিংহাসনও তাহার কাছে অকিঞ্চিৎকর। সেই সৌভাগ্য কামনায় এই ব্রতের অনুষ্ঠান।

তেজদর্পণ

স্বামিগৃহে প্রধানা গৃহিণী হইয়া তেজের সহিত গার্হস্থ্য পরিচালনা করিবার সৌভাগ্য সকল নারীর হয় না, যাহার হয় তাহার শুভাদৃষ্ট। মহর্ষি কণ্ব পতিগৃহ-গমনোন্মুখ শকুন্তলাকে তাই গৃহিণী-পদ লাভের আশীর্বাদ জানাইয়া বিদায় দিয়াছিলেন। ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ রমণীর পক্ষে আর কি হইতে পারে? বাঙ্গালী রমণীর সেই আকাঙ্ক্ষার পরিচয় এই ব্রতে পাওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত অক্ষয় যশ, অনাবিল শান্তি, অনন্ত সৌভাগ্য এবং আজীবন অবৈধব্য লাভের জন্য **বৈশাখী পূর্ণিমা, যাচাপান, ষোলকলা, কলাছড়া, সৌভাগ্য-চতুর্থী, আদাহলুদ, ইতু** প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ব্রতের অনুষ্ঠান বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এখনও দেখা যায়। কিন্তু এগুলির প্রচলন ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে। বলা যায় না আধুনিক সভ্যতার ধাক্কা খাইয়া ইহারা আর কতদিন আপন আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইবে।

নোটন ষষ্ঠী, চাপড়াষষ্ঠী, দুর্গাষষ্ঠী, গোঠষষ্ঠী, পাটাইষষ্ঠী, মূলাষষ্ঠী প্রভৃতি বহু প্রকারের এবং বহু নামের ষষ্ঠীর ব্রতের প্রচলন আছে। ইহাদের কোনোটির বাঙ্গালা মন্ত্র নাই, অন্ততঃ আমি পাই নাই। কোনো কোনো ব্রতে ষষ্ঠী দেবীর সংস্কৃত ধ্যান বলিয়াই পূজা করা হয়, কোনো ব্রতে মন্ত্রের কোনো প্রয়োজনই হয় না।' অনুষ্ঠানাদির দ্বারাই কাজ চলে। নোটন, অরণ্য প্রভৃতি প্রায় সকলপ্রকার ষষ্ঠীর পূজাতেই 'তের ষাট' দেওয়ার পদ্ধতি আছে। এই ষাট ষষ্ঠিরই রূপান্তর। তের ষাটের তেরটি ছড়া। ছড়াগুলি প্রায় এক সমান। যাহাদের নামে ষাট দেওয়া হয় তাহারা বিপদ-আপদে আক্রান্ত হইবে না, দুঃখ শোকে পীড়িত হইবে না, সুখে শান্তিতে তাহাদের জীবন কাটিবে, অকাল মৃত্যু তাহাদের কাছে আসিতে পারিবে না। ষাট দেওয়ার এই উদ্দেশ্য। ষাট দেওয়ার অর্থই ষষ্ঠীকে আহ্বান করা। একটি ষাটের মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

"জষ্টি মাসে অরণ্য ষাট।
ফিরে ঘুরে এলো ষাট।
বার মাসে তের ষাট।
ষাট-ষাট ষাট।
ঝি চাকর গরু বাছুর পশু পক্ষী কর্তা ছেলে মেয়ে
বউ ঝি নাতি নাতনী ষাট ষাট ষাট॥"

ষষ্ঠীপূজার বাঙ্গালা মন্ত্র না থাকুক ব্রতকথা অনেক আছে। ষষ্ঠী ব্রতের মূল উদ্দেশ্য বন্ধ্যা ও মৃতবৎসার সুস্থ ও দীর্ঘায়ু সন্তান লাভ, পুত্রবতীর পুত্রের দীর্ঘ জীবন প্রাপ্তি। ইহা ছাড়া সাংসারিক উন্নতি, মানসিক শান্তি, সুখ, যশ, মান, সম্মান, স্বাস্থ্য পরমায়ু এ সকল পাইবার কামনাও ষষ্ঠী পূজারিনীরা দেবীর চরণে জানাইয়া থাকেন।

ইহা ছাড়া নানারকমের চণ্ডী ও লক্ষ্মীর ব্রত আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। এখনও চণ্ডী লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীর ব্রতকথা গ্রামের প্রাচীনাদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। বর্তমান যুগে এই সকল ছড়া ও ব্রতকথার কোনো মূল্যই নাই, মূল্য যদি কিছু থাকে তো তাহা ভাষাতাত্ত্বিক পুরাতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিকের কাছে। কিন্তু তাঁহাদের নিকটেও কি ইহারা যথাযোগ্য সমাদর লাভ করিয়াছে?

উত্তর পশ্চিম ভারতের গ্রাম্য ছড়া

ভারতের গীতিসাহিত্যের ভাণ্ডারে যে অজস্র মণিমুক্তা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে তাহার কোনো সন্ধান আমরা রাখি না। পুরাতনের নামে ভ্রূকুঞ্চিত করিবার প্রবৃত্তি আরব্যোপন্যাসের দৈত্যের মত এখনও আমাদের অনেকের স্কন্ধে চাপিয়া আছে। হীরকখণ্ডের উপরে মৃত্তিকা লিপ্ত থাকিলে তাহার জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতে পারে না, অজ্ঞ জনসাধারণের কাছে তাহার কোন মূল্য নাই। কিন্তু রত্নখণ্ডটির মালিন্যের অন্তরালে যে উজ্জ্বল দীপ্তি বর্তমান রহিয়াছে অভিজ্ঞ মণিকারের সুনিপুণ দৃষ্টির কাছে তাহা ঢাকা থাকে না। "যমতী, ক্যান্ বা কর মন ভারী। পাবনা থ্যাহে আন্তে দেব ট্যাহা দামের মোটরী।" একটি গ্রাম্য গীতের এই খণ্ডাংশটুকু শুনিয়া রবীন্দ্রনাথের একদিন মনে হইয়াছিল, "গানের এই দুইটি চরণে সেই শৈবালবিকীর্ণ জলমরুর মাঝখান হইতে সমস্ত গ্রামগুলি যেন কথা কহিয়া উঠিল।" কিন্তু আমাদের কি সে মন আছে? সত্যই লোকসাহিত্যের মধুর চক্রে যে অমিয় সঞ্চিত আছে তাহার সন্ধান এতদিন আমরা পাই নাই। কারণ, সে চক্রে যে মধু আছে নন্দনের পারিজাত হইতে তাহা চয়ন করা হয় নাই, আমাদেরই কুটির প্রাঙ্গণে যে ক্ষুদ্র অপরাজিতাটি ফুটিয়া থাকে সে মধু আহৃত হয় তাহারই স্নিগ্ধ নীলিমা হইতে। জনকজননী ভ্রাতাভগ্নী বেষ্টিত এই যে সুখনীড়টি রচনা করিয়াছি, সে গানের অমরাবতীতে ইহারই ছাপ পড়িয়াছে। আমাদের প্রতিদিনের হাসি ও অশ্রু এই গানগুলির মধ্যে সজীব হইয়া রহিয়াছে। এই গ্রাম্য গীতগুলি তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের আদর এখনও পায় নাই। 'পাণিনি' ইহাদের পাণিগ্রহণ করেন নাই তাই ইহাদের ভাষা অমার্জিত, 'দণ্ডী' দণ্ড হইতে ইহারা চিরকালই বহুদূরে তাই কবিসমাজে ইহাদের স্থান অত্যন্ত নগণ্য, 'বিশ্বনাথ কবিরাজের' রাজত্ব ইহারা মানিয়া লয় নাই তাই বিশ্বনাথের অনুচরগণ ইহাদের উপর বেত্রহস্ত, কিন্তু বিশ্বের দ্বার ইহাদের জন্য উন্মুক্ত ও অবারিত। শিশুর কলকণ্ঠে, রমণীর গৃহকর্মে, কৃষকের শস্যক্ষেত্রে, নাবিকের নৌকায় হিন্দোলের দোলনে সর্বত্রই এই গেঁয়ো ছড়ার অবাধ রাজত্ব। ভারতের গ্রামে গ্রামে এইরূপ অসংখ্য ছড়া

এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। লোপ পাইয়াছে অনেক, তবু যাহা আছে তাহাও কম নয়।

ভারতের উত্তর পশ্চিম অংশে এইরূপ গ্রাম্য গীতের প্রচলন সমধিক পরিমাণেই দৃষ্ট হয়। কি নিত্য কর্মে কি নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানে গানের আয়োজন আছেই। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে 'সোহাব' গানের সুরে গৃহ মুখরিত করিয়া রমণীগণ নবীন অতিথিকে প্রথম অভিনন্দন দেয়। 'জনেউকা গীত' শ্রবণ করিয়া দ্বিজ বালক প্রথম উপবীত ধারণ করে। মঙ্গল গীতের মধুর ধ্বনি নবীন দম্পতির মাঙ্গল্য বিধান করিয়া তাহাদিগকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া দেয়। জাঁতা ঘুরাইতে ঘুরাইতে গান গাহিয়া সে দেশের গৃহস্থ রমণী পরিশ্রম ভুলে, ধান রোপণ করিতে করিতে গান গাহিয়া তাহারা কর্মকে উৎসবে রূপান্তরিত করে। হিন্দোলের দোলে দোলে, পথচলার তালে তালে, সুখে দুঃখে, শোকে-আনন্দে সর্বদা ও সর্বত্র তাহাদের সঙ্গীত। তাহারা গান গাহিয়া হাসিতে হাসিতে বরানুগমন করে আবার গান গাহিয়াই কাঁদিতে কাঁদিতে শবানুগমনও করিয়া থাকে। জল বাতাসের মত গান সেও দেশের প্রাণ ধারণের সামগ্রীবিশেষ।

বর্তমান প্রবন্ধে যে ছড়াগুলি আলোচনা করিব সেগুলি গেয় ছড়া। সুরই তাহাদের প্রাণ অথচ সুর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদের প্রাণহীন দেহগুলিকে লইয়াই আমাদের আলোচনা করিতে হইবে। শুধু তাহা নহে, সঙ্গীতের সহিত স্থানকালাদির যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সে সম্বন্ধও এখানে রক্ষিত হইতে পারে না। কেমন করিয়া দেখাইব উত্তর পশ্চিম ভারতের পল্লী কুটিরের 'বয়ান-পবনের' মত স্বচ্ছন্দ সঙ্গীতমুখরিত ক্ষুদ্র জাঁতাঘরের সেই অনাড়ম্বর অথচ চিত্তাকর্ষক দৃশ্য আর কেমন করিয়াই বা দেখাইব মেঘমেদুর শ্রাবণ অপরাহ্নের আনন্দবিহ্বল হিন্দোললীলা? হিন্দোলের দোলের সহিত তাল রাখিয়া, বেণী দুলাইয়া, হাতের চুড়িগুলিতে ঝংকার তুলিয়া বালিকা যখন গায়:—

লবংগা ইলায়চিকে বীড়া জোড়াএবঁ।
মেরা কুঁচনবালা বিদেস তরসৈ॥
কলিয়া চুবি চুবি সেজ লগাএবঁ॥
মেরা সুতনবালা বিদেস তরসৈ॥"

'লবঙ্গ ও এলাচ দিয়া পানের খিলি তৈয়ার করিব, কিন্তু যে খাইবে সে বিদেশে।—ফুলের কুঁড়ি তুলিয়া তুলিয়া শয্যা পাতিব কিন্তু যে শুইবে সে বিদেশে।' তখন তাহার গান যতটুকু বলে তাহার প্রাণও কি ততটুকু বলিয়াই নিরস্ত হয়? তাহার বলা ঐখানেই শেষ হইতে পারে না। সে যাহা বলে তাহা তাহার বক্তব্যের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কিন্তু ভাষায় যাহা ব্যক্ত হইল না, তাহা যে অব্যক্ত রহিয়া গেল এমন নয়, গ্রাম-প্রান্তে পুষ্করিণীতীরে হিন্দোল আন্দোলিত তরুশাখা, বর্ষা-অপরাহ্নের মন উদাস-করা শীতল বাতাস বর্ষণক্লান্ত মেঘ ভারাক্রান্ত পিঙ্গল বিক্ষুব্ধ আকাশ ইহারাই একে একে বাকিটুকু বলিয়া দেয়। কথা যেখানে ফুরাইয়া আসে, ইহারা সেখানে আগাইয়া যায়। কিন্তু যখন ছড়াগুলিকে কেবলমাত্র অক্ষরপঙ্‌ক্তিতে পরিণত করিয়া ফেলি, তখন কোথায় পাইব সেই শ্রাবণ সন্ধ্যার শীতল পবনের স্পর্শ, আর কেমন করিয়াই বা দেখিব সেই সঙ্গীতমুখরিত সদ্য বর্ষণসিক্ত পুষ্করিণীতীর? রবীন্দ্রনাথ তাহার 'ছেলে ভুলানো ছড়া" শীর্ষক প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"আটঘাট বাঁধা রীতিমত সাধুভাষার প্রবন্ধের মাঝখানে এই সমস্ত গৃহচারিণী অকৃতবেশা অসংস্কৃতা ছড়াগুলিকে দাঁড় করাইয়া দিলে তাহাদের প্রতি কিছু অত্যাচার করা হয়—যেন আদালতের সাক্ষ্যমঞ্চে ঘরের বধূকে উপস্থিত করিয়া জেরা করা, কিন্তু উপায় নাই। আদালতের নিয়মে আদালতের কাজ হয়, প্রবন্ধের নিয়মানুসারে প্রবন্ধ রচনা করিতে হয়—নিষ্ঠুরতাটুকু অপরিহার্য।" আলোচ্য ছড়াগুলি সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। তবে এ ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতাটা আরও কিছু বাড়ে। অন্যান্য অত্যাচার তো আছেই, তাহার উপর আবার ভাষান্তরিত করিয়া এই গীতিকাগুলির প্রতি অত্যাচারের মাত্রাটা সম্পূর্ণ করিয়া তুলি। গল্প শুনি, মুসলমান বাদশাহগণের মধ্যে না কি কেহ কেহ তাঁহাদের অন্যদেশী এবং অন্যভাষী বেগমগণের জন্য মুন্‌শি ডাকাইয়া বেগমগণের নিজ নিজ ভাষায় প্রণয়-পত্র রচনা করাইয়া লইতেন। অনুবাদের সাহায্যে মূল গানগুলির রস উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে গেলে ঐ প্রকার দোভাষীর সাহায্যে প্রেমালাপ করার কথাই মনে পড়ে।

শাঁখারিবেশী শিব যখন গৌরীর হাতে শাঁখা পরাইয়া মূল্য সম্বন্ধে নিতান্ত ঔদাসীন্য দেখাইলেন এবং কেবলমাত্র পরাইয়া দিবার পারিশ্রমিক স্বরূপ,

যাঁহার হাতে শাঁখা পরাইয়াছেন শুদ্ধ তাঁহাকে পাইলেই সন্তুষ্ট হইবেন বলিয়া জানাইলেন, তখন আমাদের বঙ্গপল্লীর গৌরী বলিয়াছিলেন,—

"কেমন কথা কও শাঁখারী কেমন কথা কও।
মানুষ বুঝিয়া শাঁখারি এসব কথা কও॥"

আর প্রবাসী 'বলমুআ' (বল্লভ) পথিকের ছদ্মবেশে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্ত্রীর নিকটে গলহার ও মুক্তামালা অঙ্গীকার পূর্বক যখন এক সাধু প্রস্তাব করিয়া বসিল যে, পরদেশিয়ার আশা ছাড়িয়া ছুড়িয়া দিয়া আমার সহিত চলিয়া চল, তখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গৃহবধূ উত্তর দিয়াছিল :

"অগিয়া লগৈ গলহার বজর পরৈ মতি লড়ি।
তোহরলে পিআ মোরা সুন্দর গুলাব কি ফুলছড়ি॥"

বাঙ্গালা ও হিন্দী যে দুইটি ছড়া হইতে এই দুইটি অংশ উদ্ধৃত করা হইল, সে দুইটি ছড়ারই বিষয়বস্তু প্রায় সমান। দুইটিতেই আছে,—ছদ্মবেশী পতির পত্নীকে ছলনা, অথবা স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে কুতূহলী স্বামীর সকৌতুক পরীক্ষা এবং পরীক্ষায় স্ত্রীর জয়লাভ। তাহার পর স্বামীর পরিচয় প্রদান। এবং সর্বশেষে পতি-পত্নীর মধুর মিলন। কিন্তু এত মিল থাকা সত্ত্বেও ইহাদের একটি বিরাট স্বাতন্ত্র্য আছে, সেখানে কেহ কাহারও সহিত তুলিত হইতে পারে না। 'পিআ মোরা সুন্দর গুলাব কি ফুলছড়ি' কে যখন ভাষান্তরিত করিয়া বলি, প্রিয় মোর সুন্দর গোলাপের ফুলছড়ি', তখন ফুলছড়ির ফুলগুলি ঝরিয়া পড়ে থাকে শুধু ছড়ি। তেমনি যদি গৌরীর উক্তিকে রূপান্তরিত করিয়া বলি, 'কৈসী বাত কহতে হো শাঁখারিআ, কৈসী বাত কহতে হো', তাহা হইলেও ব্যাপার দাঁড়াইবে ঐরূপ। ফলকথা অনুবাদের দ্বারা মূলকে অক্ষুণ্ণভাবে পাওয়া কঠিন। একভাষা হইতে অন্য ভাষায় চলিবার পথেই, তাহার নিজস্ব রূপটি সে হারাইয়া ফেলে। কিন্তু উপায় নাই।

গ্রাম্য গীতসমূহ আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই যে জিনিসটি আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে সেটি হইতেছে ইহাদের স্বাভাবিকতা। যাঁহাদের হাতে এই কবিতাগুলির জন্ম, তাঁহারা মেমের স্কুলে পড়িয়া "সোজা সোজা" চলিতে বা "অন্য দেশীয় চালে" কথাবার্তা বলিতে শিখেন নাই। কুঙ্কুম বা সিন্দূরের রক্তিমাভা তাঁহাদের ললাটদেশ রঞ্জিত করে বটে কিন্তু অধররঞ্জনের জন্য তাঁহারা তাম্বূলই

যথেষ্ট মনে করেন। ওষ্টশলাকার বিজ্ঞাপন তাঁহাদের দৃষ্টির অগোচর। এক কথায় বলা যায়, তাঁহাদের জীবনযাত্রার গতি সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। কাজেই তাঁহাদের রচনার মধ্যেও ঐ সরল ও সুন্দর জীবনের ছায়া পড়িয়াছে।

উপমার জন্য তাঁহাদিগকে কুরুবক বা পক্কবিম্বের শরণাপন্ন হইতে হয় না। তাঁহারা মনে করেন 'হাতের কাছে কোলের কাছে যা আছে তাই অনেক আছে।'

"জোলহিনো লাগৌ ন হমরে গোহনবাঁ হো না।
জোলহিন তোহঁকা রাখব জৈসে ঘিউ গাগবি হোনা॥"

কোনো রাজপুত্র এক ধীবরকন্যার প্রতি অনুরক্ত হইয়া বলিতেছেন,—"ওগো কন্যা, আমার বাড়ী চল, ঘিয়ের কলসীর মত তোমাকে যত্ন করিয়া রাখিব।' নিরক্ষর কবির রাজ্যহীন রাজপুত্রই এই কথা বলিতে পারেন, অন্য কেহ হইলে ঘিয়ের কলসীর স্থানে সম্রাজ্ঞী না হউক অন্ততঃ রাজরাণী না বসাইয়া ছাড়িতেন না। কিন্তু এখানে তাহা হইবার নহে, কবির পিতার পুত্রের মুখে যাহা বাহির হওয়া সম্ভব রাজার পুত্রের মুখে তাহাই বসাইয়া দিয়াছেন।

"দূরহি দেস জনি করেহু করেরুবাঁ
কে তোহঁে তোরণ জাই।
দূরহি দেস জনি বরেহু বিটিয়বা
কে তোহঁে আনন জাই॥"

'হে করেরু (এক প্রকার ফল) দূরদেশে ফলিও না, কে তোমাকে পড়িতে যাইবে? কন্যার বিবাহ দূরদেশে দিও না, কে তাহাকে আনিতে যাইবে?'

উপমার জন্য সমুদ্রমন্থন করিয়া মাণিক তুলিতে হয় নাই, ক্ষুদ্র ফলের দ্বারাই সে কার্য সাধিত হইয়াছে।

"বাবা নিমিয়া ক পেঢ় জিনি কাটেউ,
নিমি চিরৈয়া বসের— বলৈয়া লেউ বীরন॥
বাবা বিটিয়উ জিনি কেউ দুখ দেউ
বিটিয়া চিরৈয়া কী নহিঁ— বলৈয়া লেউ বীরন॥

সবরে চিরৈয়া উড়ি জইহৈঁ
রাহি জইহৈঁ নিমিয়া অকেলি— বলৈয়া লেউ বীরন ॥
সবরে বিটিয়বা জইহৈঁ সাসুর,
রহি জইহৈঁ মাঈ অকেলি— বলৈয়া লেউ বীরন ॥

'বাবা, নিমগাছটি কাটিয়া ফেলিও না, পাখীরা উহাতে বাসা বাঁধে। বাবা, কন্যাকে কোনো কষ্ট দিও না। কন্যা আর পাখী উভয়েই সমান। সব পাখী উড়িয়া যাইবে নিমগাছটি একলা পড়িয়া থাকিবে। সব কন্যাই শ্বশুরবাড়ী চলিয়া যাইবে, ঘরে একলা পড়িয়া থাকিবে মা।'

দুটি কথাতেই কন্যার মর্মকথা ব্যক্ত হইয়াছে।

কন্যার শ্বশুরালয় যাত্রার একটি দৃশ্য দেখুন :

"ভিতরে তে মায়া জো রোবই
অঞ্চলেমঁা আঁসু পোঁছই হো।
এহো মোরি বিটিয়া চলী পরদেস
কোখিয় মোরী সুনী ভঈ না ॥
বৈঠকসে বাবুজী রোবই
পটকেমঁা আঁসু পোঁছই হো।
মোরী ধেরীয়া চলী পরদেস
ভবন মেবা সুন ভয়ে না ॥
ভিতরে তে ভৈয়া জো রোবই
পগড়িয়াঁ মঁা আঁসু পোঁছই হো।
মোরী বহিনী চলী পরদেস
পিঠিয়া মোরী সুন ভঈ না ॥
ওবরীতে ভৌজী জো রোবই
চুনরিয়াঁ মঁা আঁসু পোঁছই হো।
এহো মোরী ননদী চলী পরদেস
রসোইয়াঁ মোরী সুনী ভঈ না ॥"

'ভিতরে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মা অঞ্চলে অশ্রু মুছিতেছেন। আজ কোল শূন্য করিয়া কন্যা পরদেশ চলিয়া যাইবে। 'বৈঠকে' বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাবা দুপট্টায় অশ্রু মুছিতেছেন। আজ গৃহশূন্য, কন্যা পরদেশ চলিয়া যাইবে। গৃহমধ্যে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভাই পাগড়িতে অশ্রু মুছিতেছেন। আজ ভগ্নী ঘর খালি করিয়া চলিয়া যাইবে। ঘরে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভ্রাতৃবধূ শাড়ির প্রান্তে অশ্রু মুছিতেছেন। ননদী আজ রান্নাঘর অন্ধকার করিয়া পরদেশ যাইবে।'

এই গ্রাম্য গীতটির কথা উল্লেখ করিতে গিয়া একটি বাঙ্গালা ছড়ার কথা মনে পড়িল, সেটিও অনেকটা এইরূপ।

"আজ দুর্গার অধিবাস কাল দুর্গার বিয়ে।
দুর্গা যাবেন শ্বশুরবাড়ী সংসার কাঁদিয়ে॥
মা কাঁদেন মা কাঁদেন ধুলায় লুটায়ে।
সেই যে মা পলাকাটি দিয়েছেন গলা সাজায়ে॥
বাপ কাঁদেন বাপ কাঁদেন দরবারে বসিয়ে।
সেই যে বাপ টাকা দিয়েছেন সিন্দুক সাজিয়ে॥
ভাই কাঁদেন ভাই কাঁদেন আঁচল ধরিয়ে।
সেই যে ভাই কাপড় দিয়েছেন আল্না সাজিয়ে॥"

কয়েক শতাব্দী পূর্বে উত্তর পশ্চিম ভারতের নরনারীর সামাজিক জীবনের ধারা কোন্ পথে প্রবাহিত হইতেছিল আলোচ্য গ্রাম্য গীতগুলির মধ্য হইতে তাহা বেশ লক্ষ্য করা যায়।

শাশুড়ী ও ননদের হাতে বধূর লাঞ্ছনার কথা অতি করুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বিবাহের প্রসঙ্গ উঠিলে এক কন্যা মাতাকে বলিতেছেন :

"নাহীঁ সিখেন মৈয়া গুণ অবগুণবাঁ
নাহীঁ সিখেন রাম রসোই।
সাসু ননদী মোর মৈয়া গরিয়া বৈঁ
মোর বুতে সহ নহীঁ জাই॥"

'মা, কি ভাল কি মন্দ এখনও কিছু শিখি নাই, রাঁধিতেও শিখি নাই।

শাশুড়ী ও ননদী মায়ের নাম ধরিয়া গালি দিলে, তাহা ত সহ্য করিতে পারিব না।'

শাশুড়ীর মুখে প্রায়ই শুনিতে পাই :

"খাউ ন বহুয়বি তোরা ভৈয়া ভতিজবারে।"
'বৌ তোর ভাই খাই, ভাইপো খাই।'
"বাবা খাউ ভইয়া খাউ তোহবো বহুরবাঁ।'
'বৌ তোর বাপ খাই তোর ভাই খাই।' ইত্যাদি।

প্রবাসী গৃহে ফিরিলে স্ত্রীব চরিত্র সম্বন্ধে তাহার মনে সন্দেহ উদয় করাইয়া দিতে ননদীর বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না।

"গোবড়া ধোবাবত বহিনী লাগে চুগুলিয়া।
ভৈয়া ভৌজী সে লেহু কিরিববা হো রাম॥"

'পা ধোয়াইতে ধোয়াইতে ভগ্নী ভ্রাতাকে বলিল দাদা, বৌদিদির পাতিব্রত্য সম্বন্ধে শপথ গ্রহণ কর।'

ননদীর নিষ্ঠুরতার নানাপ্রকার নিদর্শন এই গ্রামগুলির মধ্যে আছে। অবশ্য সময় পাইলে ভ্রাতৃবধূও প্রতিশোধ লইতে ছাড়েন না। শ্বশুরালয় হইতে প্রত্যাগত কোন ননদীর প্রতি গৃহকর্ত্রী ভ্রাতৃবধূর ব্যবহারেব কিঞ্চিৎ নমুনা একটি গুজরাটি ছড়া হইতে দেখাইতেছি।

বার বার বরষে ননদল আব্যাঁ।
ভাভী উতারা দেজো রাজ॥
নণদাল পবোণলাঁ॥১॥*
ঘরপছ বাডে পড়েল খণ্ডেরিয়ুঁ।
জই উতারা করজো রাজ॥
নণদাল পরোণলাঁ॥ ২॥
উতারা ভাভী সভর বনাব্যাঁ।
হবে দাতনীয়াঁ দেজো রাজ॥
নণদাল পরোণলাঁ॥ ৩॥

ঘর পছবাড়ে যোয়হুঁ ঠুঁ ঠুঁ।
জই দাতনীয়া করজো রাজ ॥৪॥
দাতনীয়া ভাভী সভর বনাব্যাঁ।
হবে নাবনীয়া দেজো রাজ ॥৫॥
ঘর পছবাড়ে খাননী কুণ্ডিযুঁ।
জই নাবনীয়াঁ করজো বাজ ॥৬॥
নাবনীয়াঁ ভাভী সভব বনাব্যাঁ।
হবে ভোজনীয়াঁ দেজো রাজ ॥৭॥
তমাবে বীরে শাল নথী বাবী।
ঘউমাঁ আব্যো গেরু রাজ ॥৮॥
ভোজনীয়াঁ ভাভী সভর বনাব্যাঁ।
হবে মুখবাসিয়াঁ দেজো রাজ ।৯।
ঘরণে খূনে উন্দরণী লিঁভিযুঁ।
জই মুখবাসিয়াঁ কবজো বাজ ॥১০॥
মুখবাসিয়াঁ ভাভী সভব বনাব্যাঁ
হবে পোবণীয়া দেজো রাজ ॥১১॥
তমারে বীরে বহান নথী ভাঁগু।
সুথার পীট্যো ঠুঁঠো বাজ ॥১২॥
পোরনীয়া ভাভী সভব বনাব্যাঁ।
হবে মারগড়া চীঁধো রাজ ॥১৩॥
খালী কুবাতে তমে টেকতাঁ জাজো।
ভরা কুবামা পড়জো রাজ ॥১৪॥
মারা হৈয়ামা হাম জ বহী গই।
মারা বমাণী বহী গই বাজ ॥১৫॥"

ছড়াটির বাঙ্গালা অনুবাদ :

বার বৎসর পরে ননদী আসিয়াছে। ভ্রাতৃবধূ তাহাকে থাকিবার স্থান দাও। ধুয়া—ননদী আসিয়াছে ॥১॥ ঘরের পিছনে ভাঙ্গা বাড়ী পড়িয়া আছে সেইখানে যাইয়া থাক ॥২॥ ভ্রাতৃবধূ, থাকিবার সুন্দর বন্দোবস্ত হইয়াছে, এইবার

দাঁতন করিবার জন্য একটি কাঠি দাও ॥৩॥ ঘরের পিছনে শুকনা কাঁটা গাছ রহিয়াছে তাহারই ডাল ভাঙ্গিয়া দাঁতন কর ॥৪॥ দাঁতনের ব্যবস্থা ত ভালো হইল, এবার স্নানের বন্দোবস্ত করিয়া দাও ॥৫॥ ঘরের পিছনে ময়লা জল জমিবার যে গর্ত আছে, তাহাতেই স্নান কর ॥৬॥ স্নানেরও সুবন্দোবস্ত হইল, এখন কিছু আহার্য দাও ॥৭॥ তোমার ভাই ত চাষ করে নাই, ঘরে যে গম আছে পোকা ধরিয়া তাহাও লাল হইয়া গিয়াছে ॥৮॥ আহার্যের ব্যবস্থাও ভাল হইল, এখন একটু মুখশুদ্ধি দাও ॥৯॥ ঘরের কোণে ইঁদুরের বিষ্ঠা আছে, তাহা দিয়াই মুখশুদ্ধি কর ॥১০॥ মুখশুদ্ধিও বেশ হইল, এখন একটা খাটিয়া দাও ॥১১॥ তোমার ভাই দড়ি পাকাইয়া রাখে নাই, 'মুখপোড়া' ছুতারও ঠুঁটো ॥১২॥ খাটিয়ারও সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছে, এখন রাস্তাটা দেখাইয়া দাও ॥১৩॥ খালি কুয়াটা ডিঙ্গাইয়া গিয়া ঐ ভরা কুয়াটায় লাফ দিয়া পড ॥১৪॥ (ভ্রাতৃবধূর স্বগত উক্তি) আমার মনে বড় দুঃখ রহিয়া গেল, ঘা কতক বসাইয়া দিতে পারিলাম না ॥১৫॥

শ্বশুরালয়ে বধূর সুখ হয়ত ছিল কিন্তু লাঞ্ছনারও সীমা ছিল না। শাশুড়ী-ঠাকুরাণীর বধূপ্রীতির বন্যাধারা শুধু পুত্রবধূ নহে, মধ্যে মধ্যে পুত্রবধূর আত্মীয় পরিজনকেও ভাসাইয়া লইয়া যাইত। বহুদিন পরে ভগিনীকে দেখিবার জন্য ভ্রাতা ভগিনীর শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়াছেন। শাশুড়ীঠাকুরাণী বধূর ভ্রাতার জন্য কি কি উপাদেয় ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতে বলিলেন শুনুন,—

"কোঠিলহি বহুবরি সরলী কোদইয়া রে না।
বহুবরি মেডবাঁ মসউঢেক সগবা রে না॥"

বৌ, ঘরে পচা "কোদো" চাল আছে এবং খেতের আলে "মসউডা" শাক হইয়া আছে। "কোদোর" ভাত এবং "মসউডার" তরকারি রান্না কর।

ভ্রাতা ও ভগিনীর মধুর সম্বন্ধ এই গ্রাম্য গীতগুলির মধ্যে অতি অপরূপ ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। শ্বশুরালয়ে অবস্থান কালে যখন বহুদূরবর্তী পিতৃগৃহের জন্য মনটা কেমন করিয়া উঠে তখন সর্বাগ্রে মনে পড়ে ভ্রাতার কথা। যাহারা একান্ত আপনার তাহাদের দূরবর্তীতা মনকে ব্যথিত করে কিন্তু সেই বেদনা বর্ষায় এত তীব্র হয় যে তেমন আর কখনও হয় না। শ্রাবণের কালো মেঘ যখন আকাশ অন্ধকার করিয়া আসে তাহার ছায়া মনের উপর পড়ে গভীর ভাবে, ভাদ্রের ভরা ডোবাগুলির দিকে তাকাইয়া চক্ষু দুইটি অশ্রুসজল হইয়া আসে।

তাই বর্ষণভারাক্রান্ত শ্রাবণ সন্ধ্যায় ক্ষুদ্র রান্নাঘরটির অন্ধকার কোণে বসিয়া বধূ যখন রন্ধনে ব্যস্ত তাহার মনটি তখন ছাড়া পাইয়া কখন যে সেই শৈশবের খেলাঘরে গিয়া খেলার রান্না আরম্ভ করিয়া দেয় তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে না। চিরাচরিত গৃহকর্মের এবং তাহারই আনুষঙ্গিক লাঞ্ছনা ও তিরস্কারের হাত হইতে মুহূর্তের মত মুক্তি পাইয়া বাঁচে। তাহার পর স্বপ্ন একদিন সত্য হইয়া দেখা দেয়, শৈশবের খেলার সাথী ভাইটি একদিন সত্য সত্যই আসিয়া উপস্থিত হয়। বহুদিনের রুদ্ধ অশ্রু সেদিন আর বাধা মানে না। শাশুড়ী ননদের দৃষ্টি এড়াইয়া ধীরে ধীরে ভ্রাতার নিকটে যাইয়া বধূ বলে :

"মুড় দেখো এ ভৈয়া মুড দেখো ভৈয়া
জৈসে কুকুরিয়া কৈ পুঁছরে।
পীঠ দেখো ভৈয়া তো পীঠ দেখো ভৈয়া
জৈসে হৈ ধোবিয়া ক পাট রে॥
কপড়া দেখো ভৈয়া কপড়া দেখো ভৈয়া
জৈসে হৈ সবনবা কৈ বাদরী রে॥"

দেখ ভাই মাথার চুল হইয়াছে কুকুরের পুচ্ছ, পিঠ হইয়াছে ধোপার পাট আর পরনের এই কাপড় যেন শ্রাবণের ধারা।

ইহা শুনিয়া মনে পড়ে :

"গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।"

বাঙ্গালা ছড়ার মধ্যে বাঙ্গালী বধূর দুঃখের কাহিনীও অনেকটা এইরূপ, এবং সে করুণ কাহিনীর শ্রোতাও বধূর ভ্রাতা। দুইটি পঙ্‌ক্তি শুনুন :

"হাড় হ'ল ভাজা ভাজা মাস হ'ল দড়ি।
আয়রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।"

শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয় লইয়া যাইতে হইলে একমাত্র ভ্রাতাই সহায়। দুর্গমপথ, যানবাহনের সুবিধা নাই, রাস্তায় বাঘ ভালুকেরও সন্ধান মিলিতে পারে—বৃদ্ধ পিতা কি এত ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন? আর অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুবান্ধব? তাহারাই বা অনর্থক কষ্ট সহ্য করিয়া কন্যার শাশুড়ীর দুর্বাক্য গলাধঃকরণ করিতে যাইবেন কোন্ সুখে? সুতরাং ভ্রাতা ব্যতীত এ কাজ করিবার আর কেহ নাই। তাই পিতৃগৃহের কথা মনে হইলেই সকলের

আগে মনে জাগে 'গুণবতী ভাই'টির কথা। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গৃহবধূও শ্বশুরালয়ে থাকিয়াই মায়ের উদ্দেশে কাঁদিয়া বলে :

"মাঈ তলবা কুহকহ মোর।
মাঈ লহুয়া ভইয়বা পঠয়ে পঠয়ে সাবন নীঅর।
মাঈ বোই গাই বিদবা করই হৈঁ সাবন নীঅর॥

মা, পুকুর পাড়ে ময়ূরের ডাক শোনা যাইতেছে, শ্রাবণের আর দেরি নাই। মাগো, ছোট ভাইটিকে পাঠাইয়া দিও সে কাঁদিয়া কাটিয়া আমাকে এখান হইতে লইয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে :

"ও পারেতে কালো রঙ, বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্
এ পারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুক্ টুক্ করে।
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে॥"

উত্তর ভারতের মাতা কন্যার নিকট খবর পাঠাইতেছেন :

"ববলী তো জোগিয়া হো গয়ে কাকুল হৈ নিরমোহী।
ভৈয়া তুম্হারে বেটী চবরী গয়ে পককো মৈঁ লৈহৌঁ বুলায়।
য সৌ কে সাবন বেটী উহীঁ বহো॥"

তোমার বাবা সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছেন, কাকা ত নির্দয়, ভাই গিয়াছে চাকরি করিতে। সুতরাং এই বৎসরটা কোন রকমে ওখানেই কাটাইয়া দাও। আগামী বৎসর তোমাকে লইয়া আনিব।

বাঙ্গালা দেশের ভাই বোনকে আশ্বাস দিতেছে :

'এ মাসটা থাক দিদি কেঁদে ককিয়ে।
ও মাসেতে নিয়ে যাব পালকি সাজিয়ে॥

ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বেশী কথা বলিবার উপায় নাই কিন্তু তথাপি শেষ করিবার পূর্বে আর দুই একটি কথা বলিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না।

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা বিষম বিপত্তির কারণ হইলেও বৃদ্ধেরা তরুণী ভার্যা গ্রহণে কখনও দ্বিধা বোধ করেন না, এমন কি এ-যুগেও। সুতরাং বিপত্তিও অলঙ্ঘনীয়।

"পাঁচ বরিসবা কি মোরি রংগবৈলী
অসিয়া বরস কি দমাদ।

নিকরি ন আবৈ তু মোরি রংগরৈলী
অজগর ঠাঢ় দুবার ॥
আংগন কিচ্ কিচ্ ভিতর কিচ্ কিচ্
বুঢ়উ গিরে মুঁই বায়।
সাত সখী মিলী বুঢ়উ উচাবৈ
বুঢ়উ সেঁ দুর পহিরাব ॥"

পাঁচ বছরের কন্যা এবং আশী বছরের জামাতা। কন্যা, বাহিরে আসিও না, দুয়ারে ঐ দেখ অজগর। ভিতর ও বাহির কাদায় কিচকিচ করিতেছে, বুড়া পা পিছলাইয়া উপুড় হইয়া পড়িল। তখন সাত সখী মিলিয়া বরকে তুলিয়া ধরিয়া তাহার দ্বারা কন্যার মাথায় সিঁদুর দেওয়াইল।

রক্ষা এই যে কন্যাটি পঞ্চমী, জ্ঞান হইলে বর ও বিবাহ উভয়ই স্মৃতিপট হইতে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইবে। পঞ্চদশী হইলে অবস্থা জটিলতর হইত। আমাদেরও একটি "তামাক খেকো বুড়ো" বরের কথা শুনুন। ইহার সহিত পাঠকদের অনেকের পরিচয় থাকিতে পাবে—শৈশবের পরিচয়।

"তালগাছ কাটম্ বোসের বাটম্ গৌরী এল ঝি।
তোব কপালে বুড়ো বব আমি করব কি ॥
টঙ্কা ভেঙ্গে শঙ্খা দিলাম কানে মদন কড়ি।
বিয়ের বেলা দেখে এলুম বুড়ো চাপ দাড়ি ॥
চোখ খাওগো বাপ মা চোখ খাওগো খুড়ো।
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তামাক খেগো বুড়ো ॥
বুড়োব হুঁকো গেল ভেসে বুড়ো মরে কেশে।
নেড়ে চেড়ে দেখি বুড়ো মরে রয়েছে।
ফেন গালবাব সময় বুড়ো নেচে উঠেছে ॥"

ইহা তো গেল বৃদ্ধ বর ও বালিকা কন্যাব দাম্পত্য বন্ধনের কথা। হিন্দী ছড়ার মধ্যে বয়স্থা কন্যা ও বালক ববের বিবাহপ্রসঙ্গ লইয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপ দেখা যায়। কুলীনদের মধ্যে কুমারী নাম ঘুচাইবার জন্য বাঙ্গালা দেশে প্রায় দেড়-শ বৎসর পূর্বে পৌঢ়া বা বৃদ্ধার সহিত বালকের বিবাহ-অভিনয় হইত। এইরূপ

অসম মিলন উত্তর পশ্চিমেও ঘটিত। একটি ছড়ার মধ্য দিয়া তাহার পরিচয় দিতেছি।

"নাহক গৌন দিহে মোব বাবা বালক কন্ত হমার বে।
চীলর অস দুই দেবর হমর রে বলমা মুসে অমুহার রে॥"

'হায় আমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলাম কিন্তু আমার স্বামী এখনও বালক। আমার দুই দেবর দুইটি উঁইয়েব মত ছোট আর আমাব স্বামীর চেহারা বড জোব ইঁদুরের মত।'

এখানেই শেষ হয নাই পরে আছে—এই অতি ক্ষুদ্র পতিদেবতাকে কন্যা তেল মাখাইয়া খাটিয়ার উপরে শোয়াইয়া দিয়াছিল, ইঁদুর ভাবিয়া বিড়াল তাহাকে লইয়া পালায়, কিন্তু কন্যার সৌভাগ্যক্রমে বিনা জানি না তাহাকে উদরসাৎ না করিয়া ফেলিয়া দেয়। পরে তাহার রোদনধ্বনি শুনিযা কন্যা গৃহ-কোণের ধূলিকুণ্ড হইতে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পতিদেবতাকে উদ্ধাব করে।

গুজরাটের সাহিত্য

গুজরাটের প্রতীহারবংশীয় বৎসরাজ এসে যখন গৌড়বঙ্গ অধিকার করেন—তখন নানাভাবে তার ছাপ এদেশের মাটিতে রেখে যান। সে আজ বারশ' বছর আগেকার কথা। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর 'গুজরাট' প্রকৃতপক্ষে গুর্জরে ছিল না, সে ছিল বাঙালীর স্মৃতিরাজ্যে।

ঐতিহাসিক যুগে পশুবলকে উপলক্ষ করে দুই প্রদেশের মধ্যে যে অসম মিলন সংঘটিত হয়েছিল আজ উভয়ের একযোগে অন্য এক মহত্তর শক্তি-সাধনায় তা সুসমাহিত হয়েছে। তাই গুজরাটকে আজ আমরা নূতন করে চিনেছি এবং চিনছি। আজ তার সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ ভয়-ভাবনা যা' কিছু সবই আমাদের অনুরূপ।

এক জাতির পক্ষে অন্য জাতির ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাবার শ্রেষ্ঠ উপায় তার সাহিত্য। সাহিত্যই অন্তরঙ্গ মিলনের শ্রেষ্ঠতম বাহন। গুজরাটকে আরও ভাল করে জানতে হলে তার সাহিত্যের খবর কিছু জানা দরকার।

ভারতের ইতিহাস—ধরতে গেলে রাজারাজড়ার ইতিহাস নয়, সে হচ্ছে ধর্মের ইতিহাস। কি বাংলা, কি মহারাষ্ট্র, কি মিথিলা, ভারতের যে কোন প্রদেশের সাহিত্যের কথাই ধরি না কেন, দেখব দেবদেবীর লীলা কীর্তনই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার উপজীব্য, আর ধর্মই তার প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রাচীন গুজরাটী সাহিত্যেও এই ধারার ব্যতিক্রম নেই।

খাঁটি গুজরাটী সাহিত্যের ইতিহাস মাত্র পাঁচশ' বছরের ইতিহাস। তার পূর্বেও যে সাহিত্য ছিল না তা নয়, কিন্তু তার ভাষা গুজরাটী ছিল না। পাঁচ শতাব্দী আগেকার গুজরাটী সাহিত্যের ভাষা ছিল অপভ্রংশ। আর তার অধিকাংশই রচিত হয়েছিল জৈনধর্মকে অবলম্বন করে।

চণ্ডীদাসের পদাবলী যখন বাঙালীর 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করবার উপক্রম করছিল ঠিক সেই সময় গুজরাটের কাঠিয়াবাড় প্রদেশে পবিত্র নাগর ব্রাহ্মণবংশে আর এক চণ্ডীদাস জন্ম নিলেন, কিন্তু অন্য নামে। তাঁর

নাম নরসিংহ মেহেতা। তাঁর-কৃষ্ণলীলামৃত আজও সমগ্র গুজরাটী ভক্তসমাজের রসপিপাসুচিত্তকে সঞ্জীবিত রেখেছে। এই নরসিংহ মেহেতাকেই প্রাচীন গুজরাটী সাহিত্যের জন্মদাতা বলা হয়।

নরসিংহ ছিলেন সাধক ও ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণে মনপ্রাণ তিনি সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেছিলেন। তাই তাঁর সাংসারিক জীবন সংসারী লোকের মানদণ্ডে খুব সুখের ছিল না। দারিদ্র্য তাঁর নিত্য সহচর ছিল। কিন্তু যে ভক্ত সব ভুলে নিজেকে তাঁর চরণে উৎসর্গ করতে পারে অন্ন-বস্ত্রের অভাব তার কি গণনার মধ্যে আসে?

যে দেবতার পূজায় প্রেম ছাড়া আর কোনো মন্ত্রের দরকার হয় না তার পূজারির জাতের কোন বালাই নাই। নরসিংহ সে-কথাটি উপলব্ধি করেছিলেন সমগ্র হৃদয় দিয়ে। তিনি উচ্চবংশে জন্মেও জাতির সীমানা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন, ব্রাহ্মণ চণ্ডালের মধ্যে তিনি কোন ভেদ দেখতেন না। তিনি অসঙ্কোচে হাড়ি ডোমের সঙ্গেও একত্র আহার করতেন। তাই তাঁর আত্মীয়-স্বজন তাঁকে জাতিচ্যুত করেছিল। মেথরের হাতে জলগ্রহণ করেছিলেন ব'লে একবার এক ভোজসভায় ব্রাহ্মণদের পঙ্‌ক্তি থেকে নরসিংহকে তুলে দেওয়া হয়। নরসিংহ হাসি মুখে উঠে গেলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণরা দেখতে পেলেন তাঁদের প্রত্যেকের দক্ষিণে ও বামে একজন ক'রে মেথর তাঁদেরই পঙ্‌ক্তিতে বসে পরমানন্দে পানভোজন করছে। ঘটনাটি অলৌকিক এবং সকল দেশে ও সকল কালেই মহাপুরুষদের নামে এ রকম কাহিনী প্রচারিত হয়। তথাপি এ সকল কাহিনীর মূল্য একেবারে উপেক্ষার যোগ্য নয়। নানা অতিরঞ্জনের মধ্য থেকেই প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয়ে থাকে। তাই যা কিছু আশ্চর্য ঠেকে তাকেই মিথ্যা বলে একেবারে উড়িয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে সত্যকেও বিদায় দিতে হবে।

সৃষ্টি এবং স্রষ্টা উভয়কেই তিনি ভালবেসেছিলেন কায়মন এবং বাক্য দিয়ে। সেই ভালবাসাই তাঁকে এবং তাঁর রচনাকে বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষা করে এসেছে।

সারা জীবনের সাধনায় তিনি যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর কাব্যের ছত্রে ছত্রে—কোথাও বা আভাসে এবং কোথাও বা সোজা কথায়—জগদ্বাসীকে

তা জানিয়ে গেছেন। জগতে সব মিথ্যা। সত্য যদি কিছু থাকে তো সে একমাত্র তাঁর নাম। কবি সবাইকে আহ্বান করে বলছেন :—

"কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি, কহেতাঁ উঠো রে প্রাণী।
কৃষ্ণজিমা নাম বিনা জে বোলো তে মিথ্যা বে জানী॥"

পঞ্চদশ শতাব্দীর আর একজন গুজরাটী কবি—শুধু গুজরাটের নয় সমগ্র ভারতের কবি—কৃষ্ণগতপ্রাণা মীরাবাঈ। মীরার ভজন প্রত্যেক বাঙালীরই সুপরিচিত; কিন্তু তাঁর পদ যে গুজরাটী ভাষাতেও আছে এ কথা হয়তো আমাদের জানা ছিল না। সে সম্বন্ধে দুটো কথা বলা দরকার।

জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস প্রভৃতি বাঙালী কবির রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদের ভাষা ও ভাবের সঙ্গে বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাব ও ভাষার মিল দেখে আমরা বিদ্যাপতিকে বাঙালী বলে মনে করে নিয়েছিলাম। মাত্র কয়েক বৎসর আগে আমাদের সে ভুল ভেঙেছে। মীরার সম্বন্ধে অবশ্য সে রকম সন্দেহ জাগেনি; কারণ তিনি যে রাজপুতানার রাঠোর বংশে জন্মেছিলেন, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। গোলমাল দাঁড়িয়েছে পদের ভাষা নিয়ে। কোন্ ভাষায় তিনি তাঁর অপরূপ সঙ্গতগুলি রচনা করেছিলেন এ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডার অন্ত নেই। হিন্দী, মাড়োয়ারী এবং গুজরাটী—এই তিন ভাষাতেই তাঁর পদ প্রচলিত আছে।

তবে এইখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে প্রাচীন গুজরাটী, মাড়োয়ারী এবং হিন্দী ভাষার মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী ছিল না। তিনি হয়তো তিন ভাষাতেই পৃথক ভাবে পদ লিখেছিলেন। অথবা এক ভাষাতেই লিখেছিলেন, অন্যান্য প্রদেশ তাকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অল্পবিস্তর বদলে আপন বলে দাবি করে বসেছে। আবার এও অসম্ভব নয় যে তাঁর পদ অনেকের বোধগম্য করার জন্যে একাধিক ভাষার সংমিশ্রণে রচনা করেছিলেন। তার ফলেই হয়তো সবাই তাঁর পদাবলীকে আপন ব'লে দাবি করেছে। দুঃখের বিষয় মীরাবাঈয়ের কোন পদই অবিকৃতরূপে পাওয়া যায় নি। পাঁচ-শ বছর ধরে প্রতিনিয়ত রূপ বদলাতে বদলাতে মীরার ভজনগুলি প্রাচীনত্বের চিহ্ন পর্যন্ত হারিয়ে বসেছে। কিন্তু অঙ্গের সংস্কার যত বারই হ'ক না কেন সংগীতের সুরটি রয়েছে তেমনি মধুর তেমনি প্রাণমাতান, যেমনটি ছিল পাঁচ-শ বছর আগে।

নৃতত্ত্ববিৎ কোন কোন পণ্ডিত বলেন বাঙ্গালীর সঙ্গে গুজরাটীর সম্বন্ধ নাকি খুব ঘনিষ্ঠ। অনেক দিক দিয়ে এই দুই জাতির মধ্যে খুব মিল আছে। সব চেয়ে বড় মিল দেখা যায় উভয়ের ভাবুকতায়। ভাবুক বাঙ্গালীর প্রাণে বৈষ্ণবধর্ম যেমন ভাবের বন্যা বইয়েছিল গুজরাটীর অন্তরেও ঠিক তেমনি। যে কারণে বিদ্যাপতি অবাঙ্গালী হ'য়েও বাঙ্গালার হৃদয়ে অক্ষয় আসন লাভ করেছিলেন ঠিক সেই কারণেই মীরা রাজপুতানী হয়েও গুজরাটের মনোমন্দিরে দেবীর আসন পেয়েছেন।

মীরার গানগুলি স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে এমন একটি সুন্দর সেতু রচনা করেছে যে উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ব্যবধান আছে তা মনেই হয় না। শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণের মধ্যে যে অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রয়েছে মীরা কেমন সহজ কথায় তা সাধারণের মর্মগোচর করেছেন ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এ কাজ অতি বড় পণ্ডিতের কাজ—কিন্তু শুধু পাণ্ডিত্য দিয়ে এ জিনিস সর্বসাধারণকে বোঝান সহজ নয়।

ঝট্ দ্যো মেরো চীর মোবারীরে
ঝট্ দ্যো মেরো চীব।
লে মেরো চীর কদম চঢ় বেঠো
মেঁ জল বীচ উঘাটী, হাঁরে লালা, মেঁ জল বীচ উঘাটী।
উভী রাধা অরজ করত হে, হো চীর দাও গিবধারী।
প্রভু তোরে পায় পরুংগী।
ঝট্ দ্যো মেরো চীর মোরারীরে, ঝট্ দ্যো মেরো চীর।
জো রাধা তেরো চীর চহারত জলসে হোজা ন্যারী।
হাঁ রে লালা, জলসে হোজা ন্যারী।
ন্যারী কানা কবুএনা হোবংগী।
তুম হো পুরুষ হম নারী।
লাজ মোকু আবত ভারী।
ঝট্ দ্যো মেরো চীর মোরারীরে, ঝট্ দ্যো মেরো চীর।
তুম তো কুঁবর নন্দলাল কহাবে মেঁ ভ্রখুভান দুলারী
. হাঁরে লালা মেঁ ভখুভান দুলারী।

মীরা কে প্রভু গিরধরনা গুণ্ তুম জীতে হম্ হারী।
চরণপর জাউঁ বলিহারী
ঝট্ হো মেরো চীর মোরারীরে, ঝট্ হো মেরো চীর।
শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন : "জো রাধা তেরো চীর চহাবত
জলমে হোজা ন্যারী।"

কিন্তু রাধার লজ্জা তখনও যায় নি, তিনি জবাব দিলেন ;—তা হয় কেমন করে ? তুমি যে পুরুষ, আমি যে রমণী।

তাঁর চরণে যখন আত্মনিবেদন করব তখন কি আর কিছু বাকি রাখলে চলবে ? এমন অপূর্ণ নিবেদনে কি তাঁর তৃপ্তি হয় ? তিনি যখন তোমাকে গ্রহণ করবেন তখন তোমার লজ্জার বন্ধন তোমাকে বিপরীত দিকে আকর্ষণ করবে। তাঁর প্রেম যমুনার শীতল স্নিগ্ধ জল কুলুকুলু স্বরে ডাক দিয়েছে। বলছে—

নীলাম্বরে কী বা কাজ তীরে ফেলে এসো আজ
ঢেকে দিবে সব লাজ সুনীল জলে।

এমন শুভদিন জীবনে আসে না। তোমার লজ্জা রাখবেন তিনি, তাঁরই হাতে তার ভার তুলে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হও। এ তোমার হার নয়, এ তোমার জিত।

"মীরা কে প্রভু গীরিধরণা গুণ্
তুম্ জীতে হম্ হারী।"

তোমার জয় আমার হার—এই তো জগতের বিধান। তাতেই তো আমার গৌরব।

তোমার কাছে যে হার মানি, সেই তো আমার জয়।'—অতীতের কবির গানে যেটুকু বাকি ছিল বর্তমানের কবি তা পূর্ণ করে গেয়েছেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর গুজরাটী সাহিত্যাকাশে যে দুই ভাস্বর জ্যোতিষ্কের উদয় হয় আজ পর্যন্ত তাঁদের অম্লানদ্যুতি সমগ্র প্রদেশকে উজ্জ্বল রেখেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পদ্মনাভ, ভালন প্রভৃতি আরও কয়েকটি কবির আবির্ভাব হয় বটে কিন্তু মীরা ও মেহেতার কাব্যপ্রভায় তাঁদের অনতিপ্রখর দীপ্তি তেমন করে প্রকাশ পায় নি। তারপর প্রায় এক শতাব্দী কাল ধরে সাহিত্যের ক্ষেত্রে গুজরাট তেমন কোন চিহ্ন রাখতে পারে নি।

সপ্তদশ শতাব্দীতে এলেন কবি প্রেমানন্দ। মরা নদীতে আবার বন্যা বইল। তাঁর কাব্যস্রোত গুজরাটের বুকে প্রবাহিত হল প্রায় পুরো একশ এছর ধরে—সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। সংস্কৃত সাহিত্যে এঁর পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। সংস্কৃতের অবিনশ্বর রত্নভাণ্ডার থেকে বহুমূল্য মণি-কাঞ্চন আহরণ করে তিনি মাতৃভাষার জ্ঞানকোষ পূর্ণ করেছিলেন।

সার্থকনামা ছিলেন এই কবি। বস্তুতঃ তাঁর কাব্যবারিধি যেমন প্রেমে উচ্ছল তেমনি অনিন্দে উদ্বেল। স্বরচিত কাব্যরাশির স্মৃতিস্তম্ভে তিনি মহাকালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে অনন্তকাল ধরে বিরাজ করবেন একথা জোর করে বলা যায়।

এই যুগে আরও কয়েকজন উচ্চ দরের কবি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সামল ভট্টের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবি হিসাবে সামল প্রেমানন্দের চেয়ে নিম্নস্তরের হলেও তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তুর জন্য তিনি জনসাধারণের হৃদয় হরণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন শক্তিমান আখ্যান-লেখক। আর তাঁর সকল উপাখ্যানের উপাদানই তিনি সংগ্রহ করতেন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অতি সাধারণ এবং স্বাভাবিক ঘটনাবলীর মধ্যে থেকে। তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রখর এবং সেই জন্যে চতুর্দিকে যখন যা কিছু ঘটছে—যত তুচ্ছই তা হোক না কেন—সুকৌশলে তাঁর রচনার মধ্যে সেগুলিকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন। একাজ নিতান্ত অল্প শক্তির কাজ নয়।

এঁদের সমসাময়িক আর একজন কবির নাম না করলে এ তালিকা অসম্পূর্ণ থাকবে। তাঁর নাম হচ্ছে আখো। তাঁর রচিত কবিতাগুলিকে গুজরাটীরা 'চাবুক' আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর সরস বিদ্রূপ চাবুকের চেয়েও ভীষণ, তাঁর তীব্র শ্লেষ বিষাক্ত তীরের চেয়েও জ্বালাকর। সমাজের মধ্যে যারা সব ধর্মধ্বজী, ভণ্ড বিষকুম্ভ পয়োমুখ নরনারী—তারাই তাঁর কাব্যের নায়ক নায়িকা। কাজেই তাঁর চাবুকের আঘাতটা আহতদের পক্ষে যেমন দুঃসহ হ'ত—অপরের কাছে হত তেমনি উপভোগ্য। প্রেমানন্দ, সামল ও আখো এঁদের কবিতার ত্রিবেণীসংগমে সমগ্র গুজরাট অবগাহন করে তৃপ্ত হল।

তারপর আবার পড়ল ভাঁটা, আবার এল প্রতীক্ষার যুগ। এই প্রতীক্ষার অবসান হল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে।

এই সময়টাকে দয়ারামের যুগ বলা যেতে পারে। প্রাচীন রীতির শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে সেই মেহেতা ও মীরার আত্মোৎসর্গের প্রাণহরণ সুর আবার নূতন ছন্দে বেজে উঠেছে। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করেছেন গোপীভাবে। তাঁর কাব্যে কবি ও গোপী অভিন্ন। এই তাঁর বিশেষত্ব।

প্রেমানন্দ বা তাঁর সমসাময়িক কবিদের পর থেকে দয়ারামের যুগ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনো কবিরই আবির্ভাব হয় নি তা নয়। দয়ারামের স্তরের না হলেও তাঁর পূর্বেকার অনেক কবিই তাঁদের রচনাবলীর দ্বারা সাহিত্যে স্থায়ী আসন রেখে গেছেন। কিন্তু এ প্রবন্ধে সকলের নাম করা সম্ভব নয়। তবে তাঁদের মধ্যে একজনের নাম করা বিশেষ দরকার। তিনি হচ্ছেন বল্লভ ভট্ট। গুজরাটের সুপ্রসিদ্ধ এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় সংগীত 'গরবা'র নাম বাঙালীদের মধ্যেও অল্প পরিচিত নয়। এই বল্লভ ভট্ট গরবা গানকে সাহিত্যের দরবারে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ গুজরাটের সাহিত্যজগতে এক নবযুগের সূচনা করে। এই সময়েই পশ্চিম তার জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, শিক্ষা-সংস্কৃতির অমূল্য রত্নভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত করে দিলে ভারতের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে। আহরণের ধুম পড়ে গেল চতুর্দিকে প্রদেশে প্রদেশে। ভারতের এ যুগের সকল সাহিত্যেই তার অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান। গুজরাটেও এর অভাব নেই, বরং প্রাচুর্যই দেখা যায়। গুজরাটের পার্শী সম্প্রদায় ইউরোপীয় ভাবকে ভাল মন্দ নির্বিশেষে প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যেও যে পরিমাণ গ্রহণ করেছেন ভারতের আর কোনো জাত তা করেছে কিনা জানি না। এই পার্শীদের মধ্যে ঐ সময়ে কয়েকজন বড় বড় লেখক দেখা দিলেন।

ইংরাজী সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যে সকল ভাবধারার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটল গুজরাটীর বাহকতায় সেগুলি তাঁরা দেশবাসীর মধ্যে বিতরণ করতে লাগিলেন। গুজরাটী হিন্দুরাও এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ রইলেন না। তাঁরাও প্রবল উৎসাহে এ-কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ইংরেজদের আগমনে ইংরেজী ভাষার দিকেই ঝোঁক পড়েছিল বেশী—আর তার ফলে মাতৃভাষার উপরে এসেছিল অবজ্ঞা। এখন সে ভাবটা কেটে গেল—নূতনতর সম্পদে মাতৃভাষার ভাণ্ডার পূর্ণ করবার দিকে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উৎসাহ দেখা গেল। এই সময়কার উদ্‌যোগী

পুরুষদের মধ্যে প্রধান ছিলেন দলপতরাম, আর রাজকর্মচারী আলেকজাণ্ডার ফোর্বস্। ফোর্বস্ বিদেশী হয়েও এ দেশীয় ভাষার শিক্ষা ও প্রচারের জন্ম যা করেছিলেন সমগ্র গুজরাট তার জন্মে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে। ১৮৫৩ সালে তিনি দলপতরামের সহযোগিতায় গুজরাট ভার্নাকুলার সোসাইটি নামে একটি সভা স্থাপন করেন। দলপতরাম বরাবরই এর সম্পাদক ছিলেন, পরে এই সভার নাম হয় ফোর্বস্ গুজরাট সোসাইটি, আর এই সভার উদ্যোগে দলপতরাম বুদ্ধিপ্রকাশ নামক একটি মাসিকপত্র বের করেন। গদ্যসাহিত্য এই যুগে প্রথম দেখা দিল। কাব্যসাহিত্যেও একটা নতুন ধারা বইল। কবিতার মধ্য দিয়ে দেশভক্তি প্রচারিত হতে লাগল। সুপ্ত দেশকে সঞ্জীবিত করবার জন্তে যাঁরা লেখনী ধরেছিলেন কবি নর্মদ ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান।

এই সময় গুজরাটের ধর্মজগতে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এক প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হল। এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন ভোলানাথ সারাভাই। তাঁর কয়েকটি ভজন এবং কবিতা ও-দেশের সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

এই আন্দোলনের উৎস হচ্ছে উপনিষদ্। কাজেই এই আন্দোলনকে উপলক্ষ করে যে সাহিত্য রচিত হ'ল তার মধ্যে সংস্কৃতের প্রভাব পড়ল প্রচুর পরিমাণে। তদানীন্তন ধর্ম ও সমাজ সমস্যার অতি সুন্দর আলোচনা করেছেন সুপণ্ডিত গোবর্ধনরাম ত্রিপাঠী তাঁর সরস্বতীচন্দ্র নামক সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকে। গোবর্ধনরাম শুধু সংস্কারক ছিলেন না, তিনি ছিলেন সুদক্ষ গদ্য-লেখক। তিনিই প্রথম গুজরাটী গদ্যকে একটা স্থায়ী রূপ দিয়েছিলেন। সংস্কৃতবহুল হলেও গুজরাটে তাঁর গদ্যভঙ্গী অনেকদিন যাবৎ আদর্শ বলে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। তরুণ লেখকদের মধ্যে অবশ্য গদ্যভাষাকে যতদূর সম্ভব সংস্কৃত প্রভাব থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা খুব উৎসাহের সঙ্গেই চলছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে আজ পর্যন্ত, এই কয় বছরের মধ্যে গুজরাটী সাহিত্য শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে চারিদিকে ছেয়ে ফেলেছে। নাটক, উপন্যাস, কাব্য, ইতিহাস, দর্শন, শিশুসাহিত্য—সব শাখাতেই ফল ধরতে আরম্ভ করেছে। নন্দশঙ্কর, মুন্সি, কামেলকার, কলাপী, বোটেদকার, খবরদার[১]

[১] ছদ্মনাম।

প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকরা গুজরাটী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। মহাত্মাজীর আত্মজীবনী গুজরাটী সাহিত্যের এক অপূর্ব সম্পদ। উপরে যে কালেলকারের নাম করেছি তিনি গুজরাটে কাকা কালেলকার নামে পরিচিত—যেমন আমাদের সার্বজনীন দাদা ছিলেন জলধর সেন। আবার মজার কথা এই যে কাকা কালেলকারের রচিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ বইখানির নাম 'হিমালয়নু প্রবাস'।

বাঙ্গালী আমরা—আমাদের আনন্দ করবার বিষয় এই যে গুজরাটে বাঙ্গলা সাহিত্য অশেষ সম্মান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি বঙ্গবাণীর বরপুত্রগণের মনীষা সেখানে সসম্মানে পূজিত হয়েছে। এঁদের অনেক বই-ই গুজরাটীতে অনূদিত হয়েছে।

এ যুগের বহু লেখক উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য রচনা করেছেন, নূতন লেখকরা নূতনতর পরিকল্পনায় ভাষালক্ষ্মীর সর্বাঙ্গ নব নব আভরণে ভূষিত করছেন। আজ ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে ভাষা-জননীর অর্চনার জন্য নৈবেদ্য আহরণের যে উদ্‌যোগ চলেছে গুজরাটেও তার ত্রুটি নেই।

গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতী

বাঙ্গালা দেশে রাজা গোবিন্দচন্দ্র বা গোপিচাঁদের নাম তেমন সুপরিচিত নয়। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে গোবিন্দচন্দ্র এবং তাঁহার মাতা ময়নামতীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বাঙ্গালা দেশের উত্তরাংশে গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে যে সব গ্রাম্য গাথা এবং গান প্রচলিত আছে তাহার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী বিষয়ক কয়েকটি পুস্তকও প্রকাশিত হইয়াছে। গোবিন্দচন্দ্র বা তাঁহার মাতার জীবনকাহিনী সর্বসাধারণের কাছে প্রচার করা এই সকল পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। সম্পাদকগণ ভাষা সাহিত্য এবং ধর্মের তত্ত্বপিপাসু পণ্ডিতের এবং তত্ত্বান্বেষী বিদ্যার্থীর সাহায্যকল্পেই এই সকল পুস্তক প্রকাশে মনোযোগী হইয়াছেন।

গ্রিয়ার্সন সাহেবের সংকলিত "মাণিকচন্দ্রের গান", নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত সম্পাদিত "ময়নামতীর গান", নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত "গোপিচান্দের গীত", শিবচন্দ্র শীল সম্পাদিত "গোবিন্দচন্দ্র গীত"—গোপীচাঁদের আখ্যান প্রসঙ্গে এই পুস্তকগুলির নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বটতলা বা বঙ্গবাসী সংস্করণ পুস্তকের দ্বারা যে কাজ পাওয়া যায় এ সমস্ত বইয়ের দ্বারা সে কাজ পাওয়া অসম্ভব, পাওয়ার আশা করাও উচিত নয়। আজ ফুল্লরা কালকেতু, বেহুলা লখিন্দর, লহনা খুল্লনা, শ্রীমন্ত ধনপতি বাঙ্গালীর কাছে যে ধরণের পুস্তকের সাহায্যে ঘরের লোক হইয়া উঠিয়াছে ময়নামতী বা গোপিচাঁদের আখ্যান সম্বন্ধে সে রকম পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় বিরল। প্রাদেশিক ভাষার রূপ অব্যাহত রাখিবার জন্য সুপণ্ডিত সম্পাদকগণ পুঁথির লেখা যেমন আছে তেমনই ছাপেন। তত্ত্বসন্ধের কাছে তাহার মূল্য আছে, কিন্তু যে গল্প চায় তাহার কাছে সে ভাষার মূল্য কি ?

আজ বঙ্গের এক উত্তরাংশ ব্যতীত অন্য কোথাও গোবিন্দচন্দ্রের নাম শোনা যায় না; কিন্তু বঙ্গের বাহিরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এই বাঙ্গালী রাজার নামে গান ও কাহিনী অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

উত্তরবঙ্গে প্রচলিত গোপিচাঁদের আখ্যানগুলি কিংবদন্তী অবলম্বনে রচিত। গোপিচাঁদ বিষয়ক যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদেরও কোনোটির মধ্যে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য নাই। বস্তুতঃ আখ্যানকারগণ সাল তারিখ মিলাইয়া গোবিন্দচন্দ্রের জীবনচরিত লিখিতে বসেন নাই। চমৎকার গল্প শুনাইয়া শ্রোতা ও পাঠকের মনোরঞ্জন করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। দু-দশ জায়গায় সত্যের অপলাপ হইবে না—এমন প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহারা গল্প রচনা করেন নাই।

প্রকাশিত যে কয়টি গ্রন্থের নাম করা হইয়াছে এগুলিও গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত আখ্যান ও কিংবদন্তীরই অসংস্কৃত সংস্করণ, ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হইলেও মৌখিক উপন্যাসের সহিত ইহাদের প্রকৃতিগত মিল আছে। ইহারাও গল্প মাত্র, ইতিহাস নহে।

তবে এই সমস্ত গল্পের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল আছে। চরিত্রের নামে, স্থানের নামে এমন কি কাহিনীর নানা অংশেও ভিন্ন ভিন্ন বইয়ের মধ্যে কিছু কিছু সংগতি দেখা যায়। মূল কাহিনীতে মিল তো আছেই।

প্রকাশিত সব কয়টি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালী রাজা গোবিন্দচন্দ্র এবং তাঁহার মাতা ময়নামতীর কাহিনীটি সংকলন করা হইয়াছে। গোবিন্দচন্দ্রের ইতিহাস সম্বন্ধে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, দীনেশচন্দ্র সেন, নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রমুখ উপাধ্যায়গণ অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে কাহিনীটি জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হউক এই কামনা করি। বাঙ্গালা দেশের যাত্রা, থিয়েটার এবং সিনেমায় খাঁটি বাঙ্গালার কাহিনীগুলি বরাবর সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল—এমন কি পূর্ববঙ্গের ছড়াগুলিও নাট্যরূপ পাইয়াছে। গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনীর মধ্যে নাট্যসম্ভাবনা অল্প নয়। এ বিষয়ে যাঁহারা চিন্তা করেন তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

প্রায় নয় শত বৎসর পূর্বে মেহারকুল অঞ্চলে তিলকচন্দ্র নামক এক প্রজারঞ্জক ও পুণ্যশীল নরপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার দুই কন্যা. জ্যেষ্ঠার নাম ময়নামতী এবং কনিষ্ঠার নাম সিন্দুরমতী। তখন বিক্রমপুরের রাজা ছিলেন মাণিক্যচন্দ্র। এই মাণিক্যচন্দ্র বা মাণিকচাঁদের সহিত রাজকন্যা

ময়নার বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহকালে বয়স অত্যন্ত অল্প ছিল বলিয়া ময়না পিতামাতাকে ছাড়িয়া এক সঙ্গে অনেক দিন শ্বশুরালয়ে থাকিতে পারিতেন না, মধ্যে মধ্যে পিত্রালয়ে আসিয়া বাস করিতেন।

সেইকালে গোরক্ষনাথ নামক এক সিদ্ধ যোগীর আবির্ভাব হয়। তিলকচন্দ্রের রাজবাটীতে এই যোগীর যাতায়াত ছিল, সেখানে তিনি বালিকা ময়নামতীকে প্রায়ই দেখিতেন। ময়নাকে দেখিয়া তাঁহার মনে স্নেহের সঞ্চার হইল। তিনি মনস্থ করিলেন, ইঁহাকে মহাজ্ঞান শিক্ষা দিবেন। অনন্তর বালিকার সম্মুখে গোরক্ষনাথ স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে ময়নামতী সানন্দে তাঁহার নিকটে দীক্ষা লইতে সম্মত হইলেন। দীক্ষা দানের জন্য যে সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রয়োজন সে সকল সম্পন্ন হইলে মন্ত্র গ্রহণের যোগ্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য যোগিবর ময়নামতীকে দ্বাদশ বৎসরের আহার্য মুহূর্ত মধ্যে প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ দিলেন। আজ্ঞামাত্র ময়না পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া কাঁচা হাঁড়ি ও কাঁচা পাতিলে অন্ন রন্ধন করিলেন এবং সোনার থালে সেই অন্ন বাড়িয়া ঘৃত, আউটা দুগ্ধ এবং চম্পা কলা সহযোগে তাহা গুরুর নিকট উপস্থিত করিলেন। তখন

"অন্ন লইয়া গোরক্ষনাথ মনে মনে ঘুণে।
সতী কি অসতী কন্যা বুঝিব কেমনে।"

সতীত্ব পরীক্ষার নিমিত্ত

"বার সূর্যের তাপ সিদ্ধা তলপ করিল।
যতেক সূর্যের তাপ মৈনার গায়ে দিল॥"

এক সূর্যের তেজই মানুষ সহ্য করিতে পারে না কিন্তু দ্বাদশ সূর্যের তেজ ময়নামতীর অবলীলাক্রমে সহ্য করিলেন। গোরক্ষনাথ বুঝিলেন এই কন্যার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। ময়নার হস্তের অন্ন গ্রহণে আর কোন বাধা রহিল না দেখিয়া গোরক্ষযোগী আহারে বসিলেন এবং ময়নামতী ভক্তি সহকারে গুরুর মস্তকে আরাঙ্গিছত্র ধরিয়া রহিলেন।

"তা দেখিয়া গোর্খনাথ মনে মনে গুণে।
এমন্ সুন্দরী যাইবে যমের ভবনে।"

না, যেমন করিয়াই হউক ইহার মৃত্যু রহিত করিতে হইবে। এই মহীয়সী রমণীকে অমর করিয়া মেহেরকুলে একটা কীর্তি রাখিয়া যাইব। ইহা স্থির করিয়া গোরক্ষনাথ সেই দিন হইতেই শিষ্যার শিক্ষা দীক্ষায় মনোযোগ দিলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং গভীর অধ্যবসায়ের ফলে ময়নামতী অচিরকাল মধ্যেই মন্ত্রে তন্ত্রের বিচক্ষণ হইয়া উঠিলেন। গুরুর আশীর্বাদে জরা-মৃত্যু-ব্যাধি তাঁহার করতলগত হইল। স্বয়ং যমরাজ খত লিখিয়া দিলেন—তাঁহার শরীর অগ্নিতে দগ্ধ হইবে না, জলে ডুবিবে না, অস্ত্রে বিদ্ধ হইবে না। অধিক কি

গুরু বোলে দিনে মৈলে মৈনামতী আই।
সূর্য বান্দি মাঙ্গাইব এড়া এড়ি নাই॥
রাত্রিতে পড়িয়া মৈলে মএনামতী আই।
চন্দ্র বান্দি মাঙ্গাইব এড়া এড়ি নাই॥

মূর্খ স্বামীর ভাগ্যে বিদুষী পত্নী জুটিলে গৃহধর্ম পালন করা অনায়াসসাধ্য হয় না, সংসার পথ দুর্গম হইয়া পড়ে; মাণিকচন্দ্রেরও তাহাই হইল। স্ত্রীর শক্তির পরিচয় পাইয়া তিনি সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিতেন। বাহিরে যতই পৌরুষ দেখান না কেন, মনে মনে তিনি স্ত্রীকে সর্বদাই ভয় করিয়া চলিতেন। এই হেয়তাবোধগ্রন্থি রাজা মাণিকচন্দ্রকে অষ্টপ্রহর পীড়িত করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে আর একটা ব্যাপারে রাজা স্ত্রীর উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইলেন। একদিন ময়না ধ্যানে বসিয়া জানিতে পারিলেন যে মাণিক্যচন্দ্রের পরমায়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে। ইহা বুঝিতে পারিয়াই তিনি স্বামীকে বিরলে ডাকিয়া মহাজ্ঞান শিখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মহাজ্ঞান সাধন ব্যতীত বিধাতার নির্দিষ্ট পরমায়ু বৃদ্ধি করিবার আর কোন উপায় নাই। আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য পতিব্রতা পত্নী স্বামীকে সেই গুপ্ত মন্ত্র দান করিতে অভিলাষী হইলেন।

কিন্তু স্ত্রীর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিতে মাণিক্যচন্দ্রের পৌরুষে বাধিল। পুরুষ হইয়া নারীর নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে রাজ্যের লোক তাঁহাকে উপহাস করিবে, লজ্জায় লোকসমাজে তাঁহার মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। স্ত্রীলোক পুরুষের, বিশেষতঃ স্বামীর গুরু হয় এমন কথা তো কেহ কোথাও শুনে নাই, কোন শাস্ত্রেও এরূপ বিধান দেখা যায় না। তিনি বীরের ন্যায় উত্তর করিলেন:

জন্মিলে মরণ আছে সর্বলোকে কএ।
আমি হব নারীর সেবক মরণের ভয়ে॥

অকালে মরি মরিব তথাপি স্ত্রীকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না।

এই পৌরুষদর্পীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বিচলিত হইবার নয়—ইহা বুঝিতে পারিয়া ময়না অতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। কারণ, তিনি জানিতেন মহাজ্ঞান ব্যতীত মৃত্যুদেবতার আক্রমণ রোধ করিতে পারে এমন শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কাহারও নাই।

দৈব অলঙ্ঘনীয়, তাহা না হইলে রাজা মন্ত্র গ্রহণ করিতে অসম্মত হইবেন কেন? ময়নামতী বারংবার ইহাই ভাবেন। হায় হায় শক্তি থাকিতেও পতির প্রাণ রক্ষা করা অসম্ভব হইল? একেবারে নিরাশ না হইয়া পুনরায় চেষ্টা করিলেন, যদি রাজার মতের পরিবর্তন হয়, কিন্তু রাজার সেই উত্তর—প্রাণের জন্য কাতর হইয়া পত্নীর নিকটে জ্ঞান লইব না। স্ত্রীর শিষ্য হইয়া প্রাণলাভ করা অপেক্ষা মৃত্যুও অনেক গুণে শ্রেয়।

বার বার প্রত্যাখ্যাত হইয়াও ময়নামতী মধ্যে মধ্যে রাজাকে উপদেশ দিতে ছাড়েন না; অবশেষে রাজা ময়নার উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়া আর কয়েকটি বিবাহ করিলেন এবং প্রথমা পত্নীর সাহচর্য যতদূর সম্ভব এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন।

নূতন বধূগণের মধ্যে দেবপুরের পাঁচটি সুন্দরী কন্যা ছিলেন। ইহাদের প্রতিই রাজার প্রগাঢ় অনুরাগ পরিলক্ষিত হইল।

নবীনা সপত্নীগুলি স্বামীর প্রেম পাইলেও সংসারের কর্তৃত্বভার জ্যেষ্ঠার হাতেই রহিয়া গেল। দেবপুরিকাগণ ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, সুতরাং কোন্দল বাধিল। তাঁহারা কর্তা এবং কর্তৃত্ব উভয়কেই চান, একটি লইয়া সুখী হইবেন কেন? রাজা কলহের মীমাংসা করিতে গিয়া নবতনীদেরই পক্ষ লইলেন এবং প্রথমা পত্নীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া ফেরুসা নামক নগরে পাঠাইয়া দিলেন। রাজবধূ ময়না সেখানে গিয়া একটি ক্ষুদ্র কুটীর বাঁধিয়া অনাথিনীর ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। একদিকে সুসজ্জিত প্রাসাদে বহুপত্নী-পরিবৃত হইয়া

"মহারাজা রাজ্য করি খায় পাটের উপর।"

আর অন্য দিকে

"মএনামতী চরকা কাটি ভাত খায় বন্দরের ভিতর॥"

মাণিকচাঁদের রাজত্বে নির্ধন বলিয়া কেহ ছিল না। দেশে সোনারূপার ছড়াছড়ি। কৃষকের পুত্র যে, সেও সোনার ভাটা লইয়া নির্ভয়ে খেলা করে। যে কাঠ-পাতা বিক্রয় করিয়া সংসার চালায়, হাতী না চড়িয়া সেও বেড়াইতে বাহির হয় না। যে নিতান্ত দরিদ্র সেও খাসা তাজী ঘোড়ায় চড়ে, চাটাই বিছাইয়া হীরা মণি মাণিক্য শুকাইতে দেয়। প্রত্যেকের বাড়িতেই বড় বড় পুষ্করিণী, কেহ অপরের পুষ্করিণী হইতে জল আনিবার প্রয়োজন অনুভব করে না।

ঋণ কাহাকে বলে দেশে কেহ জানে না। গৃহস্থের মেয়েরা সোনার কলসীতে জল আনে এবং সোনার পাছড়া পরিধান করে। দাসী পর্যন্ত পাটের কাপড় পরিতে ঘৃণা বোধ করে। মাণিকচাঁদের রাজত্বকে লোকে রাম রাজত্বের সঙ্গে তুলনা করে বটে, কিন্তু এত সুখ এত ঐশ্বর্য বোধ হয় রামচন্দ্রের রাজত্বেও ছিল না। কিন্তু এহেন রাজত্বেও দুঃখ দারিদ্র্য দেখা দিল। ময়নামতীর ফেরুসাগমনের পর হইতেই মাণিকচন্দ্র পীড়িত হইলেন, রাজকর্মচারিগণ সুযোগ পাইয়া ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতে লাগিল। অধিক অর্থ উপার্জনের আশায় দেওয়ান কর বৃদ্ধি করিয়া দিল। শেষে এমন অবস্থা হইল যে প্রজারা আর কর দিতে পারে না। কৃষক লাঙ্গল ও বলদ বিক্রয় করে, ফকির দরবেশকে ঝোলা কাঁথা বেচিতে হয়, সাধু সদাগর নৌকা বেচিয়া রাজার কর দেয়। এমন কি

খাজনার তাপত বেচে দুধের ছাওয়াল।

রোগশয্যায় শুইয়া মাণিকচাঁদ সবই শুনিতেছেন। কিন্তু তিনি করিবেন কি? শয্যা হইতে উঠিবার পর্যন্ত তাঁহার সামর্থ্য নাই। প্রজাদের জন্য চিন্তা করিয়া করিয়া তাঁহার রোগ আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ময়নামতীর জন্যও যে হৃদয়ের এক কোণে একটু বেদনা ছিল না তাহাই বা কে বলিতে পারে? দূর দেশান্তর হইতে কত বৈদ্য কত ধন্বন্তরি আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের ব্যবস্থা মত নানা রকমের ঔষধ ও পথ্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া রাজার পীড়া উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। ওদিকে স্বর্গে বসিয়া শমন রাজা চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মাণিকচন্দ্রের আর কত বাকী? চিত্রগুপ্ত দপ্তর দেখিয়া উত্তর দিলেন—ছয় মাস।

একদিন দুইদিন করিয়া দেখিতে দেখিতে ছয়মাস প্রায় অতিবাহিত হইতে চলিল। মাণিকচন্দ্রের জীবন প্রদীপও প্রায় নিবু নিবু হইয়া আসিয়াছে। বিধাতৃদেবের আজ্ঞা পাইয়া গদা নামক যমদূত 'চামের দড়ি' এবং লোহার 'ভাজ' সহ উপস্থিত। আব কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই রাজার প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে। রাজা বুঝিতে পারিলেন—আর বিলম্ব নাই সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে।

মৃত্যুকালে সকলের সঙ্গেই দেখা হইল। রাজা আশা করিয়াছিলেন, ময়নামতীও দেখা করতে আসিবেন কিন্তু তিনিই কেবল আসিলেন না। ময়নামতী নারী হইলেও সাধারণ স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার অনেক বিষয়ে পার্থক্য ছিল। অতিশয় দুঃখের কারণ ঘটিলেও তিনি বিহ্বল হইতেন না এবং পরম আনন্দের সময়েও শান্ত ও সংযত থাকিতেন। স্বামীর মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী তখন সেখানে গিয়া অন্যান্য সপত্নীর সহিত নিষ্ফল রোদন কবিযা কোন লাভ নাই। মৃতসঞ্জীবনী ত্যাগ করিয়া হলাহল সেবন করিতে যে ব্যক্তি বদ্ধপরিকর, তাহার নিকটে গিয়া অশ্রুবিসর্জন করা কি একান্ত নিরর্থক নয়?

মৃত্যু রোধ করিবার শক্তি তাঁহার ছিল এবং সে শক্তি তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া প্রয়োগ কবিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু মাণিকচাঁদ তাহা গ্রহণ করেন নাই, এখন কেবলমাত্র চক্ষুজল সম্বল করিয়া মুমূর্ষু স্বামীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইতে তাঁহার ইচ্ছা হইবে কেন? মরণসাগরের প্রান্তদেশে দাঁড়াইয়া আজ মাণিকচাঁদের মনে অন্য চিন্তা নাই। অতিদূরে যাহার অবস্থান কেমন করিয়া সে-ই যেন আজ আপনার জন হইয়া উঠিল। পৃথিবীর কাছে শেষ বিদায় লইবার পূর্বে তিনি একবার ময়নাকে দেখিবার ইচ্ছা জানাইলেন। রাজবাক্য লইয়া বার্তাবহ ফেরুসা নগরে ময়নামতীর কুটীরে আসিয়া অভিবাদনান্তে নিবেদন করিল:

ছয়মাসের কাহিলা রাজা মহলের ভিতর।
দেখা করিবারে চায় রাজরাজেশ্বর॥

সংবাদ শুনিয়াই ময়নামতী ধ্যানে বসিলেন এবং মুহূর্তমধ্যে রাজার অবস্থা জ্ঞাত হইয়া বেঙ্গাপাত্রের সহিত রাজবাটী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে পৌছিতেই

যখন ধর্মী রাজা ময়নাকে দেখিল।
কপালে মারিয়া চড় রাজা কান্দিতে লাগিল॥

যিনি একদিন দর্পভরে বলিয়াছিলেন—জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে, সেই বীরই আজ প্রাণভয়ে অত্যন্ত কাতর হইলেন।

ময়না প্রবোধবাক্যে রাজাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—মহারাজ, চিন্তা করিও না, আমি থাকিতে মৃত্যু তোমার কি করিতে পারে? আমার একটি মাত্র বাক্য রক্ষা কর, শমন রাজার কোন অধিকার তোমার উপরে থাকিবে না।

কিছু জ্ঞান কহি দিমু আড়াই অক্ষর।
পৃথিবী টলিলে না যাইবে যমঘর॥

এখনও সময় আছে, মহাজ্ঞান গ্রহণ করিয়া অক্ষয় যৌবন এবং অনন্ত জীবন লাভ কর। গর্বান্ধ হইয়া মহামূল্য প্রাণ বৃথা নষ্ট করিয়া লাভ কি?

মহাজ্ঞানের প্রস্তাবে রাজার সুপ্ত চৈতন্য আবার জাগরিত হইল। মনের সকল দুর্বলতা নিমেষমধ্যে দূর হইয়া গেল। অকম্পিত কণ্ঠে রাজা উত্তর করিলেন—প্রাণভয়ে ভীত হইয়া রাজা মাণিক্যচন্দ্র স্ত্রীর জ্ঞান গ্রহণ করিবে না। পূর্বের সূর্য পশ্চিমে উদয় হইলেও মাণিক্যচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা অটল।

ময়না বুঝিলেন—বিধাতার এইরূপই ইচ্ছা, তাহা না হইলে আসন্ন মৃত্যু দেখিয়াও রাজার মতি পরিবর্তিত হইল না কেন?

মহাজ্ঞান গ্রহণ করিতে রাজা কোনরূপে স্বীকৃত হইলেন না দেখিয়া ময়নামতী স্বীয় শক্তির দ্বারা স্বামীর মৃত্যু রোধ করিবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। রাজার শয়নকক্ষে চারিটা রক্ষাপ্রদীপ জ্বালাইয়া দেওয়া হইল, প্রদীপগুলি দিবারাত্র জ্বলিতে থাকিল। তাহার পর

চাইর কলসী জল থুইলে বিরলে ভরিয়া।
যেই রোগের যেই দাওয়া আনিল ধরিয়া॥

ঔষধপত্র প্রস্তুত হইলে ময়নামতী গুরু স্মরণ করিয়া স্বামীর পদতলে বসিলেন। বসিতেই দেখিলেন কৃষ্ণদেহ ভীষণ-আকৃতি এক পুরুষ পাশ এবং দণ্ড ধারণ করিয়া রাজার শিয়রে দণ্ডায়মান। ময়নার কিছু অজ্ঞাত ছিল না, এই বিরাটকায় পুরুষটিকে দেখিয়াই তিনি বুঝিলেন—ইনি শমনের প্রেরিত জনৈক দূত এবং মাণিক্যচন্দ্রের প্রাণ লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যেই ইহার এস্থানে পদার্পণ। তথাপি প্রশ্ন করিলেন—হে নবাগত, ইতিপূর্বে রাজগৃহে তোমাকে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া ত স্মরণ হয় না। তোমার পরিচয় কি? কোথা হইতে তোমার আগমন? কেনই বা তুমি রাজার শিরোদেশে দাঁড়াইয়া আছ? গোদা যম আত্মপরিচয় দিয়া উত্তর করিল—বিধাতার আদেশে তোমার স্বামার প্রাণপুরুষকে লইয়া যাইবার জন্য এস্থানে আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া ময়না অনুনয় বিনয় করিয়া যমদূতের নিকট স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন। যমদূত উত্তর করিল—আমি আজ্ঞাবহ মাত্র, প্রাণ ভিক্ষা দেবার আমার তো কোন অধিকার নাই। কিন্তু ময়না তাহার কথায় কান না দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ময়নার ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া এবং পুরস্কারস্বরূপ একটি টাঙ্গন লাভ করিয়া গোদা যম সেদিনকার মত ফিরিয়া আসিল।

প্রথম দিন আসিয়াছিল একজন, দ্বিতীয় দিন আসিল দুইজন, তৃতীয় দিনে সংখ্যা আরও বাড়িল। এই ভাবে গোদা যম সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া প্রতিদিনই মাণিকচাঁদের বাড়ি যাতায়াত করিতে লাগিল এবং ময়নামতীও প্রতিদিন ধন-রত্ন দিয়া যমকে ফিরাইয়া দিতে লাগিলেন। অবশেষে যমদূতকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মনুষ্যজীবন পর্য্যন্ত দান করিতে হইল। স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য ময়না নিজের ভ্রাতাকে যমদূতের হাতে সমর্পণ করিলেন। ভেট পাইলে যমদূত একদিনের জন্য রাজাকে ত্যাগ করিয়া যায় আবার পরদিনই বহু অনুচর সহ দেখা দেয়। এইভাবে কিছুদিন চলিল, রাজভাণ্ডার শূন্য হইয়া গেল, হস্তিশালার সব হস্তী, অশ্বশালার সব অশ্ব শেষ হইল। যমদূতের হাতে অর্পিত হইবার ভয়ে দাস-দাসী, আত্মীয়-স্বজন বাড়ি ছাড়িয়া প্রস্থান করিল। এবার ময়না প্রমাদ গণিলেন। এখন কেমন করিয়া যমকে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন তাহা ভাবিয়া রাণীর মনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সীমা রহিল না।

শেষে স্থির করিলেন—অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা কে লঙ্ঘন করিতে পারে? তথাপি আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিব। যদি স্বামীর মত পরিবর্তন করিতে পারি। এই সংকল্প করিয়া ময়না স্বামীর চরণ ধরিয়া গলদশ্রুনয়নে বলিলেন—প্রিয়তম, এখন আমার কথা রাখ। মানুষের জীবন অবহেলার বস্তু নয়। সামান্য জিদের বশবর্তী হইয়া তাহা ত্যাগ করা তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে শোভা পায় না। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এবার যমদূত আসিলে আর বোধ হয় তাহাকে বাধা দিতে পারিব না। মহারাজ, আর প্রত্যাখ্যান করিও না। স্ত্রীলোক বলিয়া আমাকে সহস্রবার উপেক্ষা করিতে পার—তাহাতে আমি দুঃখ করিব না, কিন্তু মহাজ্ঞান তো তাচ্ছিল্যের বস্তু নয়। পণ্ডিতগণ কুস্থান হইতেও কাঞ্চন তুলিয়া লইবার পরামর্শ দেন। নারীকে ঘৃণা করিলেও নারীর মন্ত্রকে অবজ্ঞা না করিয়া গ্রহণ কর। এস প্রস্তুত হও।

আমার শরীরের অমর জ্ঞান তোমাকে শিখাই।
স্ত্রী পুরুষে বুদ্ধি করি যমের দায় এড়াই।

কিন্তু রাজা হিমালয়ের ন্যায় অচল। তিনি স্থির কণ্ঠে উত্তর করিলেন

এমনি যদি আমার প্রাণ যায় ছাড়িয়া।
তবুত মাইয়ার জ্ঞান না নিব শিখিয়া॥

নিরুপায় ময়নামতী দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

পরদিবস সাজসজ্জা করিয়া গোদা যম বহু অনুচর সহ যথাসময়ে উপস্থিত হইল। আজ তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে—কোন প্রলোভনে মুগ্ধ হইবে না, কোন ভীতি প্রদর্শন গ্রাহ্য করিবে না, কোন বাধা-বিপত্তি মানিবে না—যেমন করিয়াই হউক মাণিক্যচাঁদের প্রাণ শমনরাজের দরবারে উপস্থিত করিবেই করিবে।

ময়নামতী প্রস্তুত ছিলেন, তিনিও স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য যথারীতি অনুনয় বিনয় আরম্ভ করিলেন; কিন্তু গোদা বিচলিত হইল না, আজ সে রাজার প্রাণ লইবেই। তখন ময়নামতী নানাবিধ উপঢৌকন আনিলেন, গোদা যম তাহাও প্রত্যাখ্যান করিল। রাজমহিষী তখন অনন্যোপায় হইয়া

মহামন্ত্র গিয়ান লইল হৃদয়ে জপিয়া।
চণ্ডী কালারূপ হইল কায়া বদলিয়া॥

রুদ্রচণ্ডীর মূর্তি ধরিয়া হাতে তৈল পাটের খাঁড়া লইয়া ময়না যমদূত বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তাঁহার রণরঙ্গিণী মূর্তি দেখিয়া গোদার সাহস অন্তর্হিত হইল, ভয়ে পলায়ন করিয়া সে সরাসরি মহাদেবের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল

মহাদেব অইত ময়না গিয়ানে ডাঙ্গর
কেমন করি আইনবেন রাজাকে যমপুরীর ভিতর ॥

মহাদেব বুঝিলেন ময়নামতী পতিপার্শ্বে থাকিতে কাহারও সাধ্য নাই যে রাজার প্রাণ বাঁধিয়া লইয়া আসে। সুতরাং মাণিক্যচাঁদের মৃত্যু ঘটাইতে হইলে সর্বাগ্রে ময়নাকে স্থানান্তরিত করা দরকার। ইহা ভাবিয়া মহাদেব সব যমদূতকে একত্র করিয়া প্রত্যেককে পৃথক পৃথক কাজের ভার দিলেন। আদেশ পাইয়া 'বাওখুকরা যম' বায়ুরূপে রাজার শয্যাগৃহে গিয়া চারিটি প্রদীপ নিবাইয়া চার কলসী গঙ্গাজল ঢালিয়া ফেলিল। 'ভাড়ুয়া যম' বিড়ালরূপ ধরিয়া ময়নার সংগৃহীত ঔষধগুলি ভক্ষণ করিল।

'নলুয়া যম' ব্রহ্মনলদ্বারা শ্বেত কুয়ার জল শুষিয়া লইল। 'হুতাশন' নামধারী যম সুযোগ দেখিয়া ঠিক এই সময়ে রাজার কণ্ঠে মরণতৃষ্ণা জাগাইয়া তুলিল। তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া রাজা জল চাহিতেই দাসীরা জল আনিবার উদ্‌যোগ করিল; কিন্তু 'বুদ্ধি যম' রাজাকে বুদ্ধি দিল—ময়নার হাতে ভিন্ন জল খাইও না। অমনি রাজা বলিয়া উঠিলেন

এমনি যদি আমার প্রাণ যায় চলিয়া।
তবু বান্দির হাতের জল খাব না পালঙ্গে শুতিয়া ॥

অগত্যা জল আনিবার জন্য সোনার ঝারি লইয়া ময়নাকেই যাইতে হইল। গিয়া দেখেন রাজ-প্রাসাদের নিকটবর্তী কোন স্থানে বিন্দুমাত্র জল নাই, শ্বেতকুয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ শুষ্ক; সুতরাং বাধ্য হইয়া ময়না গঙ্গাভিমুখে চলিলেন। যমদূতগণ প্রস্তুত হইয়াই ছিল, রাজপথে পা দিতেই তাহারা সকলে মিলিয়া রাজার হাত পা বাঁধিয়া বার মোকামে বার ডাঙ্গ বসাইয়া দিল। আর গোদা

"রাজার জিউ নিল লাংটিত বান্ধিয়া।
সোনার ভমরা হৈল যম কায়া বদলাইয়া ॥

যে মাটিতে জল ভরে ময়না হেট মুণ্ড হৈয়া।
মাথার উপর দিয়া জিউ নিগ্যাল বান্ধিয়া॥"

ময়না নীচের দিকে মুখ করিয়া জল ভরিতেছেন। গোদা যম ভ্রমরের রূপ ধরিয়া যে আকাশ পথে উড়িয়া যাইতেছে তাহা তিনি দেখিতে পান নাই। কিন্তু সে গঙ্গাদেবীর দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। ভ্রমররূপী গোদাকে দেখিয়াই গঙ্গা বুঝিতে পারিলেন যে মাণিক্যচাঁদের প্রাণ লইয়া সে পলাইতেছে। তখন গঙ্গা ময়নাকে ডাকিয়া বলিলেন

ওগো মা, যার জন্যে জল ভরো তুমি হেট মুণ্ড হৈয়া।
সে তোর দুলাল স্বামী গেল পার হৈয়া॥

ইহা শুনিয়াই ময়না চমকিত হইয়া কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার শীর্ষের সিন্দুর এবং হস্তের শঙ্খ মলিন হইয়া আসিল। জল আনিবার জন্য কেন স্বামীকে ত্যাগ করিয়া আসিলাম—এই বলিয়া তিনি অনুতাপ করিতে লাগিলেন। হায় হায় মুহূর্তের ভুলে স্বামীকে চিরজীবনের মত হারাইলাম। পথে বাহির হইবার পূর্বে কেন ভাবিয়া দেখি নাই যে রাজার মরণ-পিপাসা আর কিছু নয়, যমেরই ছলনা মাত্র? এই ভাবে পতিশোকে কাতর হইয়া ময়না কিছুক্ষণ রোদন করিলেন কিন্তু অগৌণেই তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, মনে মনে ভাবিলেন—এ আমি কি করিতেছি? শোকে অভিভূত হইয়া অনর্থক কালক্ষেপ করিতেছি কেন? যতক্ষণ নিজের প্রাণ আছে ততক্ষণ পতির প্রাণের আশা বিসর্জন দিব না। স্বামীকে বাঁচাইবার জন্য আমার সকল শক্তি প্রয়োগ করিব। এতদিন ধরিয়া কি সাধনা করিলাম আজ তাহার পরীক্ষা হইবে। এই বলিয়া ময়না যমালয়ের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতেই দেখিলেন সম্মুখে এক বৃহৎ নদী। সে নদী প্রস্থে এত বড় যে একবার খেয়া দিতে হইলে অন্ততঃ একবৎসর সময় লাগে। নৌকা করিয়া যাইবারও উপায় নাই। এমন স্রোত যে এক খণ্ড তৃণ পড়িলে শতখণ্ড হইয়া যায়। তাহার উপর

এক এক ঢেউ উঠে পর্বতের চূড়া

মহাজ্ঞানের অধিকারীর পক্ষে এই সকল বাধা অতি তুচ্ছ। গুরু স্মরণ করিয়া এবং ধর্মদেবের নাম লইয়া ময়নামতী অবলীলাক্রমে নদী পার হইয়া গেলেন।

মন্ত্রপ্রভাবে পথের সকল বাধা অতিক্রম করিয়া রাণী যখন যমপুরীতে উপস্থিত হইলেন তখন সেখানকার সকলে ভয়ে নিজ নিজ ইষ্টদেবের নাম স্মরণ করিতে আরম্ভ করিল। গোদা যম নিশ্চিন্তমনে অন্তঃপুরে বসিয়াছিল, ময়নার আগমন-সংবাদ পাইয়া

হাতে মাথে গোদা যম কাঁপিয়া উঠিল।

বিপদ আসন্ন দেখিয়া গোদা প্রাণভয়ে একটা খড়ের স্তূপের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া রহিল। ময়না জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা তাহা দেখিতে পাইয়া সর্পরূপ ধারণ করিলেন।

চ্যাদা বোড়া হইয়া ময়না এক ঝম্প দিল।
চটকি খাইয়া গোদা যমের ঘাড়েতে বসিল ॥

গোদা উপায়ান্তর না দেখিয়া মূষিকরূপ ধারণ করিয়া গর্তের মধ্যে আত্মগোপন করিল। কিন্তু ময়নার হাতে নিস্তার নাই, তিনিও বিড়ালরূপ পরিগ্রহ করিলেন। গোদা যম যে রূপ গ্রহণ করে, ময়না তৎক্ষণাৎ তাহার ভক্ষকের আকৃতি ধারণ করেন। অবশেষে গোদার আত্মরক্ষার সকল চেষ্টা নিষ্ফল করিয়া ময়না তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তাহার পর সে কি শাস্তি! হাত পা চর্ম-রজ্জু দিয়া বাঁধিয়া তাহার মুখে ঘোড়ার লাগাম পরাইয়া

এক লম্ফ দিয়া গোদার পিঠেতে চড়িল।
লোহার মুদ্গর দিয়া ভাঙ্গাইতে লাগিল ॥

প্রহারে জর্জরিত হইয়া গোদা যম উচ্চৈঃস্বরে রোদন আরম্ভ করিল কিন্তু ময়নার হাত হইতে পরিত্রাণ করিবে কে? গোদার চীৎকারে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল কাঁপিয়া উঠিল কিন্তু কেহ সাহস করিয়া তাহার নিকটে আসিল না; তখন স্বয়ং মহাদেব আসিয়া নানা প্রবোধবাক্যে ময়নাকে শান্ত করিয়া বলিলেন যে, রাজার আয়ুষ্কাল ফুরাইয়া যাওয়ায় দেবতাগণের আদেশেই গোদা যম তাঁহার প্রাণ-পুরুষকে আনয়ন করিয়াছে। ইহাতে তাহার কোন অপরাধ নাই এবং বিধাতৃ-নির্দিষ্ট কর্মে বাধা দেওয়া তাঁহার মত জ্ঞানসম্পন্না নারীর পক্ষে সংগতও নয়। তাঁহার পরামর্শ—গোদা যমকে দণ্ড না দিয়া ময়নামতী বরং তাহাকে মুক্তি দিন। তাহা হইলে দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিবেন।

ময়না বুঝিলেন বিধাতৃনির্দেশ অন্যথা করা অসম্ভব। সুতরাং মহাদেবের উপদেশ অনুযায়ী গোদাকে ছাড়িয়া দিলেন। দেবতাগণও সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্বাদ করিয়া ময়নাকে বিদায় দিলেন।

ময়নামতী যখন রাজবাটী ফিরিয়া আসিলেন তখন মাণিক্যচন্দ্রের পত্নীগণ এবং জ্ঞাতিবর্গ শোকে মুহ্যমান হইয়া মৃতদেহ ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। তখনও পর্যন্ত সৎকারের কোন উদ্‌যোগ আয়োজন হয় নাই। ময়না আসিয়াই লোকজন ডাকাইয়া শব তুলিবার ব্যবস্থা করিলেন। কীর্তনিয়াগণ নামগান করিতে লাগিল, হরিধ্বনি সহকারে মাণিক্যচাঁদের মৃতদেহ গঙ্গাতীরে আনীত হইল। ময়নার অনুরোধে গঙ্গাদেবী মাঝদরিয়ায় বালুচর করিয়া দিলেন। সে বালুচরে চিতাশয্যা প্রস্তুত হইলে মাণিক্যচন্দ্রকে তদুপরি শায়িত করাইয়া সাধ্বী স্বয়ং তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিলেন। জ্ঞাতিগণ চিতার চতুষ্পার্শ্বে চন্দন কাঠ স্তূপাকার করিয়া সাজাইয়া তাহার উপর ঘৃত তৈল প্রভৃতি সহজ দাহ্য পদার্থসমূহ ঢালিয়া দিয়া দূরে সরিয়া আসিল। ময়নামতী তখন সকলের নিকটে শেষ বিদায় প্রার্থনা করিয়া স্বহস্তে চিতায় অগ্নিসংযোগ করিলেন, দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সাত দিন সাত রাত্রি ধরিয়া চিতা জ্বলিল, মর্ত্যের ধূম স্বর্গে পৌঁছিল। এই হুতাশনের তাণ্ডবলীলা দেখিতে দেখিতে লোকে আহার নিদ্রা ভুলিয়া গেল।

অগ্নি নির্বাপিত হইলে দেখা গেল রাজার দেহ ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু অগ্নিদেব রাণীর কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারেন নাই। ভয়ে বিস্ময়ে সকলে দেখিল—এক সদ্যোজাত পুত্রসন্তান কোলে লইয়া ময়নামতী অক্ষত দেহে চিতা মধ্যে বসিয়া আছেন। এই শিশুই ভবিষ্যতে মহারাজ গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদ নামে দুর্লভ যশ এবং অসামান্য খ্যাতির অধিকারী হন। ময়নামতীর ন্যায় মহীয়সী রমণীর পুত্র যে স্বীয় শক্তি ও প্রতিভা বলে সকলের শ্রদ্ধা এবং পূজা পাইবেন ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে?

গোবিন্দচন্দ্রের সমস্ত খ্যাতির মূল তাঁহার সন্ন্যাস এবং সেই সন্ন্যাসের মূলে ছিলেন ময়নামতী। জিতেন্দ্রিয় সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর চরণতলে হিন্দুগণ চিরকালই শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া থাকেন। শুধু হিন্দুই বা বলি কেন, ইন্দ্রিয়জয়ী পুরুষগণ মানুষমাত্রেরই শ্রদ্ধার পাত্র। একদিন বুদ্ধদেব বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া

সমগ্র জগতের জ্ঞান-নেত্র উন্মীলন করিয়াছিলেন। এই সেদিনও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য পাপতাপদগ্ধ জীবগণের হৃদয়ে নামামৃত সিঞ্চন করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের সহিত তাঁহাদের তুলনা যুক্তিযুক্ত হয় না। গোবিন্দচন্দ্র বৈরাগ্য অবলম্বন করেন আত্মপ্রাণ রক্ষার জন্য, আর বুদ্ধ ও চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন জগৎকে ত্রাণ করিবার জন্য। কপিলাবস্তুর রাজনন্দন, অগাধ ঐশ্বর্য, অতুল সুখ, পত্নীর প্রেম, মাতার স্নেহ সব স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। গৃহত্যাগে উৎসাহ কেহই দেয় নাই, বরং সংসারের মায়াপাশে আবদ্ধ করিবার জন্যই সকলে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। আত্মশক্তির দ্বারা সকল বাধা তাঁহাকে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তাঁহার মানসিক দৃঢ়তার সম্মুখে মারের সকল প্রচেষ্টা বিফল হইয়া গেল। সে প্রলোভনের তুলনায় হীরা নটীর রূপ-যৌবন নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। নবদ্বীপচন্দ্রের বৈরাগ্য গ্রহণও বুদ্ধদেবের মত বিশ্বহিতের জন্যই, স্বার্থের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই ছিল না। প্রেমময়ী স্ত্রী, স্নেহময়ী মাতা, সংসারের ভোগ-বিলাস তিনিও স্বতঃপ্রেরিত হইয়া উচ্ছিষ্ট মৃৎপাত্রের মত ফেলিয়া গেলেন। ছুরপনেয় বাধার দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতসমূহ তেজস্বী মহাপুরুষের পথরোধ করিতে পারিল না।

ইঁহাদের মাহাত্ম্যের সহিত তুলনা করিলে গোপিচাঁদের মহিমা অতিশয় ম্লান বলিয়া মনে হয়। তথাপি গোপিচাঁদের খ্যাতি একদিন ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়াছিল। চৈতন্যভাগবতকার লিখিয়াছেন, তাঁহার কালে এ দেশের লোকজন গোপীচাঁদের গান গাহিয়া রাত্রি জাগরণ করিত।

বঙ্গদেশ ছাড়াও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এখনও গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী শ্রুত হয় পূর্বে তাহা বলিয়াছি। গোপীচাঁদ কোন্ গুণে এত লোকের হৃদয় জয় করিলেন? কাহিনী পাঠ করিলে মনে হয় সংসারাসক্ত শত শত মানুষের সহিত তাঁহার কোন পার্থক্যই নাই। ঐশ্বর্য্যের মোহ, যৌবনের আসক্তি, ভোগের আকাঙ্ক্ষা—অজগরের ন্যায় তাঁহাকে পাকে পাকে জড়াইয়া রাখিয়াছিল। ময়নামতীর ন্যায় তেজস্বিনী জননীর চেষ্টা ব্যতীত এই জটিল গ্রন্থির উচ্ছেদন সম্ভবপর হইত না। ময়নামতীকে বাদ দিলে গোবিন্দচন্দ্রের পৌরুষ নিতান্ত নিরবলম্ব হইয়া পড়ে।

ময়নামতী যখন ধ্যানযোগে জানিলেন, গোবিন্দচন্দ্রের আয়ু অল্প তখন তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। মন্ত্রগ্রহণ না করায় এই পুত্রের পিতাই ত একদিন অকালে প্রাণ হারাইলেন; আবার পুত্রও যদি পিতার ন্যায় ময়নামতীর বাক্য অবহেলা করে তাহা হইলে তিনি কি করিতে পারেন? কি ভাবে পুত্রকে স্বমতে আনয়ন করিবেন এই চিন্তাতেই তিনি মগ্ন হইয়া রহিলেন।

সপ্তমবর্ষীয় রাজকুমারের সহিত হরিশ্চন্দ্র রাজার পঞ্চমবর্ষীয় কন্যা শ্রীমতী পদুনার বিবাহ হইয়া গেল। শ্যালিকা অদুনাও যৌতুক স্বরূপ ভগ্নীসহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ধন্য হইলেন। এতদ্ব্যতীত 'রতনমালা' এবং 'কাঞ্চাসোনাও' রাণী হইয়া বালক রাজার রাজপুরী আলোকিত করিলেন। গোপিচাঁদ অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বলিয়া ময়নামতী স্বয়ং রাজ্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন, বালিকা বধূ চারিটি লইয়া রাজকুমারের দিন ধুলাখেলায় কাটিতে লাগিল।

কৈশোরে পদার্পণ করিতেই গোবিন্দকে সিংহাসনে বসাইয়া ময়নামতী রাজ্যভার তাঁহার হস্তেই সমর্পণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সতর্ক এবং সস্নেহ দৃষ্টি রক্ষা-কবচের মত সর্বদাই তাঁহাকে সমূহ বিপদআপদের হস্ত হইতে দূরে রাখিয়া চলিত। রাজা হইয়াও রাজ্যের দুর্ভাবনা নাই। পরিপূর্ণ সুখ, অনাবিল শান্তি, অপরিমেয় আনন্দ—ইহার দ্বারাই হৃদয় পূর্ণ। গোপিচাঁদ ভাবিলেন, মানুষের জীবনপথ শুধু কুসুমাকীর্ণ। হায়, মাতা ভিন্ন তিনি যে কত অসহায় তাহা কল্পনা করিবার মত ক্ষমতাও তাঁহার নাই। এই ভাবে আরও দুই বৎসর অতীত হইলে গোপিচাঁদ কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পা দিলেন। ময়নামতী হিসাব করিয়া দেখিলেন, পুত্রের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইতে আর বিলম্ব নাই। চিন্তায় তাঁহার হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। বিশাল সাম্রাজ্য এবং যুবতী রমণীগণের আকর্ষণ হইতে মুক্ত না করিলে গোবিন্দের মৃত্যু অবধারিত—অথচ মোহাবিষ্ট রাজার স্বপ্নঘোর কাটাইবেন কেমন করিয়া? দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় কিছুদিন কাটিল। অবশেষে ময়না মনস্থ করিলেন গোপিচাঁদকে সব কথা খুলিয়া বলিবেন। ইহা স্থির করিয়া একদিন ময়না গোবিন্দচন্দ্রের রাজদরবারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মাতাকে সভামধ্যে দেখিয়া গোপিচাঁদ তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া

তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। নৃপতির আদেশে সভা ভঙ্গ হইল। পাত্রমিত্র এবং অন্যান্য সভাসদবর্গ বিদায় হইলেন। অনন্তর জননীকে স্বর্ণাসনে বসাইয়া নিজে দণ্ডায়মান থাকিয়া গোপিচাঁদ করজোড়ে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অবসর বুঝিয়া ময়নামতী একে একে সব বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া শেষে বলিলেন—প্রিয়তম পুত্র, তোমার মৃত্যু আসন্ন জানিয়া বড় দুঃখে সেই কথা জানাইতে আসিয়াছি। কিন্তু এখনও তাহার প্রতিকার সম্ভব। মৃত্যু জয় করিতে হইলে রাজ্য, ধন, ঐশ্বর্য সব বিসর্জন দিয়া রমণীগণকে দ্বাদশ বৎসরের মত ত্যাগ করিয়া হাড়িসিদ্ধার শরণাপন্ন হইতে হইবে। হাড়িসিদ্ধা মন্ত্রতন্ত্রে পরম পারদর্শী এবং মহাজ্ঞানসম্পন্ন। তাঁহার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে সেই যোগিবর কৃপা করিয়া তোমাকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবেন।

মাতার মুখে এই অভাবনীয় বাক্য শুনিয়া গোবিন্দ চমকিত হইলেন। তাহাও কি সম্ভব? এই সুখ সম্পদ, এই অতুল বৈভব সব ত্যাগ করিয়া রমণীগণকে অনাথা করিয়া, ছিন্ন কন্থা এবং ভিক্ষার ঝুলি সম্বল করিয়া বাইশ দণ্ডের অধিপতি মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রকে পথে পথে বেড়াইতে হইবে? ঊনশত নফর, অর্ধশত সামন্তরাজ, লক্ষাধিক সৈন্য এবং অগণিত নরনারী যাঁহার চরণে প্রণতি নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হয়—সেই গোবিন্দচন্দ্রকে এক হীনকর্মা হাড়ির চরণ স্পর্শ করিয়া তাহারই আজ্ঞা শিরোধার্য করিতে হইবে? ইহা যে কল্পনারও অতীত। বিনামেঘে বজ্রপাত হইলেও গোপিচাঁদ এরূপ চমকিত হইতেন না। আকস্মিক উত্তেজনায় তাঁহার মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণের জন্য বিচারশক্তি লোপ পাইল। তাঁহার মুখে বাক্যস্ফূর্তি হইল না। প্রথম উত্তেজনার ঘোর কাটিয়া গেলে রাজা ভাবিতে লাগিলেন—মাতার মুখে এ কি জঘন্য প্রস্তাব? নৃপতি মাণিক্যচন্দ্রের মহিষী স্বীয় পুত্রের প্রতি এই ঘৃণিত আদেশ দিলেন কেমন করিয়া? ময়নামতীর এই অসংগত আচরণের কোন অন্তর্নিহিত অর্থ আছে কি?

গোবিন্দচন্দ্রের মনে সংশয় জাগিল। কিন্তু মাতার সম্বন্ধে সন্দেহ ঘনীভূত হইতে না হইতেই বিবেকের দংশনে তাঁহার চিন্তার গতি ঘুরিয়া গেল। তিনি করজোড়ে নিবেদন করিলেন—জননী, এখনও তোমার আদেশ প্রত্যাহার কর। জাতিকুল ডুবাইয়া পিতৃপুরুষের নামে কলঙ্ক লেপন করিয়া নীচকুলোদ্ভব

হাড়ির শিষ্যত্ব গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। পুত্রের অবাধ্যতা তোমার দুঃখের কারণ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার এইরূপ অধঃপতন দেখিলে স্বর্গলোকে থাকিয়াও পিতৃপুরুষগণ অশ্রুবর্ষণ করিবেন। অশুচি বংশধরের পিণ্ড ও জল তাঁহারা আর গ্রহণ করিবেন না। আরও চিন্তার কথা এই যে, কিসের আশায় জাতিকুল, মান সম্মান, ধনরত্ন বিসর্জন দিয়া হাড়িকে গুরু করিব? কে সে? কি তাহার পরিচয়। সে যে আমাকে মন্ত্রবলে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে তাহার প্রমাণই বা কি?

পুত্রের বাক্যে ময়নামতী ক্রুদ্ধ হইলেন না। তিনি জানিতেন—যুক্তির দ্বারা বশীভূত করিয়া পুত্রকে স্বমতে আনিতে না পারিলে তাহার প্রাণ রক্ষা করা অসম্ভব। সেইজন্য মিষ্টবাক্যে গোবিন্দচন্দ্রকে বুঝাইতে লাগিলেন—হাড়িসিদ্ধা মহাশক্তিমান যোগী, মন্ত্রবলে তিনি অসাধ্য সাধন করিতে পারেন। স্বয়ং যমপুত্র 'মেঘনীল কুমর' তাঁহার মস্তকে চামর ব্যজন করেন। যমরাজ তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী ভৃত্য মাত্র। চন্দ্র এবং সূর্য তাঁহার দুই কর্ণের কুণ্ডলরূপে শোভমান। দেবী মহালক্ষ্মী এই সিদ্ধপুরুষের পাকশালার অধিষ্ঠাত্রী এবং সুবচনী তাঁহার তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী। প্রভু গোরক্ষনাথের নিকটেই হাড়িপার দীক্ষা হয়, সেই সম্পর্কে হাড়িপা ময়নামতীর গুরুভাই। সাধারণ লোকে তাঁহাকে চিনিতে পারিবে না।

তুমি বল হাড়ি হাড়ি লোকে বলে হাড়ি।
মায়ারূপে খাটি খায় চিনিতে না পারি ॥

ময়নামতীর মুখে হাড়িসিদ্ধার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া গোবিন্দচন্দ্র বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। মাতার চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল—তাঁহাকে সন্ন্যাস অবলম্বন করাইবার জন্য ময়নামতীর এই যে প্রয়াস ইহার মধ্যে নিশ্চয় কোন দুরভিসন্ধি আছে। কোন্ মাতা স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া একমাত্র সন্তানকে বনবাসে পাঠায়? ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীও নিজ প্রাণ দিয়া শাবকগণকে প্রতিপালন করে। গোবিন্দচন্দ্র স্থির করিলেন, কূটচক্রী জননীর বাক্য তিনি পালন করিবেন না। যে মাতা স্বীয় স্বার্থ ও জঘন্য প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া পুত্রকে সকল সুখ হইতে বঞ্চিত করিতে চায় সে মাতার আদেশ লঙ্ঘনে কোন পাপ

নাই। তাঁহার এরূপ ধারণা হইল যে পিতার অকালমৃত্যুও সম্ভবত হাড়িসিদ্ধা ও ময়নামতীর কোন মিলিত চক্রান্তের ফল।

এদিকে রমণীগণও নিশ্চিন্তমনে বসিয়া ছিলেন না। শাশুড়ীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্ত চারি সপত্নীর মধ্যে যুক্তি পরামর্শ চলিল। কিন্তু কি বুদ্ধি করিলে রাজার সন্ন্যাস গ্রহণ রহিত করা যায় তাহা কেহই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে

অদুনায় বলে, বৈন গো পদুনা সুন্দর।
সাত কাইতের বুদ্ধি আমার ধড়ের ভিতর॥

আমার কথামত চলিলে বর্তমান বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া কঠিন হইবে না। পরামর্শ অনুযায়ী

অদুনাএ পিন্ধে কাপড মেঘনীল শাড়ি।
সেই শাড়ীর মূল্য ছিল বাইশ লাখ কৌড়ি॥
পদুনাএ পিন্ধে কাপড তলে বান্ধি নেত।
মাঞ্জা করে ঝলমল বনের সুন্দি বেত॥

রতনমালা এবং কাঞ্চাসোনাও তসর এবং 'খিববলি' বসনে দেহ সজ্জিত করিলেন। অনন্তর হাতে 'বামলক্ষ্মণ' নামক শঙ্খ পরিধান করিয়া এবং কস্তুরী অগুরু প্রভৃতি বিচিত্র প্রসাধনে অঙ্গ ভূষিত করিয়া চারি রাণী

খঞ্জন গমনে জাএ রাজার গোচরে,
হালিয়া ঢুলিয়া পড়ে যৌবনের ভারে॥

নিকুঞ্জ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া চারি রমণী বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া রাজাকে রাজ্য ত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন। অবশেষে তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর চরিত্র সম্বন্ধে দুই-চারিটি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন

তোমার মায়ের কথার নির্ণয় না জানি।
হেঁটে গাছ কাটিয়া উপরে ঢালে পানি॥"

বনবাসে প্রেরণ করাই যদি তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল তবে এতগুলি রাজকন্তার সহিত বিবাহ দিলেন কেন?

রাণীগণের যুক্তি অত্যন্ত সমীচীন বলিয়াই গোবিন্দচন্দ্রের মনে হইল।

ময়নামতীর আজ্ঞায় পরিচালিত হইয়া নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিবেন না ইহা স্থির করিয়া গোপিচাঁদ রাণীদিগকে বলিলেন

না যাইব না যাইব প্রিয়া দেশ দেশান্তর।
সুখে রাজ্য করিব থাকিয়া নিজ ঘর ॥

ইহা শুনিয়া সকলে আশ্বস্ত হইলেন।

রাজার অঙ্গীকারে রাণীগণ আশ্বাস পাইলেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। মাতার সান্নিধ্যে আসিলেই গোবিন্দচন্দ্রের সমস্ত দৃঢ়তা মুহূর্তমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে ইহা তাঁহারা নিশ্চিত জানিতেন। ময়নামতীর ন্যায় শক্তিময়ী রমণীর প্রভাব হইতে দুর্বলচেতা স্বামীটিকে কেমন করিয়া মুক্ত করিবেন এখন এই চিন্তাই তাঁহাদিগকে বিব্রত করিয়া তুলিল। দিবারাত্র যুক্তিতর্ক চলিল, কিন্তু জটিল সমস্যার সমাধান কিছুতেই হইল না। অবশেষে 'সাতকাইতের বুদ্ধি'-ধারিণী অদুনাই এক সহজ পন্থা বাহির করিয়া তিন সপত্নীকে চমকিত করিয়া দিলেন। স্থির হইল নিমাই বাণিয়ার নিকট হইতে পঞ্চ তোলা বিষ ক্রয় করিয়া মিষ্টান্নের সহিত তাহা মিশ্রিত করিয়া শাশুড়ী ঠাকুরানীকে ভেট দেওয়া যাইবে। নিমাই বাণিয়ার বিষ পঞ্চতোলা উদরস্থ হইলে আর ময়নামতীকে চক্ষু তুলিয়া চাহিতে হইবে না। তাহার পর আর কি? এখন কোন রকমে পথের কণ্টক একবার দূর করিতে পারিলে হয়।

যুক্তি করিয়া অদুনা, পদুনা, রতনমালা ও কাঞ্চাসোনা 'পঞ্চতোলাব পঞ্চলাড়ু' প্রস্তুত করিয়া ময়নামতীর নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং

লাড়ুর বাটা সম্মুখে রাখি প্রণাম করিল।
যোড় হস্তে দাণ্ডাইয়া কহিতে লাগিল ॥
এহি বর মাগি মোরা তোমার গোচর।
স্বামী দান দাও মোরা চলি যাই ঘর ॥

পুত্রবধূগণের অতিভক্তির কারণ অনুমান করিতে ময়নার মুহূর্তমাত্রও সময় লাগে নাই; কিন্তু কোন সন্দেহের ভাব প্রকাশ না করিয়া তিনি চারি বধূর সম্মুখেই মিষ্টান্ন কয়টি আহার করিলেন। রাণীগণ মহানন্দে পুরীমধ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া ময়নার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য মহাজ্ঞানের প্রভাবে ময়নামতী দ্বাদশ দণ্ডের মধ্যেই বিষ জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

এই কৌশল ব্যর্থ হওয়াতে রাণীরা আর এক বুদ্ধি স্থির করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—ময়নামতী যে জ্ঞানবলে ভূত ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া পুত্রকে গৃহত্যাগ করিতে আদেশ দিতেছেন সেই জ্ঞান কতদূর সত্য পরীক্ষা করিয়া দেখা হউক। ময়নামতী যদি পরীক্ষা দিয়া প্রমাণ করিতে পারেন যে তিনি প্রকৃতই মহাজ্ঞানের অধিকারী তবেই যেন গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার আদেশ পালন করেন—অন্যথা নয়। গোপিচাঁদেরও ইহা সংগত বলিয়া মনে হইল, সুতরাং তিনি মাতার মহাজ্ঞানের পরীক্ষা লইতে মনস্থ করিলেন। ময়না বুঝিলেন এ বুদ্ধি গোপিচাঁদের মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত হয় নাই ; কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। পরীক্ষা তিনি সকলের নিকটেই দিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি বলিলেন

"এক পরীক্ষার বদল শত পরীক্ষা দিমু।
তবু তোরে রাজার বেটা বাড়ী ঘর ছাড়ামু॥

সত্যই ভীষণ রকমের পরীক্ষার বন্দোবস্ত হইল। মহাজ্ঞান বলে ময়নামতী সমস্তই নির্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইলেন। সাত মণ ফুটন্ত তৈলের মধ্যে সাত দিন ডুবিয়া থাকিয়াও তাঁহার দেহ অবিকৃত রহিল। তুষের নৌকায় চড়িয়া তিনি সমুদ্র অতিক্রম করিলেন। তৌল যন্ত্রে ওজন করিয়া দেখা গেল—তাঁহার দেহ পোস্তদানার অপেক্ষাও লঘু। এইরূপে সাত পরীক্ষা শেষ হইলে গোবিন্দচন্দ্রের সন্দেহ দূর হইল। ময়নামতীর জ্ঞান যে মিথ্যা নয় তাহা তিনি এতদিনে বিশ্বাস করিলেন। সন্তান হইয়া তিনি মাতার সম্বন্ধে যে জঘন্য ধারণা পোষণ করিয়াছিলেন সেজন্য গভীর অনুতাপ জন্মিল। স্বীয় নির্বুদ্ধিতার জন্য তাঁহার আর দুঃখের সীমা রহিল না। গোপিচাঁদ স্থির করিলেন, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। এখন

আর আমি পরীক্ষা না নিব মায়ের বার বার।
শির মুড়িয়া ধর্মরাজ মুঞি ছাড়িমু বাড়ী ঘর॥

পুত্রের মতি পরিবর্তিত হইল দেখিয়া ময়নামতী আশ্বস্ত হইলেন।

সংবাদ শুনিয়া চারি নারীর মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। তাঁহারা পুনরায় সাজসজ্জা করিয়া রাজাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সকল লীলা কৌশল, অনুনয় বিনয় এবার নিষ্ফল হইল। অবশেষে অদুনা কাঁদিয়া বলিলেন

তোমা না দেখিয়া আমরা প্রাণ দিমু চারি রমা
মরিমু যে গরল ভক্ষিয়া।

কিন্তু তথাপি গোপিচন্দ্র অচল, তিনি শুধু একটি কথা বলিয়া পত্নীগণকে বিদায় দিলেন। বলিলেন—

ঘরে যাও অদুনা মাগো ঘরে যাও তুমি।
এ বার বছর রাজ্য ভ্রমি আসি আমি।

স্কন্ধে ঝুলি এবং হস্তে 'দোয়াদণ' লইয়া গোপীচাঁদ সত্য সত্যই গৃহত্যাগ করিলেন। রাজপুরীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল; বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই রাজা সর্বপ্রথমে হাড়িফার নিকটে উপস্থিত হইলেন। গোপিচাঁদকে দেখিয়া যোগিবর আদর আপ্যায়ন করিয়া আসনে বসাইলেন। অনন্তর গোবিন্দ হাড়িফার চরণে প্রণত হইয়া বলিলেন

তোহ্মার চরণে গুরু সেবা দিলুঁ আহ্মি।
এ ভব তরিতে জ্ঞান মোরে দেহ তুহ্মি॥

রাজার বিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া হাড়িফা তাঁহাকে শিষ্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

সংশয়ীর মনে যখন বিশ্বাস উৎপন্ন হয় তখন তাহা স্বভাবতঃই দৃঢ়মূল হইয়া থাকে। নাস্তিকতাবাদীরা বিচার-বুদ্ধি এবং যুক্তিতর্কের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব একবার স্বীকার করিলে তাঁহারাই চূড়ান্ত আস্তিক হইয়া উঠেন। তখন কাজকর্মে, আচারে অনুষ্ঠানে তাঁহাদের নূতন বিশ্বাস অত্যন্ত প্রকট হইয়া দেখা দেয়। গোবিন্দচন্দ্রেরও তাহাই হইল। যে হাড়িফা সম্বন্ধে তিনি নানাপ্রকার নিন্দাবাদ এবং কটূক্তি করিয়াছিলেন আজ তাঁহারই চরণধূলি তাঁহার শিরোভূষণ হইল। গোপিচাঁদ গুরুর সেবকরূপে তাঁহার সহিত দেশদেশান্তর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ছিন্নকন্থাধারী ভিক্ষুকবেশী এই সন্ন্যাসীকে দেখিলে আজ কে বলিবে যে ইনিই সেই বাইশ দণ্ডের অধিপতি মহারাজ গোবিন্দচন্দ্র?

পথে চলিতে চলিতে একদিন মহারাজ গোপিচাঁদ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া গুরুর অনুমতি লইয়া এক বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় তাঁহার দুই চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল। হাড়িফা শিষ্যের সেবায় সন্তুষ্ট হইলেও তাহার ভক্তির পরীক্ষা ভাল করিয়া গ্রহণ করেন নাই। আজ সেই পরীক্ষা লইবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা জন্মিল। গোপিচাঁদকে গভীর নিদ্রায়

অভিভূত দেখিয়া সেই সুযোগে হাড়িফা তাঁহার থলির মধ্য হইতে রাজার শেষ সম্বল একুশ কড়া কড়ি হরণ করিলেন। গোপিচাঁদ তাহার কিছুই বুঝিলেন না। যথাসময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইলে রাজা পুনরায় গুরুদেবের সহিত চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে পথপার্শ্বে এক পানশালা দেখিয়া হাড়িফার সুরা পান করিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু তাঁহার নিজের কাছে কপর্দকমাত্র ছিল না বলিয়া তিনি শিষ্যের নিকটে কিছু অর্থ যাচ্ঞা করিলেন। বলা বাহুল্য রাজার ভক্তির পরীক্ষার জন্যই হাড়িফার এই সমস্ত ছলনা। যাহাই হউক হাড়িফা মদ্যপানের নিমিত্ত অর্থ প্রার্থনা করিতেই শিষ্য তাঁহার শেষ সম্বল একুশ কড়া কড়ি দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য। ঝুলির মধ্যে তো একটি কড়িও অবশিষ্ট নাই।

কয়েক-দণ্ড পূর্বেও তিনি একুশ কড়া কড়ি ছিল দেখিয়াছিলেন, ইহাতে ভুল হইবার তো কোন কারণ নাই। হায় হায়, গুরুর নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় কেমন করিয়া? অঙ্গীকার ভঙ্গের ন্যায় মহাপাপ যে আর কিছুই নাই। পূর্ব জন্মের কোন্ দুষ্কৃতির ফলে আজ এই মহাপাপের ভাজন হইতে হইল? এইরূপে নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে গোবিন্দচন্দ্র কাতরভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ভক্তের দুঃখ দেখিয়া মনে মনে করুণা জন্মিলেও হাড়িফা বিচলিত হইলেন না। তিনি শিষ্যের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য তাহাকে অধিকতর কঠিন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন এ পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে ইহলোকের যাহা কিছু সকলই তাহার করতলগত হইবে। রোগ শোক জরা মৃত্যু সমস্তই তাহার করায়ত্ত হইবে। পৃথিবীকে সে মৃত্তিকা নির্মিত ক্রীড়নক বলিয়া মনে করিতে পারিবে। মোহের মায়া আচ্ছন্ন হইয়া এখানে যদি গোবিন্দচন্দ্রের প্রতি করুণা করেন তাহা হইলে তাঁহার ভবিষ্যতের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইবে। ইহা চিন্তা করিয়া হাড়িফা হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া কঠোর কর্তব্য পালন করিয়া যাইতে লাগিলেন। শোক-বিহ্বল শিষ্যকে ডাকিয়া হাড়িফা বলিলেন—প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা মানব মাত্রেরই কর্তব্য, অঙ্গীকার করিয়া যে তাহা পালন করিতে না পারে সে পশু অপেক্ষাও হীন। তুমি একবার যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছ তখন যে-কোন উপায়েই হউক তোমার তাহা রক্ষা করা উচিত। তাহা না হইলে পরলোকে অনন্ত নরক

যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। তোমার অন্য কিছু না থাকিলেও দেহটা তো আছে যাহা বিক্রয় করিয়াও তোমার প্রতিশ্রুত অর্থ এখনই দান করিতে পার। গুরুবাক্যে গোবিন্দচন্দ্র তৎক্ষণাৎ আত্মবিক্রয়ে সম্মত হইলেন। তখন হাড়িফা একুশ কড়া মূল্যে গোপীচাঁদকে হীরা নটী নাম্নী এক বারবনিতার নিকটে বন্ধক রাখিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রিয়দর্শন রাজপুত্রকে দেখিয়া হীরা মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকটে আত্মসমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিল কিন্তু নিষ্কলঙ্কচরিত্র দৃঢ়চেতা গোবিন্দচন্দ্র স্বীয় শক্তিবলে সর্বপ্রকার প্রলোভন অবলীলাক্রমে জয় করিলেন। অবশ্য এ নারীর বাক্য অবহেলা করার জন্য রাজপুত্রকে বড় কম দুঃখ সহ্য করিতে হয় নাই।

দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া ক্রীতদাসের ন্যায় তাঁহাকে বহু হীন কর্ম করিতে হইয়াছে। হীরার আদেশে দূরবর্তী নদী হইতে তাঁহাকে স্নানের জল বহন করিয়া আনিতে হইত। নরপাল গোবিন্দচন্দ্রকে ছাগপাল লইয়া বনে বনে চরাইতে হইত। এত সব দুঃখ তিনি অবনতমস্তকে সহ্য করিয়াছিলেন, তথাপি শুচিতা হারান নাই।

ধ্যানে বসিয়া হাড়িফা সকলই জানিতে পারিতেন। শিষ্যের শক্তি দেখিয়া তাঁহার মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিত, কিন্তু তবুও তাঁহার উদ্ধারের জন্য কোন ত্বরা করিতেন না। হীরার আবাসে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেলে হাড়িফা শিষ্যের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া একদিন সেখানে উপস্থিত হইলেন। রাজা গুরুকে দেখিয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অতঃপর হীরার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া যোগিবর গোবিন্দচন্দ্রকে পুনরায় স্বগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। দ্বাদশ বৎসর পরে গোপিচাঁদ গৃহে ফিরিয়া আসিয়া মাতার পদধূলি গ্রহণ করিলেন, দীর্ঘকাল পর পুত্রকে দেখিয়া ময়নামতীর চক্ষে আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

অভিজ্ঞানশকুন্তলে দুর্বাসা

মহাভারতের দুষ্যন্ত-শকুন্তলা উপাখ্যান অবলম্বন করিয়াই কালিদাস তাঁহার শ্রেষ্ঠ নাটক রচনা করিয়াছেন, এ-সম্বন্ধে এখন মতানৈক্য নাই বলিলেই হয়। পদ্মপুরাণ এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলের আখ্যানভাগ প্রায় সমান, ইহা দেখিয়া কোন কোন সমালোচক অভিজ্ঞানশকুন্তলকে পদ্মপুরাণের অনুবর্তী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহা সত্য হইতে পারে না। পদ্মপুরাণ যে পরবর্তী রচনা তাহার অনেক প্রমাণ আছে। মহাভারতের শকুন্তলা উপাখ্যানে দুর্বাসার উল্লেখ নাই—সুতরাং শকুন্তলা নাটকে ঋষির অবতারণায় যদি কোন নাটকীয় চাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায় তো সে-গৌরব কালিদাসেরই প্রাপ্য।

শকুন্তলা একাধারে তরুণকালের ফুল এবং পরিণত বৎসরের ফল। অশান্ত মর্ত্য ও প্রশান্ত স্বর্গের মধ্যে ইহা একটি সেতু-স্বরূপ। প্রচণ্ড আসক্তির দ্বারা যাহাকে লাভ করা যায়, তাহাকে পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। আসক্তির অবসানে সমাহিত শান্তির মধ্যেই সুসম্পূর্ণ মিলন সম্ভব। কালিদাসের নাটকে এই তত্ত্বটিই প্রচারিত হইয়াছে। শকুন্তলার বিস্মৃতি মদনভস্মের রূপান্তর।

বিপরীতবৃত্তি কুসুমশর রাজাকে সংযমহীন করিয়া তুলিয়াছেন। কণ্ব মুনির প্রত্যাগমন পর্যন্ত প্রতীক্ষা করার সামর্থ্যও তিনি হারাইয়াছিলেন। সেইজন্য গান্ধর্ব-বিধানেই তিনি শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিলেন। অথচ এই গান্ধর্ব-বিধান যে বিধিহীনতারই নামান্তর মাত্র, ইহা যে সামাজিক রীতিনীতিবিদ্ রাজা মনে মনে বুঝিতেন না তাহা নহে। প্রেম আকাশের ন্যায় প্রশান্ত ও স্থির আর কাম তড়িৎশিখার মত উজ্জ্বল ও চঞ্চল। ইহার পরিণাম সুখের নহে এবং ইহার উপর যে মিলনের প্রতিষ্ঠা হয় তাহা সদ্যঃপাতী ও ক্ষণভঙ্গুর। লালসা পরিতৃপ্তির সহিত তাহার অবসান অবশ্যম্ভাবী। এস্থলেও তাহাই হইল, প্রথম মিলনের পরই বিস্মৃতি। তপোবন পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই রাজা শকুন্তলাকে ভুলিলেন।

এই রূঢ় সত্যের নগ্নতা নিবারণের জন্য দুর্বাসার আবির্ভাব প্রয়োজন হইয়াছে। ঋষির অবতারণা না করিলে মহারাজ দুষ্মন্তকে নিতান্ত সাধারণ মানুষের শ্রেণীতে টানিয়া আনিতে হয়। তাহাতে নায়কের চরিত্র অনেকটা হীন হইয়া যায়। একটা অবিমৃষ্যকারী বহুদার ইন্দ্রিয়পর অসংযত ব্যক্তিকে নায়কের

আসনে বসাইতে গেলে নাটক অলংকার-শাস্ত্রানুগ হয় না। সংস্কৃত নাটকে নায়কের চরিত্র হওয়া চাই উন্নত এবং নানা সদ্‌গুণসমন্বিত। সুতরাং নায়কচরিত্র তথা নাটক অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ঋষির অভিশাপের একান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল।

বিশ্বপ্রকৃতির সহিত শকুন্তলা নাটকের একটা মিল আছে। উভয়েরই বাহিরে প্রশান্ত সৌন্দর্য কিন্তু অভ্যন্তরে অশান্ত আলোড়ন। অন্তরের সেই বিক্ষোভ প্রকাশের জন্য কবি কোথাও অতিশয়োক্তির আশ্রয় লন নাই। তপোবনে বসিয়া নবপরিণীতা নায়িকা স্বামীর প্রতীক্ষায় দিন গুনিতেছেন। সে সময়ে কত বিলাপ, কত পরিতাপ, কত দীর্ঘ নিশ্বাসের অবসর। শক্তিমান কবি সে অবসর একান্ত উপেক্ষার সহিত পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই দীর্ঘ বিরহপালনের সুগভীর গাম্ভীর্য বিলাপের কলরবে ব্যাহত হয় নাই। অথচ কত সহজে এবং কত সংক্ষেপে শকুন্তলার তৎকালীন মনোভাবের পরিচয়টি তিনি দিয়াছেন।

একমাত্র ঋষির অবতারণার দ্বারাই সে-উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। দুর্বাসার প্রতি অমনোযোগই শকুন্তলাব মানসিক অবস্থার সুস্পষ্ট পরিচয় দেয়।

জনসাধারণের সম্মুখে শকুন্তলাবিস্মৃতির একটি কারণ পরিস্ফুট ভাবে দেখাইয়া দেওয়া দুর্বাসা-অবতাবণার আর একটি উদ্দেশ্য। রূপের মোহ কাটিয়া গেলে মনের বন্ধনও শিথিল হইয়া যায়—এই তত্ত্বটি জনসাধারণের পক্ষে উপলব্ধি করা সহজ হইত না, বিশেষতঃ সে-যুগের লোকেব পক্ষে। সেইজন্য একটি সুস্পষ্ট এবং বাহ্যকারণ হিসাবে দুর্বাসার অবতারণা সার্থক হইয়াছে।

প্রণয় বাস্তবিকই মধুর কিন্তু বিরহেব সংস্পর্শে ইহা মধুরতর হইয়া উঠে। যে প্রণয়ে কোন কিছু মালিন্য থাকে তাহা স্বতঃই চঞ্চল, এতটুকু আঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে। বিরহানলে দগ্ধ না হইলে তাহা মালিন্যমুক্ত হইতে পারে না। বিচ্ছেদ-যন্ত্রণাই প্রণয়কে দৃঢ়তর করিয়া প্রেমের স্বরূপ ফুটাইয়া তুলিতে পারে। কালিদাসের দুষ্মন্ত এই বিরহ ভোগ করিবার অবসর পাইয়াছেন, মহাভারতের দুষ্মন্ত পান নাই। মহাভারতে দেখি দর্শনমাত্রেই রাজা শকুন্তলাকে চিনিতে পারিলেন, তবে একবার যে অস্বীকার করিলেন সে কেবল লোকলজ্জাভয়ে। দৈববাণী শ্রবণান্তর তাঁহাকে গ্রহণ করিতে রাজা আর দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু এখানে শকুন্তলাকে রাজার যখন স্মরণ হইল,

তখন তাঁহাকে পাইবার কোন উপায় ছিল না। কাজেই একাধারে অনুতাপ ও বিরহ এই দ্বিবিধ যন্ত্রণায় তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে লাগিল। এইভাবেই কবি রাজার হৃদয়কে পুনর্মিলনের জন্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

এই বিরহ সংঘটনের জন্য দুর্বাসার প্রয়োজন হইয়াছে। দুর্বাসার বাক্য অনুযায়ী অঙ্গুরীয় দর্শনেই রাজার স্মৃতির উদ্রেক হইল। ঋষির অবতারণা না করিলে শকুন্তলাকে দেখিয়া রাজা চিনিতে পারিতেন। তাহা হইলে বিরহের অবকাশ পাওয়া যাইত না, মিলন অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইত।

একবার শকুন্তলার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায় যে, কবি কিরূপ নৈপুণ্যের সহিত এই চরিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি শকুন্তলাকে সমস্ত সদ্‌গুণের অধিকারিণী করিয়াও তাঁহাকে একেবারে দেবতার আসনে বসান নাই। তিনি মানুষ, সুতরাং মানবীয় ভাবসমূহ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহেন। মনুষ্য স্বভাবসুলভ সর্বপ্রকার গুণরাশির সহিত ক্রোধ, অভিমান প্রভৃতি সকল রকম মানবীয় ভাবের সংমিশ্রণ না থাকিলে তাঁহার চরিত্র অত্যন্ত অস্বাভাবিক হইত। রাজার প্রত্যাখ্যানের পর তাঁহাকে প্রীতমনে এবং সহজভাবে গ্রহণ করা শকুন্তলার পক্ষে গৌরবজনক হইত না। আত্মসম্মান-জ্ঞানসম্পন্না কোন রমণীর পক্ষেই তাহা শোভন হইতে পারে না।

শুধু তাহাই নহে, এ অবস্থায় স্বামীকে স্বচ্ছন্দমনে গ্রহণ করিলে হয়তো তিনিও একদিন হংসপদিকার দল বৃদ্ধি করিতেন। কিন্তু কবি শকুন্তলাকে সেভাবে চিত্রিত করেন নাই। শকুন্তলার মধ্যে দেখিতে পাই তেজ ও মাধুর্যের অপূর্ব সম্মিলন, কোমল ও কঠোরের সুসংগত সংমিশ্রণ। সভাগৃহে নিদারুণ অপমানের আঘাত পাইবার পর রাজাকে সুস্থমনে গ্রহণ করা কি এই মহীয়সী রমণীর পক্ষে কোনদিন সম্ভব হইত ? শকুন্তলা কিছু না বলিলেও এত বড় গর্হিত আচরণের পর রাজার পক্ষেও তাঁহার সহিত অসংকোচে মিলিত হওয়া স্বাভাবিক হইত না। কিন্তু ঋষির অবতারণার দ্বারাই এই দুই সমস্যার সমাধান হইয়াছে। যখন উভয়েই বুঝিলেন যে এই বিপত্তির মূলে নিজেদের কোন অপরাধ নাই, একমাত্র দুর্বাসার অভিশাপেই সমস্ত গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে তখন সমস্ত সংশয়, সকল প্রকার দুর্ভাবনা দূর হইল। পুনর্মিলন তখন সম্পূর্ণতা পাইল।

প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ

ভোজরাজ এক দিন ঘোষণা করিয়াছিলেন, যদি কোনো পণ্ডিত তাঁহাকে একটি নব-রচিত শ্লোক শুনাইতে পারেন তাহা হইলে রাজকোষ হইতে তাঁহাকে বহু স্বর্ণমুদ্রা দিয়া পুরস্কৃত করা হইবে।

ঘোষণায় স্বর্ণমুদ্রার একটা সংখ্যাও ছিল। সংখ্যাটা এত অধিক যে, শুনিলেও ঠিক ধারণা করা যাইবে না। আঠারো-লক্ষ-কোটি বলা অপেক্ষা এক কথায় অনেক বলাই ভাল নয় কি?

যাহা হউক, এই আঠারো-লক্ষ-কোটি স্বর্ণমুদ্রা এ পর্যন্ত এক জন কবিও পাইলেন না।

বড় আশ্চর্য ব্যাপার তো! একটা নূতন শ্লোকও কোনো কবি রচনা করিতে পারিলেন না! সে কেমনতর কথা।

আজিকার দিন হইলে আমরা—যাহারা কখনও পদ্য লিখি নাই, সেই আমরাও যেমন তেমন করিয়া চৌদ্দটা অক্ষরকে টানিয়া টুনিয়া ঠেলিয়া ঠুলিয়া গোটাচারেক ছত্র না লিখিয়া ছাড়িতাম না। খেলার কথা তো নয়, আঠারো-লক্ষ-কোটি! না, সে কথা আর ভাবিব না। টাকাগুলা হাতছাড়া হইয়া গেল—এ কথা, মনে করিলে বুক টন্ টন্ করিয়া উঠে।

শেষ পর্যন্ত মনটা খুব সহজেই ঠাণ্ডা হইল। গল্পের শেষ দিকটা যখন শুনিলাম তখন বুঝিলাম ভোজরাজের সবই চালাকি। যেমন তেমন কবিতা তো দূরের কথা খুব উঁচু দরের কবিতা লিখিলেও টাকাটা পাওয়া যাইত না।

হয়তো বা পূর্ব-জন্মে আমিই একজন কবি ছিলাম। হয়তো বা সত্য সত্যই ভালো কবিতা রচনা করিয়া লোভে ভোজরাজের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। শুভ্র বস্ত্র, শুভ্র উত্তরীয়, কণ্ঠে পুষ্পমাল্য, কপালে চন্দনের তিলক—আহা! আমার সেদিনকার সেই মূর্তি আজ কল্পনার দৃষ্টিতে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি।

কিন্তু পুরস্কার বোধ হয় পাই নাই, কিংবা হয়তো পাইয়াছিলাম। ঠিক বলিতে পারি না। একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তরের উপরে এই সমস্যার সমাধান নির্ভর করিতেছে।

প্রশ্নটি এই—আমি পূর্ব-জন্মে কালিদাস ছিলাম কি না? যদি প্রমাণ হয় যে আমি কোনো জন্মে কবি কালিদাস হইয়া জন্মাই নাই, তাহা হইলে অবশ্যই সোনার টাকাগুলা আমার হাতে আসে নাই।

যদি স্থির হয়, আমিই বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় প্রধান কবির আসন অলংকৃত করিয়াছিলাম, তবে সঙ্গে সঙ্গে ধরিয়া লইতে হইবে, পুরস্কারটা আমিই পাইয়াছিলাম। উঃ, আমি যদি কালিদাস হইয়া থাকি! আমার বিশ্বাস, আমিই কালিদাস, এবং কালিদাসই আমি।

আমি বলিতেছি, আমিই ছিলাম কালিদাস। এ-সব যুক্তি-তর্কের কথা নয়। ইহাকে বলে ইন্‌ট্যুইশন্।

এই ইনট্যুইশনই আজ বলিতেছে, পূর্বজন্মে আমি ছিলাম কালিদাস।

আজ বেশ মনে পড়িতেছে—শকুন্তলার কথা। ফার্স্ট অ্যাক্টের সেই জায়গাটা, যেখানে দুষ্মন্তকে গাছের আড়ালে দাঁড় করাইয়া মেয়ে তিনটিকে ছাড়িয়া দিলাম। দুষ্মন্ত বেচারার অবস্থা শোচনীয়।

কিন্তু হইলে হইবে কি? ওদিকে আলংকারিকের দল নায়কের জন্য যে সব গুণাবলীর তলব করিয়া রাখিয়াছে—তাহার খবর তো জানেন। সে সব দস্তুর মানিয়া চলিতে হইলে এমন scene একেবারে মাঠে মারা যায়।

নাটক লিখিতে বসিয়াছি, তাহারও আইন মানিয়া চলিতে হইবে। সত্য কথা বলিতে কি, এক এক দিন এমন মনে হইত যে, কাব্য শাস্ত্র শিকায় তুলিয়া বরং ধর্মশাস্ত্রে মন দিব। কখনও কখনও মনে হইত, চাণক্যই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান। দিব্য লিখিয়া বসিলেন,—'মাতৃবৎ পরদারেষু'। সমালোচনার পথ রাখিলেন না।

আমার অপরাধ, সত্য কথা বলিয়াছি। দুষ্মন্তের পক্ষে যাহা হওয়া সম্ভব তাহাই লিখিয়াছি। তাহাতে নায়ক ছোট হইয়া যায়। কিন্তু আমি কি করিব?

সমালোচক বলিবে, যাহা হওয়া সম্ভব তাহা না বলিয়া যাহা হওয়া উচিত তাহাই লেখ। অর্থাৎ নায়ককে দেবতা করিয়া নাটককে জবাই কর।

ভাগ্যে তাহা করি নাই। তাহা হইলে আজ কি তোমরা আমাকে চিনিতে?

কিন্তু তাহার জন্য কি উদ্বেগ, কি দুশ্চিন্তা! বিধান যাঁহারা দিয়াছেন তাঁহাদের না মানিলে নয়, অথচ তাঁহাদের পুরাপুরি মানিলে যাহা বলিতে চাই তাহা আর বলা হয় না।

নর-নারীর প্রেম জাতি-কুল প্রভৃতি মানে না। ক্ষত্রিয় দুষ্মন্ত একটি আশ্রমের মেয়েকে দেখিয়া আত্মহারা হইল—আত্মহারা হইবে না এমন কথা নীতিশাস্ত্র ছাড়া আর কোথাও লেখে না। শকুন্তলাকে যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছি মনে আছে তো? তপবোনসারল্য ফুটাইবার জন্য আয়োজন খুব অনাড়ম্বর করিয়াছিলাম। চীনাংশুক প্রভৃতি সকল উপকরণই ছিল। কিন্তু এ জায়গায় দেখিলাম বাকলটাই মানায় ভাল।

ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর দেখাইয়া রাজার চোখ ঝলসাইতে হইলে তাহার চেয়েও বড় রাজার দরকার।

নিতান্ত মারিয়া কাটিয়া অনেক চাহিয়া চিন্তিয়া না হয় শকুন্তলার জন্য এক জোড়া সোনার কঙ্কণ ও একখানি পট্টবস্ত্র সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিলাম। তাহাতে ফল কি? রাজবাড়ীর দাসীও যে তাহা অপেক্ষা জমকালো বেশভূষা মাঝে মাঝে পরিয়া থাকে। এ সব স্থলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে যাওয়া বোকামি।

কাজেই ভাবিয়া চিন্তিয়া শকুন্তলাকে বাকল পরাইলাম এবং তাহাও একটু আঁট করিয়াই পরাইলাম। মানুষ দুষ্মন্ত মানুষী শকুন্তলাকে দেখিয়া ক্ষেপিয়া উঠিল, জাতিকুল বিচার করিল না। সমালোচকরা অমনি খড়্গ তুলিয়া ধরিলেন—ঘাড়ে পড়ে আর কি! সে দিন কি বুদ্ধিটাই না মনে আসিয়াছিল! খাঁ করিয়া রাজার মুখে বসাইয়া দিলাম

'সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু
প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ।'

এ সব ইন্‌ট্যুইশনের কথা। সমালোচকের যুক্তির হাঁড়ি একেবারে ফুটা করিয়া দিলাম।

আনুকারিক হাস্যরস

সংস্কৃত সাহিত্যে নব রসের মধ্যে হাস্যরসের একটি স্থান আছে। ইংরেজী সাহিত্যে হাস্যরসের প্রাধান্য বিশেষ ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে।

সাহিত্যকে যদি সত্য সত্যই জীবনের প্রতিচ্ছবি বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে জীবনে হাসির যে মূল্য দিই, সাহিত্যেও তাহার সেই মূল্য স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে। জীবনেও যেমন হাসির প্রকারভেদ আছে, সাহিত্যেও তাহা না থাকিয়া পারে না। হাসির কারণ সম্বন্ধেও একই কথা বলিতে হয়।

শান্তরসেও হাস্য সঞ্জাত হইতে পারে। পুত্র যখন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করে, তখন পিতার মনে আনন্দের উদ্রেক হয়। সেই আনন্দ মুখে স্মিতহাস্যের সঞ্চার করে। এই যে হাসি, ইহা কিন্তু হাস্যরসের বিষয়ীভূত নহে। হাস্যরসের হাসির মধ্যে আছে কৌতুকের প্রাধান্য। যে হাসির মূলে কৌতুক নাই তাহা আর যে রসেরই উদ্রেক করুক না কেন, হাস্যরসের উদ্রেক করিতে পারে না।

কৌতুক জিনিসটার উৎপত্তি হয় অসামঞ্জস্য ও অসংগতি হইতে। যাহা হওয়া উচিত এবং যাহা হইতেছে বা হইয়াছে অর্থাৎ সম্ভাব্য এবং সম্ভূত এই দুইয়ের মধ্যে যখন বিরোধ ঘটে তখনই তাহা কৌতুকের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্য দুই জোড়ার দুই পাটি জুতা পায়ে দিলে হাসি পায়, বাড়ীতে বিলাতী কাপড় পরিয়া সভাস্থলে খদ্দর ব্যবহার করিলে হাস্যোদ্রেকের কারণ হয়, পুরুষ মানুষের মেয়েলি ভাব দেখিলে হাসি আসে। যাহার ঘরে 'ছুঁচোর কীর্তন' বাহিরে সেই ব্যক্তির 'কোঁচার পত্তন' হাস্যকর।

কৌতুক হইতে যে সুখের উৎপত্তি হয় তাহাকে ঠিক আনন্দ বলা চলে না, তাহাকে আমোদ নাম দিলেই সংগত হয়। আনন্দে স্নিগ্ধতা আছে কিন্তু আমোদে আছে উত্তেজনা। এই উত্তেজনার সঙ্গে নিষ্ঠুরতার কিছু না কিছু যোগ আছে। কৌতুকের মধ্যে সেই নিষ্ঠুরতার নিদর্শন সুস্পষ্ট। Priestley বলেন,

A degree of barbarism and rusticity seems necessary to the perfection of humour :—অর্থাৎ কতকটা পরিমাণে বর্বরতা এবং গ্রাম্যতা

হাস্যরসের সম্পূর্ণতা সাধনের পক্ষে প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। প্রিস্টলি সাহেবের এই অনুমান অনেকাংশে সত্য। বাসরঘরে শ্যালিকার হস্তে কর্ণ-মর্দন, তন্দ্রাগত গুরু মহাশয়ের শিখা-কর্তন, নিদ্রিত ব্যক্তির নাসিকায় নস্য-প্রদান, চেয়ারে বসিতে দিয়া উপবেশনকারীর অজ্ঞাতে চেয়ার অপসারণ প্রভৃতি সুপ্রচলিত কৌতুক-প্রচেষ্টা হাস্যরসাস্পদ বলিয়া কেহই গণ্য করিবেন না। ইহাদের মধ্যে আঘাত আছে বলিয়াই কৌতুক।

কৌতুকহাস্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তির কিয়দংশ উদ্ধৃত করি:

"কৌতুকের মধ্যেও নিষ্ঠুরতা আছে। সিরাজউদ্দৌলা দুই জনের দাড়িতে দাড়িতে বাঁধিয়া উভয়ের নাকে নস্য পুরিয়া দিতেন এইরূপ প্রবাদ শোনা যায়—উভয়ে হাঁচিতে আরম্ভ করিত, তখন সিরাজউদ্দৌলা আমোদ অনুভব করিতেন।"

কৌতুকের মধ্যেও নিষ্ঠুরতা আছে, তাহা এক রকম বুঝা গেল। কিন্তু কৌতুকের সহিত যে অসংগতির অবিচ্ছেদ্য যোগ সে অসংগতিটা কোথায়? তাহাই বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হইতেছে।

ইহার মধ্যে অসংগতি কোথায়? নাকে নস্য দিলে তো হাঁচি আসিবারই কথা। কিন্তু এখানেও ইচ্ছার সহিত কার্যের অসংগতি। যাহাদের নাকে নস্য দেওয়া হইতেছে তাহাদের ইচ্ছা নয় যে তাহারা হাঁচে, কারণ, হাঁচিলেই তাহাদের দাড়িতে অকস্মাৎ টান পড়িবে। কিন্তু তথাপি তাহাদিগকে হাঁচিতেই হইতেছে।

"এইরূপ ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসংগতি, উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের অসংগতি, কথার সহিত কার্যের অসংগতি, এগুলোর মধ্যে নিষ্ঠুরতা আছে।"

কৌতুকের মধ্যে যে আঘাত আছে তাহার মূল কারণটাই হইল নিয়মভঙ্গ। "নিয়মভঙ্গে যে একটু পীড়া আছে সেই পীড়াটুকু না থাকিলে আমোদ হইতে পারে না। আমোদ জিনিসটা নিত্যনৈমিত্তিক সহজ নিয়মসংগত নহে; তাহা মাঝে মাঝে এক দিনের; তাহাতে প্রয়াসের আবশ্যক। সেই পীড়ন এবং প্রয়াসের সংঘর্ষে মনের যে একটা উত্তেজনা হয় সেই উত্তেজনাই আমোদের প্রধান উপকরণ।"

এই নিয়মভঙ্গ এবং তজ্জনিত পীড়া এবং তজ্জাত উত্তেজনা ইহাদিগকেও স্থূল

সূক্ষ্ম, অমার্জিত, সুমার্জিত, ইতর, ভদ্র প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এবং প্রত্যেক শ্রেণীকেও নানা স্তরে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বৈয়ক্তিক পরিহাসই বিবর্তনবিধি অনুসরণ করিয়া সাহিত্যিক পরিহাসে রূপান্তরিত হইয়াছে। আদিম মানবের সহিত আধুনিক মানবের যে পার্থক্য, আদিকালের রসিকতার সহিত আধুনিক যুগের রসিকতার সেইরূপ প্রভেদ। তবে অধুনাতন মানব-সমাজেও যেমন আদিমকালীন মনোভাবের পরিচয় একেবারে দুর্লভ নয়, হাস্যরসেরও তেমনই।

নিয়মভঙ্গ বা অসংগতি কৌতুকের উপকরণ বটে, কিন্তু নিয়মভঙ্গ কি কি উপায়ে হয়? এ প্রশ্নের উত্তর যদি দিতেই হয় তো এক কথায় দেওয়াই ভাল। যেহেতু, অনেক কথায় তাহা দেওয়া অসম্ভব। আর সে এক কথা এই যে, নিয়ম ভাঙিলেই নিয়মভঙ্গ হয়। বস্তুতঃ, ইহার অধিক বলিবার প্রয়োজনও নাই। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নিয়মভঙ্গের অভাব নাই। বরং নিয়মটাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হইয়া দাঁড়ায়।

যাহার কণ্ঠে স্বর নাই, সে উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিতেছে, যে ছন্দ মিলাইতে অক্ষম, সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, যে নিজে বিকৃত-মস্তিষ্ক, সে অন্যকে পাগল বলিয়া উপহাস করিতেছে, খোসামোদপ্রিয় বলিয়া যে রামের নামে নিন্দা রটায়, সেই আবার রামের শ্রীচরণকমলে পুস্তক উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইতেছে। যাহা হওয়া উচিত তাহাই নিয়ম কিন্তু যখন উচিতের স্থলে অনুচিতটা ঘটিয়া বসে তখনই হয় নিয়মভঙ্গ। নিয়মভঙ্গের কি অভাব আছে?

রামপ্রসাদ গাহিলেন:

আর কাজ কি আমার কাশী।
ওরে কালীর পদ-কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি॥

ভক্ত সাধকের মুখে ভক্তির বাণী। শুনিয়া মন মুগ্ধ হয়। কথার মধ্যে কারিগরি নাই, অলংকারের আড়ম্বর নাই। কিন্তু হৃদয়ের যে আবেগ—অন্তরের যে অকৃত্রিম উচ্ছাসটুকু বাহির হইয়া পড়িতেছে তাহা ভক্ত-পাঠকের বা শ্রোতার অন্তঃকরণ স্পর্শ না করিয়া পারে না। কিন্তু ঐ সুরের অনুকরণে আজু গোঁসাই যখন গান ধরিলেন:

পেসাদে তোরে যেতেই হবে কাশী।
ওরে তথা গিয়ে দেখবি রে তোর মেসো আর মাসী॥

অমান আমাদের হাস্য সংবরণ কবা দুঃসাধ্য হইল। একটা মহৎ ভাবের মাথায় যেন কোন্ দুষ্টু ছেলে সশব্দে ভুঁইপটকা ফাটাইয়া বসিল।

রামপ্রসাদ গাহিলেন :

এই সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দ-বাজারে লুটি॥

আজু গোঁসাই উত্তর করিলেন :

এই সংসার রসের কুটি।
ওরে খাই দাই আর মজা লুটি॥
যার যেমন মন, তার তেমনি মন কর রে পরিপাটি।
ওহে সেন, অল্পজ্ঞান, বুঝ কেবল মোটামুটি॥
ওরে, শিবের ভাবে ভাব না কেন, শ্যামা মায়ের চরণ দুটি।
ওরে ভাই বন্ধু দারা সুত পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটি॥
জনক রাজা ঋষি ছিল কিছুতে ছিল না ক্রুটী।
সে যে এদিক্ ওদিক্ দুদিক্ রেখে খেতে পেত দুধের বাটি॥
মহামায়ায় বিশ্ব ছাওয়া ভাবছ মায়ার বেড়ি কাটি।
তবে অভেদ জেন শ্যামের পদ শ্যামা মায়ের চরণ দুটি॥

এই গানের মধ্যে অতিরিক্ত আব একটি চরণ কোথাও কোথাও পাওয়া যায় :

যদি ধোঁকাই জান তবে কেন তিনবার কেঁচেছ খুঁটি।

পুত্র না হওয়ায় রামপ্রসাদ না কি তিন বার বিবাহ কবিয়াছিলেন—তাই এই ব্যঙ্গোক্তি।

রামপ্রসাদ গাহিলেন :

মুক্ত কর্ মা মায়া-জালে।

অমনি আজু গোঁসাই ধরিলেন :

বদ্ধ কর মা খ্যাপলা জালে।
যাতে চুনো পুঁটি এড়াবে না মজা মারব ঝোলে ঝালে॥

ইউরোপীয় আলংকারিকগণ হাস্যরসের যে বিভিন্ন শ্রেণীর নির্দেশ করিয়াছেন, wit তাহার অন্যতম। wit বড়র বড়ত্ব সহিতে পারে না। এক জন গুণী ব্যক্তি যদি খোঁড়াইয়া চলেন তো সে গুণটাকে নস্যাৎ করিয়া দিয়া খঞ্জতা লইয়াই তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবে। রামপ্রসাদের গানে সংসারের অসারতা সম্পর্কীয় যে মহদ্ভাবের অভিব্যক্তি আছে, তাহাই ঐ কথা কয়টিকে মনোজ্ঞতা দিয়াছে। সেই জন্যই প্রসাদী গান শুনিয়া আমাদের অন্তর তৃপ্ত হয়। আজু গোঁসাই রামপ্রসাদী গানের মর্মটা বুঝিয়াও বুঝিলেন না। অত্যন্ত গুরুগম্ভীর বিষয়কে নিতান্ত হাল্‌কা হাসির আঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন।

কিন্তু আজু গোঁসাই হাস্যরস পরিবেশন করিতে গিয়াও মাঝে মাঝে বিপদে পড়িয়াছেন। ভাবুক তত্ত্বজ্ঞানী লোকের পক্ষে হাস্যরসিকতা তেমন জমে না। গোঁসাইজীর রসিকতাও তত্ত্বকথার সংমিশ্রণে দানা বাঁধিয়া উঠিতে পায় নাই।

"শিবের ভাবে ভাব না কেন শ্যামা মায়ের চরণ দুটি।

"মহামায়ায় বিশ্ব ছাওয়া ভাবছ মায়ার বেড়ি কাটি।"

"অভেদ জেন শ্যামের পদ শ্যামা মায়ের চরণ দুটি।"

প্রভৃতি পংক্তি হাস্যরস ব্যাহত করিয়াছে। কারণ, হাস্যরসে যে কৌতুক—যে অসংগতি থাকা আবশ্যক, এখানে তাহার কিছুই নাই। এখানে যেন সমস্ত হাস্য-পরিহাসের সমাপ্তি ঘটিয়া গিয়াছে। উল্লিখিত ছত্রগুলি বাদ দিলে আজু গোঁসাইয়ের গানকে প্যারডি আখ্যা দেওয়া যাইত। কারণ, প্যারডি শুধু যে কবিতা বা গানের অনুকরণ মাত্র তাহা নয়, উহা হাস্যরসাত্মকও হওয়া চাই।

আমরা আজু গোঁসাইয়ের গান হইতে দেখিলাম যে, অনুকরণমাত্রেই হাস্যরস নাই। অনুকৃত্য এবং অনুকৃতির মধ্যে আপাত সাদৃশ্য সত্ত্বেও বৈসাদৃশ্যটা যদি নিতান্ত প্রকট হয় তবেই তাহা কৌতুকাবহ হইয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথ ব্রজবুলী ভাষায় লিখিত বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে ভানুসিংহের পদাবলী রচনা করিয়াছেন, তাহাকে কেহ হাস্যরসের দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিবে না। কারণ, উভয় রচনায় ভাবের কিছু সাম্য আছে। অন্ততঃ এতটা অসাম্য নাই—যাহা সহজে ধরা যায়।

অনুকরণ হাস্যরস সৃষ্টির অন্যতম উপায়। বঙ্গসাহিত্যে সেই উপায়টির কিরূপ প্রয়োগ হইয়াছে তাহাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য। অনুকরণের দ্বারা

অসংগতি প্রদর্শনের সুবিধা আছে বলিয়াই হাস্যরসের ক্ষেত্রে অনুকরণের বাহুল্য দেখা যায়। সে অনুকরণ নানাবিধ।

বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দে কবিতা রচনার প্রয়াস নূতন নয়।

ভারতচন্দ্রের ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥

অথবা

দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভণে।

স্মরণ করুন। ইহাতে বাংলার উচ্চারণরীতি রক্ষিত হয় নাই বলিয়া বিচিত্র বোধ হয় বটে, কিন্তু তবু ইহারা হাস্যোদ্রেক করে না।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের

পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল কই গো কই মেঘ উদয় হও।
সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি আজ মন্দ্র মন্থর বচন কও॥

'যক্ষের নিবেদন' হইতে উদ্ধৃত এই পংক্তিগুলি পড়ুন। মন্দাক্রান্তা ছন্দ বাঙ্গালা ভাষার পথে হ্রস্ব দীর্ঘের বাহন পাইয়া দিব্য সহজ গতিতে চলিয়াছে। কৌতুকের কোন অবসর নাই। কিন্তু যদি কোন ছান্দসিক পণ্ডিত বাঙ্গালী ছাত্রকে সংস্কৃত ছন্দ শিখাইবার জন্য রচনা করেন:

ঢাকা কুমিল্লা বরিশালবাসী
লঙ্কামরীচেষু সদাভিলাষী।
জেলে গিয়া কষ্ট করে কয়েদী
গঙ্গাতীরে বাস করে তপস্বী॥

তাহা হইলে না হাসিয়া উপায় নাই। সংস্কৃত কবিতায় যখন গুরু-গম্ভীর কোনো একটা কিছু শুনিবার জন্য প্রত্যাশা করিতেছি, তখন অকস্মাৎ একটা একান্ত তুচ্ছ—একান্ত অসম্ভব কথা আনিয়া ফেলা হইল। শুধু তাই নয়, সংস্কৃত ছন্দ রক্ষা করিতে গিয়া সংস্কৃত এবং বাঙ্গলা উভয় ভাষারই উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করা হইল।

সংস্কৃতে পঞ্চকন্যা স্তোত্র আছে:

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥

অনুকরণ করা হইল :

হেয়ার কশ্চিন্ পামরশ্চ কেরি মার্শমেনস্তথা।
পঞ্চগোরাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥

বিষয়-বস্তু হাস্যকর না হইলেও ভঙ্গীটা হাস্যকর।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সংস্কৃত ছন্দে কয়েকটি সুমধুর হাস্যরসাত্মক কবিতা আছে।

মন্দাক্রান্ত ছন্দে রচিত টঙ্কাদেবী-মাহাত্ম্য :

ইচ্ছা সম্যক্ জগদরশনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি।
পায়ে শিক্লী মন উড়ু উড়ু এ কি দৈবের শাস্তি॥
টঙ্কা দেবী কর যদি কৃপা না রহে দুঃখ-জ্বালা।
বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই কিছু না, খালি ভস্মে ঘি ঢালা॥

শিখরিণী ছন্দে রচিত ইঙ্গ-বঙ্গের বিলাত-যাত্রায় কৌতুকটা একটু প্রবল :

বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য গৌড়ে।
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ বিহগ-প্রাণ দৌড়ে।
স্বদেশে কাঁদে সে গুরুজনবশে কিছু হয় না।
বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌টা ধুতি পিহরনে মান যায় না॥
পিতা-মাতা-ভ্রাতা নবশিশু অনাথা ছুট করি'।
বিরাজে জাহাজে মসিমলিন কুর্তা বুট পরি'।
সিগারে উদ্‌গারে মুহুরমুহু ধূম-লহরী।
সুখস্বপ্নে আপ্নে মুলুকপতি মানে হরি হরি॥
বিহারে নীহারে বিবিজন সনে স্কেটিঙ করি।
বিষাদে প্রাসাদে দুখিজন রহে জীবন ধরি॥
ফিমেলে ফী মেলে অনুনয় করে বাড়ি ফিরিতে।
কি তাহে উৎসাহে মগন তিনি সাহেবগিরিতে॥
ফিরে এসে দেশে গলকলরবেশে হটহটে।
গৃহে ঢোকে রোখে উলগ তনু দেখে বড় চটে॥
মহা আড়ী শাড়ী নিরখি চুল দাড়ী সব ছিঁড়ে।
ছুটা লাথে ভাতে ছরকট করে আসন পিঁড়ে॥

ইংরাজী সাহিত্যে প্যারডি অসংখ্য এবং অনেক প্যারডি সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালা-সাহিত্যেও প্যারডি রচনার চেষ্টা মধ্যে মধ্যে হইয়াছে বটে, কিন্তু উচ্চদরের প্যারডি অধিক নাই, এ কথা দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে।

সুপরিচিত ও সুবিখ্যাত কবিতারই প্যারডি হইয়া থাকে। প্যারডিতে সাধারণতঃ কবিতার উচ্চ কল্পনা থাকে না, থাকে wit এর অম্লমধুর উত্তেজনা। মূল কবিতাকে অনুকরণ বা অনুসরণ করিয়া তাহার উত্তুঙ্গ মাহাত্ম্যকে ধূলিশায়ী করাই প্যারডির ধর্ম। সেই জন্যই উহা হাস্যরসের কারণ।

হাস্যরস সাহিত্যের অঙ্গ নয়, উহা সাহিত্যের ব্যঞ্জন। কিন্তু ব্যঞ্জনটাই যখন ভোজনপাত্রের একমাত্র আধেয় হয়, তখন ভোজপর্বটা ভোক্তার সম্পূর্ণ তৃপ্তিবিধান করিতে সমর্থ হয় না। তবে এমন ঔদরিকও আছে, যে এক কলসী নলেন গুড় পাইলে পরম তৃপ্তিভরে তাহাই গলাধঃকরণ করে। সাহিত্য সমাজে এইরূপ ঔদরিকের সংখ্যা বিরল নয় বলিয়া ভাঁড়ের ভাঁড়ামিও রসিকতা আখ্যা প্রাপ্ত হয়। 'ডি প্রোফণ্ডিস' নামক সুপ্রসিদ্ধ কবিতার সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একবার বলিয়াছিলেন :

"ইংলণ্ডের হাস্যরসাত্মক সাপ্তাহিক পত্র 'পঞ্চে' এই কবিতাটিকে বিদ্রূপ করিয়া 'De Rotundis' নামক একটি পদ্য প্রকাশিত হয়। (মূলটিকে কবিতা এবং অনুকৃতিকে পদ্য বলা হইয়াছে।) আমরা এরূপ বিদ্রূপ কোনো মতেই অনুমোদন করি ন। এরূপ ভাব ইংরেজদের ভাব। কোন একটি বিখ্যাত মহান ভাবের কবিতাকে বিদ্রূপ করা তাঁহারা আমোদের মনে করেন। তাঁহারা কেহ কেহ বলেন যে, কোনো কবির সম্ভ্রান্ত পূজনীয় কবিতাকে অঙ্গহীন করিয়া রং চং মাখাইয়া ভাঁড় সাজাইয়া, রাস্তায় দাঁড় করাইয়া দশ জন অলস লঘুহৃদয় পথিকের দুই পাটি দাঁত বাহির করাইলে সে কবির পক্ষে অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়।

আমাদের জাতীয় ভাব এরূপ নহে। যদি এক জন বৃদ্ধ পূজনীয় ব্যক্তিকে অপদস্থ করিবার জন্য সভামধ্যে কেহ তাঁহার হৃদয়-নিঃসৃত কথাগুলি বিকৃত স্বরে উচ্চারণ করিয়া মুখভঙ্গী করিতে থাকে তবে তাহা দেখিয়া রসিক পুরুষ মনে করিয়া যাহারা হাসে, তাহাদের ধোব-নাপিত বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।"

হাস্যরসের উপাদান মাত্রই দুঃখমূলক। তাহাতে অনেক সময়ই নিষ্ঠুরতা দেখা যায়। কবি নিজেই তাহা দেখাইয়াছেন।

যদি কেহ কোন মান্য ব্যক্তির অনুকরণে বিকৃত মুখভঙ্গী করে তাহা হইলেও কৌতুকের কারণ ঘটে। যে নিষ্ঠুরতা এবং অসংগতি কৌতুকের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, সেই কৌতুক রসই যদি হাস্যের কারণ হয়, তাহা হইলে তাহার ধোবা নাপিত বন্ধ করিবেন কেন?

পঞ্চভূতে কবি নিজেই হাস্যরসের যে উদাহরণটি দিয়া কৌতুকের প্রকৃতি বিচার করিয়াছেন, সেটি এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে:

"একটা গানে শুনিয়াছিলাম, শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রাভঙ্গে প্রাতঃকালে হুঁকা হস্তে রাধিকার কুটীরে কিঞ্চিৎ অঙ্গারের প্রার্থনায় আগমন করিয়াছিলেন শুনিয়া শ্রোতামাত্রের হাস্যের উদ্রেক করিয়াছিল।"

হুঁকা হস্তে শ্রীকৃষ্ণের কল্পনা সুন্দরও নয় এবং আনন্দজনকও নয়; তবু তাহা আমাদের হাসি উদ্রেক করে। কেন করে, সে আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। কিন্তু উদ্রেক যে করে তাহা তো অবশ্যই স্বীকার্য।

এই প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন:

"কৌতুক রসকে আমাদের প্রবীণ লোকমাত্রেই ছেবলামি বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন।...এইরূপ চাপল্য আমাদের বিজ্ঞ সমাজের অনুমোদিত নহে।"

মানুষের স্বভাব জিনিসটা এমনই স্বৈরাচারী যে, সে বিজ্ঞের নিষেধ, প্রবীণের নির্দেশ, শাস্ত্রের অনুশাসন এ সব সকল সময় মানিয়া চলে না। এমন কি, বিধির বিধানকেই মধ্যে মধ্যে উল্লঙ্ঘন করিয়া বসে। কৌতুকে হাসিয়া উঠা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ক্ষেত্রবিশেষে কৌতুক-প্রচেষ্টা এবং তাহা দেখিয়া হাস্য করা সুরুচিসম্মত না হইতে পারে, কিন্তু তাহা অস্বাভাবিক নয়।

বস্তুতঃ একই আঘাত কাহারও পক্ষে অল্প কাহারও পক্ষে অধিক পীড়াদায়ক, তাই একই ব্যাপার এক জনের কাছে ক্রীড়া হইলেও অপরের কাছে দুঃখের কারণ। কৌতুক বস্তুটা কতক পরিমাণে আপেক্ষিক। যে উত্তেজনা কৌতুকের জন্মদাতা, তাহারও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সীমা নির্দিষ্ট আছে।

"এই সীমা ঈষৎ অতিক্রম করিলেই কৌতুক প্রকৃত পীড়ায় পরিণত হইয়া উঠে। যদি যথার্থ ভক্তির কীর্তনের মাঝখানে কোনো রসিকতা-বায়ুগ্রস্ত

ছোকরা হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের ঐ তাম্রকূট-ধূম্র-পিপাসুতার গান গাহিত তবে তাহাতে কৌতুক বোধ হইত না। কারণ আঘাতটা এত গুরুতর হইত যে, তৎক্ষণাৎ তাহা উগ্রতমূর্তি আকার ধারণ করিয়া উক্ত রসিক ব্যক্তির পৃষ্ঠাভিমুখে প্রবল প্রতিঘাতস্বরূপে ধাবিত হইত।"

ইহাতে প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই। কিন্তু যে সভায় এক জন বৃদ্ধ পূজনীয় ব্যক্তির হৃদয়নিঃসৃত কথাগুলি বিকৃত স্বরে উচ্চারণ করিলে সকল সভাসদই ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবেন, এমন সভায় কোনো রসিকতাবায়ুগ্রস্ত ছোকরা মুখভঙ্গী করিতে সাহস পাইবে না। পাইলেও তাহার ফলভোগ করিতে হইবে।

প্যারডি জিনিসটাও একটা সুমার্জিতরুচি অতি ক্ষুদ্র সাহিত্যিক-মণ্ডলীর জন্য রচিত হয় না। তাহা সর্বসাধারণে পড়ে সর্বসাধারণের জন্য তাহা রচিত হয়। অমার্জিত এবং অনতিমার্জিত রুচির খোরাক জোগাইয়া তাহা অল্প দিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। মূল কবিতার যদি সত্যই কিছু বিশেষত্ব থাকে তাহা হইলে তাহা নিজগুণেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া অপ্রতিহত থাকিবে।

ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে, প্যারডিমাত্রই বিদ্রূপাত্মক নহে। রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দিতেছি। এটি একটি ছেলে-ভুলানো ছড়ার প্যারডি। মূল ছড়াটি হইল:

"জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার কালো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ।
তাহার অধিক কালো কন্যে তোমার মাথার কেশ॥

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার ধলো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
বক ধলো, বস্ত্র ধলো, ধলো রাজহংস।
তাহার অধিক ধলো কন্যে, তোমার হাতের শঙ্খ॥

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার রাঙা দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥

জবা রাঙা করবী রাঙা রাঙা কুসুম ফুল।
তাহার অধিক রাঙা কন্তে, তোমার মাথার সিঁদুর॥

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার তিতো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
নিম তিতো, নিসুন্দে তিতো, তিতো মাকাল ফল।
তাহার অধিক তিতো কন্তে, বোন সতিনের ঘর॥

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার হিম দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
হিম জল, হিম স্থল, হিম শীতলপাটি।
তাহার অধিক হিম কন্তে, তোমার বুকের ছাতি॥"

রবীন্দ্রনাথের প্যারডিটি এইরূপ :

"এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার মিঠে দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
বরফি মিঠে, জিলাবি মিঠে, মিঠে শোন-পাপড়ি।
তাহার অধিক মিঠে কন্তে, তোমার হাতের চাপড়ি॥

এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার সাদা দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
ক্ষীর সাদা, নবনী সাদা, সাদা মালাই রাবড়ি।
তাহার অধিক সাদা তোমার পষ্ট ভাষার দাবড়ি॥

এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার তিতো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
উচ্ছে তিতো, পলতা তিতো, তিতো নিমের সুক্ত।
তাহার অধিক তিতো যাহা বিনি ভাষায় উক্ত॥

এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার কঠিন দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ

লোহা কঠিন, বজ্র কঠিন, নাগরা জুতোর তলা।
তাহার অধিক কঠিন তোমার বাপের বাড়ি চলা॥

এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার মিথ্যে দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
মিথ্যে ভেলকি, ভূতের হাঁচি, মিথ্যে কাচের পান্না।
তাহার অধিক মিথ্যে তোমার নাকি সুরের কান্না॥"

যাহা নিজেই হাস্যকর তাহার অনুকরণের দ্বারা হাসির উদ্রেক হয় না। অন্ততঃ হাস্যরসের পক্ষে তাহা অনুকরণীয় নহে। প্যারডির ক্ষেত্রে তাহা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা যায়। যে সকল রচনা সাহিত্যে বিশেষ ভাবে সমাদর লাভ করে, প্যারডি রচনার পক্ষে তাহাদেরই উপযোগিতা বেশী। কিন্তু হালকা জিনিসও যে প্যারডি উদ্রেক করিতে পারে, উল্লিখিত কবিতাটি তাহার একটি সুন্দর নিদর্শন।

তবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপটাই সাধারণতঃ প্যারডির উপজীব্য। রবীন্দ্রনাথের 'দুই পাখী' কবিতাটি মনে করুন :

খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে
কী ছিল বিধাতার মনে। ইত্যাদি

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্যারডি :

পথের লোক বলে চলিছি চলিছিই
পথে যে ভয়ানক কাদা;
বাড়ির লোক বলে ঘরেতে বসে থাকা
কেমন আরামটি দাদা।
পথের লোক বলে উহুহু মরি মরি
গরমে গেল গেল প্রাণ;
বাড়ির লোক বলে আহা হা কি আরাম
টান রে টানাপাখা টান।

পথের লোক বলে চলিছি চলিছিই,
পথ যে ফুরায় না হরি ;
বাড়ির লোক বলে ঘুম তো ভেঙে গেল
দিন যে যায় না কি করি।

অথবা রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান—"কেন যামিনী না যেতে জাগালে না"—এর দ্বিজেন্দ্রলালকৃত প্যারডি :

কেন যামিনী না যেতে জাগালে না,
বেলা হল মরি লাজে—
আলু-থালু এই কবরী আবরি এই আলু-থালু সাজে।
জেগেছে সবাই দোকানী পসারী,
রাস্তায় লোক, আমি কুলনারী,
এখন কেমনে হাটখোলা দিয়ে চলিব পথের মাঝে।

রবীন্দ্রনাথের "আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি"—গানের অনুকরণে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিলেন :

আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি,
তুমি leisure মাফিক বাসিও।
আমি নিশিদিন রেঁধে বসিয়ে আছি
তুমি যখন হয় খেতে আসিও।
আমি সারা নিশি তব লাগিয়া
রব চটিয়া মটিয়া রাগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে এসে
দাঁত বের করে হাসিও।

ব্রহ্ম-সঙ্গীতও দ্বিজেন্দ্রলালের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই :

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ংকর ছাঁদ।
তুমি রৈবে চুপটি করে আর অন্তে করবে সিংহনাদ।
অন্তে মিঠাই মণ্ডা খাবে তুমি খেতে নাহি পাবে ;
শমন এসে বলবে হেসে এখন কোথায় যাবে চাঁদ।
ঘুঘু দেখেছ তো শুধু এখন তবে দেখ ফাঁদ।

বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারডি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে দ্বিজেন্দ্রলালের নামই বিশেষ করিয়া মনে জাগে। তিনি হাসিতে জানিতেন এবং হাসাইতেও জানিতেন। রসিকতা ছিল তাঁহার মজ্জাগত। বঙ্গসাহিত্যে তখন হাস্যরসের প্রাচুর্য ছিল না—এখনই যে আছে তাহা জোর করিয়া বলা যায় না—যাহা ছিল তাহাও আদিরসের আত্যন্তিক সংমিশ্রণে পঙ্কিল। হয়তো সেই কারণেই আমাদের দেশে হাস্যরস অপাংক্তেয় ছিল; বিশুদ্ধ সমাজে হাস্যরসের জন্য কোনো স্বতন্ত্র আসন নির্দিষ্ট ছিল না।

দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গসাহিত্যের এই অভাব লক্ষ্য করিয়াই বিশুদ্ধ হাস্যরস পরিবেশন করিতে মনোযোগী হন। তাঁহার 'হাসির গান' এবং বিবিধ প্রহসন হাস্যরসের অমৃতনির্ঝর। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট। কেবলমাত্র আনুকারিক হাস্যরসই ইহার অলোচনার বিষয়। তাই তাঁহার প্যারডির গণ্ডি অতিক্রম করিতে পারিতেছি না। তিনি শুধু যে অন্যের রচিত গান বা কবিতার অনুকরণ করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহা নহে। অন্য নাটকের অনুকরণে একটি রঙ্গনাট্যও রচনা করিয়াছিলেন। ইহার নাম 'আনন্দবিদায়'। অতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত 'নন্দবিদায়' নাটকের অনুকরণে ইহা রচিত হয়।

হাস্যরসের সহিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে এবং ব্যঙ্গবিদ্রূপমাত্রই অল্প-বিস্তর পীড়াদায়ক। যে কৌতুকের আক্রমণের বিষয় যত সংকীর্ণ, সে কৌতুক তত বেশী পীড়াদায়ক। হাস্যরসে যখন ব্যক্তিগত আক্রমণ সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়, তখন তাহার নির্মলতা নষ্ট হয় এ কথা প্রসঙ্গান্তরেও বলিয়াছি।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দবিদায়' রচিত হয় ১৩১৯ সালে এবং ঐ বৎসরই স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। কিন্তু প্রথম দিনের অভিনয়ের পরই রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ এই নাটক বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন। দর্শকগণ মনে করেন, ইহাতে রবীন্দ্রনাথকে অশোভনরূপে আক্রমণ করা হইয়াছে।

উপরে দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত যে অনুকার কবিতাগুলি উদ্‌ধৃত হইয়াছে সেগুলি আনন্দবিদায় হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্যারডি হিসাবে এগুলি ভাল। স্বতন্ত্র ভাবে ধরিলে কবিতাগুলির মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রমণ পাওয়া যায় না। কিন্তু আনন্দবিদায় নাটকখানি সমগ্র ভাবে বিচার করিলে সন্দেহের উদয় হইতেও পারে। নাটকের কোনো কোনো চরিত্রের মুখে রবীন্দ্রনাথের নামও আছে।

কিন্তু সেই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ তুলিয়া আর লাভ নাই। বাহিরের লোকের কথা কানে না তুলিয়া গ্রন্থকারের কথায় আস্থা স্থাপন করাই সংগত বোধ করি। ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন:

"প্যারডির উদ্দেশ্য ব্যঙ্গ নহে—রঙ্গ; তাহাতে কাহারও ক্ষুব্ধ হইবার কথা নহে, বরং প্রীত হইবার কথা। কারণ বিখ্যাত রচনারই প্যারডি লোকে করিয়া থাকে। মিল্টনের 'প্যারাডাইজ লস্ট', মাইকেলের 'মেঘনাদবধ', হেম বাবুর 'হতাশের আক্ষেপ', ঠাকুর দেবতা বিষয়ক বহু গানও নকলের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। মদ্রচিত কয়েকটি গানও এই সম্মানলাভ করিয়াছে।

"এ নাটিকায় কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই। 'মি'র প্রতি আক্রমণ আছে। গ্যাকামি, জ্যাঠামি, ভণ্ডামি ও বোকামি লইয়া যথেষ্ট ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। তাহাতে যদি কাহারও অন্তর্দাহ হয় তো তিনি দায়ী, আমি দায়ী নহি। আমি তাঁহাদের সম্মুখে দর্পণ ধরিয়াছি মাত্র। যদি ইহা তাঁহাদের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি না হয়, তাহা হইলে এ ব্যঙ্গ তাঁহাদের গায়ে লাগিবার কথা নহে। এক জন কবি অপর কোন কবির কাব্যকে বা কাব্যশ্রেণীকে আক্রমণ করিলে যে তাহা অন্যায় বা অশোভন হয় আমি তাহা স্বীকার করি না। বিশেষতঃ যদি কোন কবি কোনরূপ কাব্যকে সাহিত্যের পক্ষে অমঙ্গলকর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে সেরূপ কাব্যকে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে চাবকাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্তব্য।…"

ইহা ছাড়া "সৌখীন সাহেবী কৃষ্ণভক্তিকে ব্যঙ্গ" করাও তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। প্রস্তাবনায় তাঁহার বক্তব্যটি আরও সুস্পষ্ট।

প্যারডিতে প্রহসনে পিষিয়ে,
গুলে নিয়ে অপেরাতে মিশিয়ে
কটু ও মিষ্টে
(পরে) যা থাকে অদৃষ্টে—
(কাব্যে) কুনীতির পৃষ্ঠে ঝাঁটিকা।
নাহি যাঁর কৃষ্ণে ভক্তি,
বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে দেখি যাঁর
লালসায় শুধু অনুরক্তি—
এটা তাঁরও মস্তকে ছোটখাট চাঁটিকা।

নাটিকটি যে কেবলমাত্র রঙ্গ নয়, ইহাতে যথেষ্ট ব্যঙ্গও আছে এবং সে ব্যঙ্গকে ব্যক্তিগত আক্রমণ বলিয়া মনে করা অসম্ভব নয়—এ আশঙ্কা লেখকের ছিল। কিন্তু সে আশঙ্কা তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে নাই। তাই বেশ উদ্ধত ভাবেই বলিলেন :

কে রসিক বেরসিক জানি না,
বিদ্বেষ নিন্দাও মানি না,
বেরসিক যিনি, তাঁর আছে বেশ অধিকার—
বেশী ভাত খাইবার গিয়ে নিজ বাটিকা।

ব্যক্তিগত আক্রমণের মধ্যে যে হীনতা আছে, দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় তেজস্বী পৌরুষধর্মীর পক্ষে সেই হীনতার আশ্রয় লওয়া স্বাভাবিক নয়। তবে যে "মি"র প্রতি তাঁহার বিপরীত আক্রোশ ছিল, সেই "মি"কে ব্যঙ্গ করিতে গিয়া স্থানে স্থানে তিনি সীমা রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে একটি তাৎকালিক সমালোচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করি :

"দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায়, চরিত্রে ও আচরণে সর্বত্রই পুরুষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মেয়েলি ধরণটা তাঁহার স্বভাবের সম্পূর্ণ বহির্ভূত ছিল। তাই তিনি লম্বা লম্বা কোঁকড়ান চুল রাখা, নাকি-সুরে কথা কওয়া, মন্থর পাদক্ষেপে গমন, অপাঙ্গ-দৃষ্টি নিক্ষেপ প্রভৃতির উপর 'হাড়ে চটা' ছিলেন। পুরুষ চেষ্টা করিয়া স্ত্রীলোকের মত হইবে ইহা তাঁহার অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইত। তাঁহার আনন্দবিদায় নামক অনুকৃতি-কৌতুকে তিনি যেন কতকটা আত্মবিস্মৃত হইয়া অশোভনরূপে ও অন্যায় ভাবে ইহার বিরুদ্ধে ভীষণ আক্রমণ করিয়াছিলেন।"

এই নাটিকায় শুধু রবীন্দ্রনাথের নয় গিরিশচন্দ্র এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের রচনারও প্যারডি আছে। যে নন্দবিদায় নাটিকার অনুকরণে প্রহসনটি রচিত হয়, তাহারও অনেকগুলি গানের প্যারডি ইহাতে আছে। দুই-এক জন পুরাতন কবির রচনাও অনুকৃত হইয়াছে।

গোবিন্দ অধিকারীর "শুক শারীর দ্বন্দ্ব" এক দিন দেশে সুপ্রচলিত ছিল। কিন্তু আজিকার পাঠকের কাছে হয়তো তাহা অপরিচিত। মূলটি জানা না থাকিলে প্যারডির রস উপভোগে বাধা হইবে। সেই জন্য মূল কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

বৃন্দাবনবিলাসিনী রাই আমাদের।
রাই আমাদের, রাই আমাদের, আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
শারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ—
নইলে শুধুই মদন ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল।
শারী বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল—
নইলে পারবে কেন ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূরপাখা।
শারী বলে, আমার রাধার নামটি তাতে লেখা—
ঐ যে যায় গো দেখা ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে,
শারী বলে, আমার রাধার চরণ পাবে বলে—
চূড়া তাইতে হেলে ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ যশোদা-জীবন।
শারী বলে, আমার রাধা জীবনের জীবন—
নইলে শূন্য জীবন ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগৎ চিন্তামণি।
শারী বলে, আমার রাধা প্রেম-প্রদায়িনী—
সে তোমার কৃষ্ণ জানে ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের বাঁশী করে গান।
শারী বলে, সত্য বটে, বলে রাধার নাম—
নইলে মিছে সে গান ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের কালো।
শারী বলে, আমার রাধার রূপে জগৎ আলো
নইলে আঁধার কালো ॥ ইত্যাদি

এবার দ্বিজেন্দ্রনাথের প্যারডি শুনুন :

কৃষ্ণ বলে, আমার রাধে বদন তুলে চাও।

রাধা বলে, কেন মিছে আমারে জ্বালাও—
মরি নিজের জ্বালায় ॥
কৃষ্ণ বলে, রাধে দুটো প্রাণের কথা কই ।
রাধা বলে, এখন তাতে মোটেই রাজী নই—
ম'র ধোঁয়ায় মরি ॥
কৃষ্ণ বলে, সবাই বলে আমার মোহন বেণু ।
রাধা বলে, ওহো শুনে আমি মরে গেনু—
আমায় ধর ধর ॥
কৃষ্ণ বলে, পীতধড়া বলে মোরে সবে ।
রাধা বলে, বটে ! হল মোক্ষলাভ তবে—
থাক্ আর খাওয়া দাওয়া ।
কৃষ্ণ বলে, আমার রূপে ত্রিভুবন আলো ।
রাধা বলে, তবু যদি না হতে মিশ কালো—
রূপ তো ছাপিয়ে পড়ে ।
কৃষ্ণ বলে, আমার গুণে মুগ্ধ ব্রজবালা ।
রাধা বলে, ঘুম হচ্ছে না এতো ভারী জ্বালা—
তাতে আমারই কি ॥
কৃষ্ণ বলে, শুনি হরি লোকে আমায় কয় ।
রাধা বলে, লোকের কথা ক'রো না প্রত্যয়—
লোকে কি না বলে ॥
কৃষ্ণ বলে, রাধে তোমার কি রূপেরই ছটা ।
রাধা বলে, হাঁ হাঁ কৃষ্ণ হাঁ হাঁ তা তা বটে,
সেটা সবাই বলে ॥
কৃষ্ণ বলে, রাধে তোমার কিবা চারু কেশ ।
রাধা বলে, কৃষ্ণ তোমার পছন্দটা বেশ
সেটা বলতেই হবে ॥
কৃষ্ণ বলে, রাধে তোমার দেহ স্বর্ণলতা ।
রাধা বলে, কৃষ্ণ তোমার খাসা মিষ্টি কথা—
যেন সুধা ঝরে ॥

কৃষ্ণ বলে, এমন বর্ণ দেখিনি তো কভু।
রাধা বলে, হাঁ আজ সাবান মাখিনি তো তবু
নইলে আরও সাদা ॥
কৃষ্ণ বলে, তোমার কাছে রতি কোথায় লাগে।
রাধা বলে, এ সব কথা বললেই হত আগে—
গোল তো মিটেই যেত ॥

বাঙ্গালা সাহিত্যে ভাল হাসির কবিতা বেশী নাই। যাহা আছে তাহার মধ্যে এই প্যারডিটি একটি উচ্চাসন দাবি করিতে পারে।

আনুকারিক রচনায় যে হাস্যরসের উদ্ভব হয় ভাবের বৈপরীত্যই তাহার কারণ। রচনার বাহ্যিক আকারটাই অনুকৃত হয়, কিন্তু অন্তর্নিহিত ভাবটা নয়। মূল ও অনুকৃতির মধ্যে ভাবের অসংগতি যত বেশী হইবে (অবশ্য তাহাও একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে), হাস্যের মাত্রাও ততই বৃদ্ধি পাইবার কথা। আলোচ্য অনুকৃতির হাস্যরস যে একটু তীব্র, বাহিরের সহিত ভিতরের আত্যন্তিক অসংগতিই তাহার কারণ।

'শুক-শারীর দ্বন্দ্ব' কবিতাটির মধ্যেও বেশ একটি সুমধুর হাস্যরস আছে, কিন্তু ভক্তিরসের সংমিশ্রণে তাহা কিছু গভীরতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

অনুকার কবিতায় সেই গভীরতা নাই, আছে চপলতার আতিশয্য। কৃষ্ণভক্ত শুক এবং রাধিকাভক্ত শারী স্ব স্ব ভক্তির পাত্রকে বড় করিবার জন্য পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া করিয়াছে। এখানে আধুনিক শ্রীকৃষ্ণ রন্ধনরত রাধিকার কাছে আত্মমহিমা কীর্তন করিতেছেন। উত্তরে রাধা কিন্তু আপন মাহাত্ম্য প্রচার করেন নাই অথবা তিনি যে কৃষ্ণের অপেক্ষা অনেক উচ্চে এমন কথাও বলেন নাই। তবে তাঁহার উত্তরে কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই অসহিষ্ণুতার মধ্যে আপন প্রশস্তি শুনিবার জন্য যে ব্যাকুলতা-টুকু প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা শেষের কয়েকটি অনুচ্ছেদে ব্যক্ত হইয়াছে।

রাধা অবশ্য বলিয়াছেন :

এ সব কথা বললেই হত আগে—
গোল তো মিটেই যেত।

কথাটা খুবই সত্য। কিন্তু লেখক যে গোল মিটাইবার জন্য কলম ধরেন নাই।

হাস্যরসের ক্ষেত্রে প্যারডির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বিরুদ্ধ সমালোচনার তীব্রতা প্যারডির সংস্পর্শে তীব্রতর হইয়া উঠে।

ধরুন, কেহ বলিতে চান মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলায় যথেচ্ছ ভাবে এবং অত্যন্ত অসংগতরূপে নামধাতুর ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ একটা ছন্দই নয়। তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক নায়ক নামের অযোগ্য ইত্যাদি। প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি সেই মত ব্যক্ত করিলেন।

প্রথমতঃ, কথাটা অনেকেরই কানে উঠিবে না, কারণ, পাঠকের সংখ্যা বঙ্গদেশে বিরল, বিশেষতঃ প্রবন্ধ-পাঠকের।

দ্বিতীয়তঃ, যাঁহাদের কানে উঠিবে তাঁহারাও সকলে ঠিক কানে তুলিবেন না।

তৃতীয়তঃ, যাঁহারা কানে তুলিবেন এবং সমালোচকের সহিত একমত হইবেন না, তাঁহারাও সকলে প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিবেন না। (অথচ বাদ-প্রতিবাদ না হইলে কোনো জিনিসই পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।)

চতুর্থতঃ, যাঁহারা প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারাও সকলে সাহস করিয়া অগ্রসর হইবেন না। প্রতিবাদ করিলে তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হয় এবং যুক্তিখণ্ডন করিবার জন্য হয় পাণ্ডিত্য নয় বাক্‌চাতুর্য, অন্তত পক্ষে অবাচ্য কুবাচ্য প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয়। 'ঘরের খাইয়া বনের মোষ' তাড়াইবার হেতুটা কি?

অতএব সমালোচকের মন্তব্য মাঠেই মারা গেল। কিন্তু ঐ কথাটা নীরস গদ্যে না বলিয়া যদি সরস (?) পদ্যে এইভাবে লিখি :

"টেবলিলা সূত্রধর কাপড়িলা তাঁতি"

অমনি সকলেরই নজর পড়িবে। যাহার পড়িবে না, সে-ও অপরের মুখে শুনিবে।

প্যারডি বিশেষজ্ঞের যুক্তি নয়। বিশেষজ্ঞের মতামত সে চাহেও না।

সে একটা বিদ্রূপপূর্ণ ইঙ্গিত করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে। আর সেই ইঙ্গিত আপনার কাজ আপনি করিয়া যায়। প্যারডিকারও অল্পায়াসে পাঁচ জনের মধ্যে খ্যাতি (সাধারণতঃ কুখ্যাতি) লাভ করেন।

'গৌরপদ-তরঙ্গিণী-রচয়িতা' জগদ্বন্ধু ভদ্র বঙ্গ সাহিত্যে সুপরিচিত। কিন্তু তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের অনুকরণে 'ছুছুন্দরীবধ কাব্য' নামক যে ব্যঙ্গকাব্য রচনা করিয়াছিলেন—তাহার কথা আজ অনেকেই বিস্মৃত হইয়াছেন। অথচ ইহার প্রথম প্রকাশের সময় দেশে একটা কৌতুকের বন্যা বহিয়া গিয়াছিল। অনুকারকাব্য হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করি :

"দ্রুহিণবাহন সাধু অনুগ্রহণিয়া
প্রদান' সুপুচ্ছ মোরে—দাও চিত্রিবারে
কিম্বিধ কৌশল বলে শকুন্ত-দুর্জয়
পললাশী বক্রনখ আশুগতি আসি'
পদ্মগন্ধা ছুছুন্দরী সতীরে হানিল ?
কিরূপে কাঁপিলা ধনী নখরপ্রহারে,
যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে।
অর্কক্ষারুহের তলে বিক্রত গমনে—
(অন্তরীক্ষ অধ্বে যথা কলম্বলাঞ্ছিত
সুআশুগ ইরম্মদ গমে সন সনে)
চতুষ্পাদ ছুছুন্দরী মর্মরিয়া পাতা,
অটছে একদা পুচ্ছ পুষ্পগুচ্ছ সম
নড়িছে পশ্চাদ্‌ভাগে।"

এক শতাব্দীর প্রায় ত্রিপাদ অতীত হইতে চলিল। প্যারডি সাময়িক উত্তেজনা জাগ্রত করিয়া কৌতুক-প্রবণ লোকের মনে কিঞ্চিৎ পরিমাণে হাস্যের সঞ্চার করিয়া বিরামলাভ করিয়াছে। কারণ তাহার বেশী প্যারডির আর কিছু করিবার নাই। কিন্তু মূল 'মেঘনাদ' আজও বাঙ্গালীর পাঠশালা হইতে সুরু করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বত্রই নিজগুণে সমাদৃত হইতেছে।

বিখ্যাত কবির ভাব ও ভঙ্গীর প্রতি বিদ্রূপ করিয়া রচিত প্যারডি ইংরেজী সাহিত্যে অনেক আছে, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ওয়র্ডস্‌ওয়র্থের

অনুকরণে রচিত 'ষ্টিফেন' এর (J. K. Stephen) একটি প্যারডি এই প্রসঙ্গে উদ্‌ধৃত করিতেছি :

Two voices are there : one is the deep
It learns the stormcloud's thunderous melody,
Now roars, now murmurs with the changing sea,
Now bird-like pipes, now closes soft in sleep :
And one is of an old half-witted sheep :
Which bleats articulate monotony
And indicates that two and one are three,
That grass is green, lakes damp and mountains
steep;
And, Wordsworth, both are thine ; at certain times
Forth from the heart of thy melodious rhymes,
The form and pressure of high thoughts will burst :
At other times—Good Lord ! I'd rather be
Quite uuacquainted with the A B C
Than write such hopeless rubbish as thy worst.

এই ব্যঙ্গ কবিতাটিতে ওঅর্ডস্‌ওয়র্থের ভঙ্গীটি অতি সুন্দর ভাবে অনুকৃত হইয়াছে। সনেটের আঙ্গিক সুরক্ষিত হইয়াছে। মূল কবির দুইটি বিখ্যাত কবিতার কয়েকটি সুপরিচিত কথা সুকৌশলে উদ্‌ধৃত হইয়াছে—তাহাতে সমালোচনার তীব্রতা বৃদ্ধি হইয়াছে। প্যারডিকার নিজের কথা দিয়া ব্যঙ্গরস এমন জমাইয়া তুলিতে পারিতেন না।

প্রথমটি "Thought of a Briton on the subjugation of Switzerland—যাহার প্রথম দুই লাইন এইরূপ :

Two voices are there : one of the sea,
One of the mountains : each a mighty voice.

আর দ্বিতীয়টিও সুপরিচিত "The world is too much with us" ইহার মধ্য হইতে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করি :

It moves us not,—Great God I'd rather be
A pagan suckled in a creed out-worn :
So might I standing on this pleasant sea
Have glimpses that would make me less forlorn.

মূল কবি বা কবিতার ভাব-ভঙ্গী মুদ্রাদোষ প্রভৃতির প্রতি বিদ্রূপ করা, তাহাদের বিরুদ্ধ সমালোচনা করা, তাহাদের দোষ ত্রুটি দুর্বলতাকে বৃহত্তর করিয়া দেখানো প্যারডির অন্যতম কাজ। 'ছুছুন্দরী বধ' তাহার একটি সুবৃহৎ দৃষ্টান্ত। ক্ষুদ্রতর দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। 'রাহুরচিত মিঠে-কড়া' নামক পুস্তকের কথা আজ বঙ্গবাসী সম্ভবতঃ ভুলিয়া গিয়াছে। ভুলাই স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' নামক কবিতা পুস্তক বাহির হইলে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তাহার কয়েকটি কবিতার ব্যঙ্গানুকরণ করেন এবং সেই ব্যঙ্গানুকৃতিগুলি যে পুস্তকে মুদ্রিত হয় রবিরচিত 'কড়ি ও কোমল'-এর অনুকরণে তাহার নাম রাখেন, "রাহুরচিত মিঠে-কড়া।"

রবীন্দ্রনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে একটি চিঠি লিখিয়াছিলেন। এই চিঠি প্রথম সংস্করণ 'কড়ি ও কোমল'-এ প্রকাশিত হয়। তাহার কিয়দংশ এইরূপ :

তোদের ফেলে সারাটা দিন
আছি অমনি এক রকম,
খোপে বসে পায়রা যেমন
কচ্ছি কেবল বক্‌বকম।
আজকে না কি মেঘ করেছে
ঠেকছে কেমন ফাঁকা ফাঁকা,
তাই খানিকটে ফোঁসফোঁসিয়ে
বিদায় হলো রবি কাকা।

কাব্যবিশারদের সহ্য হইল না। তিনি লিখিলেন :

উড়িস নে রে পায়রা কবি
খোপের ভিতর থাক ঢাকা।
তোর বকবকামি ফোঁস্‌ফোঁসানি
তাও কবিত্বের ভাবমাখা।
তাও ছাপালি গ্রন্থ হলো
নগদ মূল্য এক টাকা।

'কড়ি ও কোমল'-এ একটি পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রখানি কবির বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত। পত্রের পাঠ এইরূপ :

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত প্রিঃ—স্থলচরবরেষু।

চিঠির কিয়দংশ :

জলে বাসা বেঁধেছিলেম
ডাঙায় বড়ো কিচিমিচি
সবাই গলা জাহির করে,
চেঁচায় কেবল মিছিমিছি।
সস্তা লেখক কোকিয়ে মরে
ঢাক নিয়ে সে খালি পিটোয়,
ভদ্রলোকের গায়ে পড়ে
কলম নেড়ে কালি ছিটোয়।
এখানে যে বাস করা দায়
ভনভনানির বাজারে,
প্রাণের মধ্যে গুলিয়ে উঠে
হট্টগোলের মাঝারে।
কানে যখন তালা ধরে
উঠি যখন হাঁপিয়ে
কোথায় পালাই কোথায় পালাই
জলে পড়ি ঝাঁপিয়ে।

জান তো ভাই আমি হচ্ছি
জলচরের জাত
আপন মনে সাঁতরে বেড়াই
ভাসি দিন রাত। ইত্যাদি

কাব্যবিশারদ লিখিলেন :

মাছ সেজেছ বেশ করেছ
'জলচরের জাত'।
আর ভেসো না আর ভেসো না
হবে কুপোকাত।
কতই সাধ যাচ্ছে কবির
আহা মরে যাই,
পায়রা ছিল মাছ হয়েছে
যাচ্ছে উড়োঘাই।
কবি তুমি মানুষ বটে,
হলে পায়রা মাছ।
গেলে স্থলে শূন্যে জলে
বাকি কেন গাছ ?

রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন :

ধার করা নাম নেবো আমি
হবে নাকো সিটি
জানই আমার সকল কাজেই
অরিজিন্যালিটি।

কাব্যবিশারদ ব্যঙ্গ করিয়া লিখিলেন :

চুনো গলি হার মেনেছে
মৌলিকতা দেখে।
যত মুদিমালা বাংলা পড়ে
রবিঠাকুর লেখে॥

রবীন্দ্রনাথের লাঞ্ছনা শুধু কাব্যবিশারদের হাতেই শেষ হয় নাই, কবিরাজ পর্যন্ত হাত তুলিয়াছিলেন। কিন্তু সে সব পুরাতন কথা আজ আর তুলিব না।

জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের ভাগ্যেই এরূপ লাঞ্ছনা ঘটিয়া থাকে, সুতরাং সে জন্য দুঃখ করিব না। দুঃখ এই যে রবীন্দ্রনাথের মত কবির ভাগ্যে নাম করিবার মত প্যারডি জুটে নাই। কোথায় 'কড়ি ও কোমল' আর কোথায় 'মিঠে-কড়া'। ওঅর্ডসওঅর্থের কবিতার সমালোচনা করিতে গিয়া ষ্টিফেন যে ধরণের প্যারডি রচনা করিয়াছিলেন, বাংলা দেশে এক জন কবিও যদি সেই ধরণের একটি প্যারডিও লিখিতেন, তাহা হইলে দুঃখের মধ্যেও কিছু সান্ত্বনা লাভ করা যাইত।

"Parody, if well executed has this merit that it pours criticism swiftly into an unforgettable mould." 'মিঠে-কড়া'-রূপ সমালোচনা সেই অবিস্মরণীয় ছাঁচে ঢালা হইয়াছে কি না, তাহা আজিকার বাঙ্গালী পাঠকসমাজ বিচার করিয়া দেখিবেন। শুধু এ দেশের নহে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাহিত্যেও ভাল প্যারডি স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে এ কথা সত্য। প্যারডি সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য সমালোচকের আদর্শ বেশ উঁচু।

তাঁহাদের মতে "Much that is written in the name of parody is either on the one hand clownish mimicry, or, on the other of no more value than a school exercise neatly performed by an assiduous student."

আলোচ্য প্যারডি কোন্ শ্রেণীর মধ্যে পড়ে তাহা বলা বিপজ্জনক। তবে এই পর্যন্ত বলা যায় যে, উহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কোনো মতেই করা চলে না; কারণ উহা আর যাহাই হউক, "neatly performed" কদাচ নয়।

মূল কবিতার প্রতি কিছুমাত্র ব্যঙ্গ প্রদর্শনের উদ্দেশ্য না রাখিয়া মূল কবির সম্বন্ধে যথেষ্ট শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াও তাঁহার অনুকরণ করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' হইতে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি :

"বাষ্পীয় শকটে চড়ি নারী-চূড়ামণি
পুরবালা চলি যবে গেলা কাশীধামে

বিকালে, কহ হে দেবী অমৃতভাষিণী,
কোন্ বরাঙ্গনে বরি বরমাল্যদানে
যাপিলা বিচ্ছেদ মাস শ্যালীত্রয়ীশালী
শ্রী অক্ষয়।"

এটি যে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম কয়েক ছত্রের অনুকরণ তাহা বোধ করি বলিয়া দিবার প্রয়োজন হইবে না। এই প্যারডিরই ভূমিকায় তাহার ইঙ্গিত আছে :

"তুমি যখন বিদেশে থাকবে তখন আমি 'আর্তনাদবধ কাব্য' বলে একটা কাব্য লিখব।" কিন্তু 'মেঘনাদবধ কাব্য' অথবা তাহার কবির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা কিছু কম ছিল না। কবি বা কবিতার প্রতি বিরুদ্ধ ভাব না থাকিলেও হাস্যরসে ইহা সমুজ্জ্বল। এই হাসির মধ্যে মাধুর্য আছে, বিষ নাই। এখানে যে অসংগতি হাস্যরসের জন্মদাতা, তাহা লঘুগুরুর অসংগতি। যে মেঘনাদবধ কাব্য বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের তথা শিক্ষকবর্গের পক্ষেও বিভীষিকা-স্বরূপ, অনুরক্ত দম্পতির লীলাকলহের অবকাশে তাহার অনুকরণ স্বভাবতঃই হাস্যকর।

কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের বিখ্যাত স্বদেশী গান—

কত কাল পরে বল ভারত রে
দুখসাগর সাঁতারি পার হবে।—

বাঙালী মাত্রেরই পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ-রচিত ইহার প্যারডিও হাস্যরস-মুখর। উপরে উদ্‌ধৃত প্যারডির মত ইহা নির্বিষ নয়—ইহাতে কটুরস কিছু আছে। তবে তাহা কবির বা কবিতার উদ্দেশে বর্ষিত হয় নাই। তদানীন্তন সমাজই তাহার প্রয়োগস্থল।

কত কাল রবে বল ভারত রে
শুধু ডাল ভাত জল পথ্য করে।
দেশে অন্ন-জলের হল ঘোর অনটন,
ধর হুইস্কি সোডা আর মুর্গি মটন।
যাও ঠাকুর চৈতনচুটকি নিয়া।
এস দাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিঞা।

'চিরকুমার সভা'র যে প্রসঙ্গ হইতে এই কবিতাটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা রসিক সমাজে সুপরিচিত।

'প্যারডি'র প্রাথমিক অর্থ হাস্যরসাত্মক অনুকার কবিতা। অন্যের রচিত কবিতার ব্যঙ্গানুকরণই তাই প্যারডির বিষয়ীভূত ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে গদ্যরচনায়ও কৌতুকানুকৃতি বাহির হইতে লাগিল। গদ্য কবিতার মত গদ্য প্যারডিও মধ্যে মধ্যে পাঠকের দৃষ্টিতে পড়িয়া থাকিবে। তবে এ জিনিস খুব বেশী নাই। এখানে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে একটি কৌতুকোজ্জ্বল গদ্যানুকৃতির উল্লেখ করিব।

'পরশুরাম'-রচিত 'পুনর্মিলন' গল্পটি আর একবার পড়ুন।

"পঞ্চপাণ্ডব বিন্ধ্যাটবিতে মৃগয়া করিতে গিয়াছেন। মধ্যম পাণ্ডব একটু বেশী চঞ্চল ও দুঃসাহসিক। তাই দল হইতে ছিটকাইয়া পথভ্রষ্ট হইয়া বনমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সহসা একটি রাক্ষস তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, যুদ্ধং দেহি।

রাক্ষসটি তরুণ...তাহাকে দেখিয়া ভীমের মনে যুগপৎ বীর ও বাৎসল্যরসের সঞ্চার হইল। বলিলেন অরে বালক, তোমার সঙ্গে লড়িব না, বরং তোমার পিতাকে ডাক।

রাক্ষস ঘাড় নাড়িয়া বলিল, চাতুরী চলিবে না। আমার জননী ব্রত পালন করিয়া অভুক্তা আছেন, আজ তাঁহার পারণ। একটি হৃষ্টপুষ্ট মনুষ্য আনিতে বলিয়াছেন। তোমাকে বেশ স্থূলকায় দেখিতেছি, তোমার দ্বারাই তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে।

ভীমের কৌতূহল হইল। বলিলেন, বেশ চল।

অনেক বন জঙ্গল গিরি নদী অতিক্রম করিয়া রাক্ষস ভীমকে একটি প্রকাণ্ড পর্বতগুহার দ্বারদেশে আনিল।

রাক্ষস বলিল, মাতঃ, একবার বাহিরে আসিয়া দেখ, কেমন শিকার আনিয়াছি।

রাক্ষসী বলিল, ও আর দেখব কি। সব মানুষই সমান, ভাল করিয়া রাঁধিলে কে ঋষি কে চণ্ডাল টের পাওয়া যায় না। আমার এখন সময় নাই। চুল বাঁধিতেছি।

রাক্ষস বলিল, চুল বাঁধা থাকুক, একবার বাহিরে আসিয়া দেখ।

পুত্রের নির্বন্ধাতিশয়ে রাক্ষসী গুহা হইতে নির্গত হইয়া বাহিরে আসিল। ভীমকে দেখিয়া চমকিত হইয়া জিহ্বা দংশন করিয়া কহিল, ও মা, আর্যপুত্র যে! ছি, ছি, লজ্জায় মরি! ওরে উন্মাদ, ওরে ঘটোৎকচ, প্রণাম কর বেটা।

ভীম বলিলেন, কেও—দেবী হিড়িম্বা? প্রিয়ে, আজ ধন্য আমি।"

গল্পটি যে ভাসের 'মধ্যম ব্যায়োগ' নাটকের আখ্যানভাগ অনুকরণ করিয়া লেখা হইয়াছে তাহা ভূমিকাতেই বলা হইয়াছে।

"মহাকবি ভাস-রচিত 'মধ্যম' নাটকের আখ্যানভাগ কিঞ্চিৎ অদল বদল করিয়া বলিতেছি।"

এই তো গেল ভূমিকা। আবার উপসংহারও আছে। লেখক যে আখ্যান ভাগ "কিঞ্চিৎ" মাত্র "অদল-বদল" করিয়াছেন, বেশী করেন নাই, কেবল সেইটুকু জানাইবার জন্যই উপসংহার:

"রাক্ষসী কি খাইল ভাস তাহা লেখেন নাই।"

গল্প প্যারডি বলিয়াই নয়, উচ্চশ্রেণীর সুমধুর হাস্যরসের এরূপ দৃষ্টান্ত রস-সাহিত্যের সকল শাখাতেই নিতান্ত বিরল।

অনুপ্রাস

আমাদের যত সাজসজ্জা, পোশাক পরিচ্ছদ, গহনা গাঁটি—এসবের মূল উদ্দেশ্য কি? জীবনে এগুলি আমাদের কোন্ কাজে লাগে?

কাজ আর কিছু না, শুধু সুন্দর করে তোলা। যার রূপ নাই অলংকার তাকে রূপ দেয়, যার আছে তার রূপ বাড়িয়ে তোলে। এই জন্যেই অলংকার। নইলে তার আর কি কাজ?

যেমন মানুষের, তেমনি ভাষারও নানা রকমের অলংকার আছে। যাঁরা নিপুণ শিল্পী তাঁরা এই সব অলংকার দিয়ে ভাষালক্ষ্মীকে সুন্দর করে সাজান।

ভাষার অলংকার দু-রকম। এক হল শব্দের অলংকার। আর এক হল অর্থের।

ভাব বৈচিত্র্য দিয়ে যখন ভাষার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা হয় তখনই অর্থালংকারের প্রয়োগ হয়। উদাহরণ দিয়ে বললে জিনিসটা সহজ হবে।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর দুটি চোখ আর সেই চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি বর্ণনা করতে গিয়ে ভক্ত বলছেন

বিশাল নয়নে প্রভু যেই দিকে চায়।
সেই দিকে নীলপদ্ম বরষিয়া যায়॥

এই কবিতার মধ্যে শব্দের চেয়ে অর্থের চমৎকারিত্বই বেশী।

চোখের বর্ণনায় আর একজন গাইলেন :

আঁখি যুগ ঝর ঝর যেন নব জলধর।

নূতন মেঘের মত তাঁর দুটি চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রুধারা।

একটা চোয়াড় ব্যাধের চোখের বর্ণনা :

দুই চক্ষু জিনি নাটা ঘুরে যেন কড়িভাঁটা।

চক্ষু দুটি নাটা ফলের মত লাল, আর বলের মত গোল। শুধু তাই নয় চোখ দুটি অত্যন্ত চঞ্চলও।

অর্থালংকারের যে সৌন্দর্য তা ঠিক কান দিয়ে ধরা যায় না। এর সৌন্দর্য বুঝতে হলে বুদ্ধি ও কল্পনা থাকা চাই। পাঠকের কল্পনার সঙ্গে, অনুভূতির

সঙ্গে, রসবোধের সঙ্গে লেখকের যদি মিল থাকে তবেই অর্থালংকার সুবোধ্য হয়ে ওঠে।

কি অর্থালংকার আর কি শব্দালংকার উভয়কেই অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এখানে যে অনুপ্রাসের কথা বলছি সে হচ্ছে শব্দালংকারেরই একটি শ্রেণী মাত্র।

শব্দালংকার মাত্রেরই প্রধান সৌন্দর্য ধ্বনিতে। এ সৌন্দর্যের প্রধান বিচারক হল কান। শুনতে যদি ভাল লাগে তবেই শব্দালংকার সার্থক।

একটা ব্যঞ্জন ধ্বনির বারবার আবৃত্তি হওয়াকেই অনুপ্রাস বলে। সাহিত্যের মধ্যে এই অলংকারটি খুবই বিখ্যাত। প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত এর ব্যবহার চলে আসছে।

অনুপ্রাসের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে :

অঞ্জনা নদীতীরে চন্দনী গাঁয়ে
পোড়ো মন্দিরখানা গঞ্জের বাঁয়ে।
জীর্ণ ফাটল ধরা এক কোণে তারি,
অন্ধ নিয়েছে বাসা কুঞ্জবিহারী।
আত্মীয় কেহ নাই নিকট কি দূর,
আছে এক ল্যাজকাটা ভক্ত কুকুর,
আর আছে একতারা বক্ষেতে ধরে
গুন গুন গান গায় গুঞ্জন স্বরে।
গঞ্জের জমিদার সঞ্জয় সেন
দুমুঠো অন্ন তারে দুই বেলা দেন।
সাতকড়ি ভঞ্জের মস্ত দালান,
কুঞ্জ সেখানে করে প্রত্যুষে গান।
হরি হরি রব উঠে অঙ্গন মাঝে
ঝনঝনি ঝনঝনি খঞ্জনি বাজে।
ভঞ্জের পিসী তাই সন্তোষ পান,
কুঞ্জকে করেছেন কম্বল দান।

এই ষোলটি লাইনের মধ্যে একই রকমের ধ্বনির পুনরাবৃত্তি কত বার হয়েছে সেটা লক্ষ্য করবার বিষয়। এক 'ঞ্জ' ধ্বনিটাই প্রায় বার বার শোনা যাচ্ছে। এই 'ঞ্জ' এর উচ্চারণ 'ন্‌জ' এর মত। কাজেই 'ঞ্জ' এর ন এবং কবিতাটির মধ্যে অন্য যতগুলি 'ন' আছে সব মিলে ন এর সংখ্যা প্রায় বিয়াল্লিশ। এ ছাড়া অন্য ধ্বনিও অনেক আছে। তাই কবিতাটি শুনতে এত ভাল লাগে।

এই কবিতারই এক এক লাইন পৃথক ভাবে দেখা যাক। এই যেমন

গুন গুন গান গায় গুঞ্জন স্বরে

এখানে 'গ' ও 'ন' এই দুটি ধ্বনির দ্বারা অনুপ্রাস হয়েছে।

কুঞ্জকে করেছেন কম্বল দান

এখানে 'ক'এ-র বাহুল্যই সকলের আগে কানে লাগে তাছাড়া 'ন' ও আছে।

অনুপ্রাসের আর একটি উদাহরণ সুকুমার রায়ের রচনা থেকে দেখাই:

আয়রে ভোলা খেয়াল খোলা
স্বপন দোলা নাচিয়ে আয়
আয়রে পাগল আবোল তাবোল
মত্তমাদল বাজিয়ে আয়।

এখানে 'ল' ধ্বনির বারংবার আবৃত্তির ফলে অনুপ্রাস হয়েছে। চারটি লাইনের মধ্যে 'ল' আছে আটবার।

ঈশ্বর গুপ্তের রচনা থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করি:

গুড়ু গুড়ু গুম গুম লাফে লাফে তাল।
তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল।

এটি হল এক কথায় সাহেবদের নৃত্য গীতের বর্ণনা। এখানে অনুপ্রাস খুব সুস্পষ্ট।

তপসে মাছের স্তব:

কষিত কনক কান্তি কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁফ দাড়ি তপস্বীর প্রায়॥

এক লাইনে অনেকগুলি 'ক' ভিড় করেছে। প্রাচীন কবিদের রচনা থেকে কয়েকটি উদাহরণ দেখাই। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কাব্যে অনুপ্রাস:

তৈল তুলা তনূনপাৎ তাম্বূল তপন
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ ॥
মধুমালা মারুত মলয় মন্দ মন্দ।
মালতীয়ে মধুকর পীয়ে মকরন্দ ॥

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের এ বিষয়ে দক্ষতা ছিল খুব বেশী। তাঁর লেখা কাব্যে শব্দালংকারের আড়ম্বর সুপ্রচুর। দক্ষালয়ে যাত্রার সময়ে শিবের বর্ণনা :

মহাদেব রূপে মহাদেব সাজে।
বভম্ভম্ বভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে ॥
লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলকল তরঙ্গা ॥
ফনাফন ফনাফন ফণী ফন্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে ॥
ধকধ্বক ধকধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে ॥

আর একস্থান থেকে কিছু উদ্ধৃত করি :

কাল কোকিল অলিকুল বকুল ফুলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণিদেউলে ॥
কমল পরিমল লয়ে শীতল জল।
পবনে ঢল ঢল উছলে কূলে ॥

এই চার ছত্রে 'ক' এবং 'ল'-এর বারংবার আবৃত্তির ফলেই কবিতাটি শুনতে ভালো হয়েছে।

এখন দেখতে হবে অনুপ্রাস থাকলেই কি রচনা সুন্দর হবে? ইচ্ছামত যেখানে সেখানে একই ব্যঞ্জন বর্ণের বারবার উচ্চারণ করলেই কি তা সুন্দর লাগবে? সুন্দর যে লাগে না ঈশ্বরগুপ্তের রচনা থেকেই তা দেখানো যেতে পারে। ঈশ্বরগুপ্তের একটি গান এই রকম :

কে রে বামা বারিদবরণী
তরুনী ভালে ধরেছে তরণী।

কাহারো ঘরণী আসিয়ে ধরণী করিছে দনুজ জয়।
হেরো হে ভূপ, কি অপরূপ, অনুপ রূপ, নাহি স্বরূপ,
মদন নিধন করণ কারণ চরণ শরণ লয়।

অলংকার ততক্ষণই ভাল যতক্ষণ তা সাজসজ্জার সহায়ক হয়। কিন্তু অলংকারের বাড়াবাড়ি হলে তা মানুষকে সব সময় সুন্দর করে না, বরং কুৎসিত করে তোলে। সব জিনিসেরই একটা মাত্রা আছে, তার বাইরে গেলেই শোভা ও শ্রী নষ্ট হয়। কপালে একটি সিঁদুরের টিপ পরলে অনেক রমণীকে সুন্দর দেখায়, তাই বলে যদি সমস্ত মুখটা সিঁদুরে জবড়ে দেওয়া যায় তাহলে কি আর সুন্দর লাগবে? কবিওয়ালাদের অনুপ্রাসবহুল গানই তার দৃষ্টান্ত। সে গানে ভাবের মাধুর্য অল্প কিন্তু শব্দের আড়ম্বর দিয়ে ক্ষতিপূরণ করবার চেষ্টা আছে। কিন্তু একের আধিক্যে অন্যের ক্ষতি পূরণ করা যায় না। কবিওয়ালাদের অনুপ্রাসের কয়েকটি নমুনা দিই। প্রথমটি ভোলা ময়রার :

শোনরে ভ্রষ্ট, বলি স্পষ্ট
তুই রে নষ্ট, মহাদুষ্ট,
তোর কি ইষ্ট কালী কৃষ্ট
ভজগে যা তুই যিশুখৃষ্ট
শ্রীরামপুরের গীর্জাতে।

এখানে বেশ বোঝা যাচ্ছে, শুধু 'ষ্ট' এর লোভে ভ্রষ্ট, স্পষ্ট, নষ্ট, দুষ্ট, ইষ্ট, কৃষ্ট, খৃষ্ট এই সাতটা শব্দকে জোর করে আমদানি করা হয়েছে। এ যেন মাড়োয়ারী মেয়েদের গয়না আর কি! হাতের কব্জি থেকে আরম্ভ করে বাহুর উপর পর্যন্ত। তাতে রূপের বিকাশ তো হয়ই না বরং চাপা পড়ে। কবিতার মধ্যে এইরকম অযথা অনুপ্রাসের ব্যবহারে কবিতার সৌন্দর্যও ঢাকা পড়ে। আর একটি কবি গানে কূল শব্দকে নিয়ে কবি কূল হারিয়েছেন :

গেল গেল কুল কুল, যাক্ কুল
তাহে নই আকুল
লয়েছি যাহার কুল, সে আমারে প্রতিকূল ;
যদি কুলকুণ্ডলিনী অনুকূল হন আমায়
অকূলের তরী কূল পাব পুনরায়।

এখন ব্যাকুল হয়ে কি দুকূল হারাব সই
তাহে বিপক্ষ হাসিবে যত রিপুচয়।

এই ধরণের বাক্‌চাতুর্য সাহিত্যের সভায় চিরস্থায়ী আসন পায় না। যাদের শিক্ষা অল্প, রুচি অমার্জিত, সৌন্দর্যবোধ অপরিণত এই সমস্ত সুলভ অলংকার তাদেরই মন মুগ্ধ করে। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে যাঁদের অধিকার আছে, তাঁরা জানেন গিল্টি করা রকম-বেরকমের তাগা, হার, বাজুবন্ধের চাইতে দুখানি শাঁখের শাঁখার মূল্য অনেক বেশী।

কাব্যের অলংকার সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাটা খাটে।

ব্যঙ্গরসে নৈর্ব্যক্তিকতা

এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা।

কিন্তু এই রঙ্গকে লইয়া কেহ বা রঙ্গরহস্য করেন আবার কেহ বা বেদনায় ব্যথিত হন। বস্তুতঃ ব্যঙ্গের সহিত বেদনার একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সাহিত্যে যে রসের নাম দেওয়া হইয়াছে হাস্যরস, তাহা প্রধানতঃ শান্তরসাশ্রিত নয়।

হাস্যরসের যে হাসি তাহা রোদনেরই প্রকারভেদ মাত্র। যে দুর্ঘটনা একটু গুরুতর হইলেই আমাদের হৃদয়কে পীড়িত করিতে পারে অল্প মাত্রায় তাহাই হাস্যোদ্রেকের কারণ হয়। সে হাসি আনন্দসঞ্জাত নয়, তাহা উত্তেজনাপ্রসূত। পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিলে আমরা হাসি, কিন্তু তাহার মূলে যে কোনো সুখানুভূতি আছে তাহা নহে। হাত পা বাঁধিয়া যদি কেহ দীর্ঘকাল ধরিয়া পায়ে সুড়সুড়ি দিয়া যায়, তাহা হইলে হাসি আর হাসি থাকিবে না, চক্ষু দিয়া অশ্রু নির্গত হইবে, এবং সে অশ্রু যে আনন্দাশ্রু নয় তাহা বলাই বাহুল্য।

সংসারে বাস করিতে গেলে নিছক আনন্দ দিয়া দিন চলে না। হবিষ্যান্ন স্বাস্থ্য ও সাত্ত্বিকতা রক্ষা করিবার পক্ষে উপযোগী বটে কিন্তু মাঝে মাঝে কাঁচা লঙ্কাটাও দরকার হইয়া পড়ে। ঘোলের শরবত শরীরকে স্নিগ্ধ করে সত্য কিন্তু তবু এক পেয়ালা চা ও এক ছিলিম তামাক না হইলে মন মানে না।

কিন্তু হাস্যরসেরও আবার রূপভেদ আছে। ইংরাজি মতে wit, humour, comic প্রভৃতি শব্দে হাস্যরসেরই এক একটি প্রকার বুঝায়। বাঙ্গালায় ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কৌতুক, রঙ্গ প্রভৃতি নাম দিয়া হাস্যরসের শ্রেণী বিভাগ করা যাইতে পারে। এই প্রবন্ধে ব্যঙ্গবিদ্রূপই আমাদের আলোচ্য।

এই কথাটি সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে প্রকৃত হাস্যরস ব্যক্তি-নিরপেক্ষ। অন্ততঃ যে হাস্যরসে ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ আছে তাহা খুব উচ্চদরের হাস্যরস হইতেই পারে না।

যে হাস্যরসের পরিধি যত বিস্তৃত তাহার মাধুর্য ও মর্যাদা ততই বেশী।

কৃপণ প্রতিবেশীর নাম শুনিলে যখন কানে আঙুল দিয়া বলি, 'হায় হায়, আজ বুঝি হাঁড়ি ফাটবে' তখন হাসির হল্লা পড়ে বটে কিন্তু সে হাসির মধ্যে সুরুচির অভাব, ব্যক্তির আলোচনাতেই তাহার পরিসমাপ্তি।

কাব্যবিশারদের 'রাহুরচিত মিঠেকড়া' তাহার দৃষ্টান্তস্থল। কবির কবিতার প্যারডি করিলে দোষের কিছু নাই, কিন্তু কবিকে লইয়া টানাটানি কেন ?

অখ্যাতনামা কবির কবিতার প্যারডি কেহ লেখে না। আর খ্যাতনামা কবির খ্যাতি প্যারডির দ্বারা কমানো যায় না। 'ছুছুন্দরী বধ কাব্যে'র কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে কিন্তু 'মেঘনাদবধে'র মহিমা এখনো অম্লান। কাব্যবিশারদের 'মিঠেকড়া'রও সেই অবস্থা, যদিও 'কড়ি ও কোমলে'র সুর এখনও বঙ্গের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হইতেছে।

তথাপি বলিতে হইবে 'ছুছুন্দরী বধে'র হাস্যরস মিঠেকড়ার ব্যক্তিবিদ্বিষ্ট রসিকতা হইতে উচ্চতর।

জগদ্বন্ধু ভদ্র মধুসূদনের ছন্দ, উপমা, এবং শব্দপ্রয়োগ লইয়াই লেখনী ধরিয়াছিলেন।

মধুসূদনের কাব্যে দুরূহ শব্দের ব্যবহার অল্পবিস্তর আছে একথা সত্য। কাজেই তিনি যখন লিখিলেন :

> অর্কস্মারুহের তলে বিদ্রুত গমনে
> (অন্তরীক্ষ অধ্বে যথা কলঙ্ক-লাঞ্ছিত,
> সুআশুগ ইরম্মদ গমে সনসনে)
> চতুষ্পদ ছুছুন্দরী মর্মরিয়া পাতা
> অটছে একদা, পুচ্ছ পুষ্প গুচ্ছ সম
> নড়িছে পশ্চাদ্‌ভাগে।—

তখন পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে একটু হাস্যরসের সঞ্চার অবশ্যই হইয়াছিল। কিন্তু কাব্যবিশারদের 'মিঠেকড়া'য় কবিতার অপেক্ষা কবির প্রতিই আক্রোশ বেশী।

> আয় তোরা কে দেখতে যাবি
> ঠাকুরবাড়ীর মস্ত কবি।

হায়রে কপাল হায়রে অর্থ
যার নাই তার সকল ব্যর্থ।

... ...

তোর বক্‌বকামি ফোঁসফোঁসানি
তাও কবিত্বের ভাবমাখা।
তাও ছাপালি গ্রন্থ হল
নগদ মূল্য এক টাকা।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার অভিনবত্ব তখন বঙ্গীয় পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে, কাব্য-বিশারদের তাহা ভাল লাগিল না। তিনি লিখিলেন :

চুনোগলি হার মেনেছে
মৌলিকতা দেখে।

এই প্যারডির সহিত জগদ্বন্ধু ভদ্রের ছুছুন্দরী বধের তফাত এই যে যাঁহারা মেঘনাদ পড়িয়াছেন তাঁহাদেরই একদল উহা পড়িয়া কৌতুক অনুভব করিবেন। মূল না পড়িলে তাহার রস উপলব্ধি করা যাইবে না। এই যে কৌতুক ইহা একপ্রকার সাহিত্যিক কৌতুক। কিন্তু 'মিঠেকড়া'র কৌতুকে ঈর্ষাটাই বলবতী। তাহার উপভোগ করিবার জন্য নিন্দাপ্রিয়তাই যথেষ্ট। তাহার রস যাহাকে পরিতৃপ্তি দিবে তাহার 'কড়ি ও কোমল' পড়ার কোনো প্রয়োজন নাই।

বঙ্কিমের লোকরহস্যে হাস্যরসের যে প্রচুর উপাদান সঞ্চিত আছে তাহা দুই চারিটি স্থল ছাড়া অধিকাংশক্ষেত্রেই ব্যক্তিনিরপেক্ষ। তাঁহার আক্রমণের বিষয় জাতি ও সমাজ। লোকরহস্যের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :

"সামাজিক যে সকল দোষ, তাহাতে রহস্য-লেখকের অধিকার সম্পূর্ণ। ব্যক্তিবিশেষের যে দোষ, তাহাতে রহস্যলেখকের কোন অধিকার নাই—কদাচিৎ অবস্থাবিশেষে অধিকার জন্মে ; যথা, ভ্রান্ত রাজপুরুষের ভ্রান্তিজনিত কার্যের প্রতি অথবা মূর্খ গ্রন্থকর্তার গ্রন্থের প্রতি, রহস্য প্রযুজ্য। এ গ্রন্থের সে

সকল উদ্দেশ্য নহে। এ গ্রন্থে শ্রেণীবিশেষ বা সাধারণ মনুষ্য ব্যতীত ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কোন ইঙ্গিত নাই।"

যদি বা থাকে তাহাও ব্যক্তি হইতে নৈর্ব্যক্তিকে গিয়া পৌঁছিয়াছে। 'কোন স্পেশিয়ালের পত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে একটি অনুচ্ছেদ এইরূপ :

"সর উইলিয়ম জোন্স হইতে মক্ষমূলর পর্যন্ত প্রাচ্যবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, এদেশে সংস্কৃত নামে আর একটি ভাষা আছে। কিন্তু এদেশে আসিয়া কাহাকেও সংস্কৃত কহিতে বা লিখিতে দেখি নাই। সুতরাং এদেশে সংস্কৃত ভাষা থাকার বিষয়ে আমার বিশ্বাস নাই। বোধ হয় এটি সর উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতির কারসাজি।"

প্রাচ্যদেশের সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের এইরূপ গবেষণা নিতান্ত বিরল নহে। অতএব তাহা লইয়া রসিকতা করিলে তাহাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ বলা চলে না।

রাজধানী "কালকাটা"র ব্যুৎপত্তিনির্ণয়ে স্পেশিয়াল যে পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন তাহাতে অতি সহজে হাস্যোদ্রেক হয়। স্পেশিয়ালের গবেষণা এইরূপ :

"রাজধানীর নাম 'কালকাটা' (Calcutta) 'কাল' এবং 'কাটা' এই দুইটি বাঙ্গালা শব্দে এই নামের উৎপত্তি। এই নগরীতে কাল কাটাইবার কোন কষ্ট নাই, 'এই জন্যই ইহার নাম 'কালকাটা'।"

পণ্ডিতম্মন্য অজ্ঞব্যক্তির ভ্রমাত্মক গবেষণার ইহা একটা type মাত্র। এ স্থলে কৌতুকের মধ্য দিয়া মূর্খের পণ্ডিতম্মন্যতাকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে। এখানে অবশ্য বাঙ্গালী নিজে নিন্দাহত হইয়া নিন্দুকের প্রতি পুনরাঘাত করিতেছে। ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির বিদ্বেষ না হইলেও এখানে একটি বিশেষ জাতির সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ জাতির মতামত ব্যক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং নিতান্ত সংকীর্ণ না হইলেও এ রহস্যের পরিধি সুবৃহৎ ও সমুদার নহে।

কিন্তু এই রসিকতাই আরও একটু নিম্নস্তরে নামিয়া আসিয়াছে যখন পূর্বোদ্ধৃত অনুচ্ছেদটির পাদটীকায় বঙ্কিম ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত অনুচ্ছেদের পাদটীকায় আছে :

"সাবধান, কেহ হাসিবেন না। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডুগাল্ড স্টুয়ার্ট যথার্থই এই মতাবলম্বী ছিলেন।"

রহস্য হিসাবে স্তর একটু নামিয়া গেলেও বঙ্কিমের পক্ষ লইয়া এই কথা বলা যায় যে, তিনি যে বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়াছেন বঙ্গদর্শনের সকল পাঠক তাহার মর্ম উদ্‌ঘাটন করিতে পারিবেন না—এই আশঙ্কা তাঁহার মনে বদ্ধমূল ছিল। তাই যাহা রহস্য অর্থাৎ গোপনীয়, তাহাকে ব্যক্ত করিয়া রহস্যের রহস্যত্ব নষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

অতি প্রকাশ দ্বারাই রহস্যের বিনাশ হয়। রহস্যকে যদি ব্যাখ্যা করিয়া জানাইতে হয় তবে তাহা রহস্যকারের পক্ষে পরম দুর্ভাগ্যের বিষয়। তাই কবি বড় দুঃখেই লিখিয়াছেন:

ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্
শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।

পৃথিবীতে আর যতরকমের দুঃখ আছে তাহার সমস্তই ভোগ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু হে চতুরানন, অরসিকের নিকটে রস নিঃবেদন—এই দুঃখটি অদৃষ্টে লিখিও না।

উল্লিখিত স্পেশিয়ালের পত্রে আর একটি মন্তব্যেরও ওইরূপ পাদটীকার দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রবন্ধে আছে:

"বাঙ্গালিরা স্ত্রীলোকদিগকে পরদানশীন করিয়া রাখে শুনা আছে। ইহা সত্য বটে তবে সর্বত্র নয়।"

ইহার পাদটীকায় বলা হইয়াছে:

"বাঙ্গালি স্ত্রীলোকেরা কেহ কেহ অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া রাজপুত্রকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল।"

এই প্রসঙ্গে প্রবন্ধের অন্তর্গত আর একটি ছত্র উল্লেখযোগ্য:

"যখন কোনো লাভের কথা না থাকে, তখন স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে রাখে, লাভের সূচনা দেখিলেই বাহির করিয়া আনে।"

এই সকল উক্তির মধ্যে ইঙ্গিত আছে কিন্তু সে ইঙ্গিত অত্যন্ত সুস্পষ্ট

তাই ইহার রসে স্থূলতা অনেকটা প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। পাদটীকার দুঃশাসন রসিকতার বস্ত্র আকর্ষণ করিয়া সভামধ্যে তাহার অপমান করিয়াছে।

বঙ্কিম অরসিক দেশবাসীকে স্মরণ করিয়া নিজেকে কতকটা সুলভ করিয়াছেন সত্য, তথাপি তাঁহার সুমার্জিত মন তাহাতে সম্পূর্ণ সায় দেয় নাই। দুঃশাসন বস্ত্র আকর্ষণ করিলেও বঙ্কিমের নারায়ণ রসশ্রীকে চরম অপমান হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার বিপরীত দৃষ্টান্তের অভাব নাই। হেমচন্দ্রের 'বাজিমাৎ' স্মরণ করুন:

বেঁচে থাকো মুখুজ্জের পো
খেললে ভালো চোটে।
তোমার খেলায় রাং রূপো হয়,
গোবরে শালুক কোটে॥

*　　*　　*

পুণ্য দিনে বিশে পোষ বাঙ্গালার মাঝে।
পর্দা খুলে কুলবালা সম্ভাষে ইংরাজে॥

*　　**　　*

ধন্য হে মুখুজ্জে ভায়া বলিহারি যাই।
বড় সাপ্‌টা দরে সাত করিলে
খেতাব সি-আই-ই॥

জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়কে যৎপরোনাস্তি বলিয়াও যখন রসনাকণ্ডূতি নিবারিত হইল না তখন শেষ পর্যন্ত তাঁহার পত্নীর প্রতি সম্বোধন করিয়া বলা হইল:

এগিয়ে এসো বড় ঠাকরুণ
সাত পোয়াতির মা।
তক্ত পাবেন তোমার তিনি
তাও কি জান না॥ ইত্যাদি

বিষয় একই। কিন্তু লেখক দুইজন। বঙ্কিমের পক্ষে এত দূরে নামিয়া আসা অসম্ভব।

ব্যক্তিগত আক্রমণকে নিন্দা করিয়াও যে বঙ্কিম সর্বত্র সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ হইতে পারেন নাই তাহার এক কারণ প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি,—পাঠকের বুদ্ধি সম্বন্ধে সংশয়। দ্বিতীয় কারণ এই যে, যে ব্যক্তি স্বীয় কর্মের দ্বারা সমস্ত সমাজকে পীড়িত, ক্ষতিগ্রস্ত অথবা উপহসিত করে সে নিজেও নিন্দার পাত্র—ইহাই হইল বঙ্কিমের ধারণা। নিন্দা তাহার প্রাপ্য; তাহার প্রতি বিদ্রূপ করিলে ব্যক্তিগত আক্রমণের পাপ বর্তায় না। তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া যে বজ্র নিক্ষিপ্ত হয় তাহা শুধু তাহাকে দগ্ধ করিয়াই নির্বাপিত হয় না, তাহার কীর্তিকে সুদ্ধ বিপর্যস্ত করিতে চায়। এই জন্য এক হিসাবে তাহা নৈর্ব্যক্তিক। ব্যক্তি সেখানে লক্ষ্য নয়, উপলক্ষমাত্র।

ব্যক্তিবিশেষের দোষে রহস্যলেখকের কোন অধিকার নাই বঙ্কিম তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। অথচ সেই বঙ্কিমই বলিয়াছেন, 'কদাচিৎ অবস্থাবিশেষে অধিকার জন্মে ইত্যাদি।' বঙ্কিম মধ্যে মধ্যে সেই অধিকার গ্রহণ করিয়াছেন।

লোকরহস্যের বিজ্ঞাপনে যদিও এ কথা স্পষ্টতঃ লিখিত হইয়াছে যে, 'এ গ্রন্থে শ্রেণীবিশেষ বা সাধারণ মনুষ্য ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কোন ইঙ্গিত নাই।' তবু একথা সম্পূর্ণ মানিয়া লওয়া যায় না। পূর্বোদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিই বঙ্কিমের এই উক্তি স্বীকার করিতে বাধা দেয়।

তবে ইহার মধ্যেও কথা আছে। লোকরহস্যের মধ্যে যে সমস্ত প্রবন্ধ আছে তাহার প্রত্যেকটিতেই রহস্যের বিষয় রহস্যেরই যোগ্য বটে। মধ্যে মধ্যে যে সংকীর্ণতাদোষ দৃষ্টিগোচর হয় তাহা রহস্যের মূল সুরকে ব্যাহত করে না। ব্যক্তিগত ইঙ্গিত এবং নামোল্লেখ দুই চারিটি যাহা আছে, তাহা যদি সম্পূর্ণ ছাঁটিয়া বাদ দেওয়া যায় তাহাতেও প্রধান বক্তব্যের কিছুমাত্র অঙ্গহানি হয় না।

'ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল' প্রবন্ধটির প্রধান লক্ষ্য কি ?

প্রধান লক্ষ্য সমগ্র মনুষ্য সমাজ। মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ঈর্ষা দ্বেষ লোভ স্বার্থচিন্তা প্রভৃতি সর্বপ্রকার দীনতার বিরুদ্ধে লেখকের বিদ্রোহ। তিনি নীতি-নিপুণের আসনে বসিয়া মানুষকে নিন্দা করেন নাই, তীব্র বিদ্রূপে তাহাকে কশাহত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন মানুষের পশুত্ব লেলিহজিহ্ব রক্তনেত্র নখদন্তসমাকুল বিকট কুৎসিত দেহটাকে লইয়া মানুষেরই মনুষ্যত্বকে দিন দিন

লাঞ্ছিত অপমানিত করিতেছে। সমালোচনার এই সার্বজনীনতা—ইহাই হইল হাস্যরসের প্রাণ। কিন্তু ইহার মধ্যেও একটি পাদটীকা দেখুন।

প্রবন্ধান্তর্গত যে অনুচ্ছেদটির টীকা দেওয়া হইয়াছে প্রথমে সেইটি উদ্ধৃত করিতেছি:

"আমরা পূর্বাপর শুনিয়া আসিতেছি যে, মনুষ্যেরা ক্ষুদ্রজীবী হইয়াও পর্বতাকার বিচিত্র গৃহ নির্মাণ করে। ঐরূপ পর্বতাকার গৃহে তাহারা বাস করে বটে, কিন্তু কখনও তাহাদিগকে ঐরূপ গৃহ নির্মাণ করিতে চক্ষে দেখি নাই। সুতরাং তাহারা যে ঐরূপ গৃহ স্বয়ং নির্মাণ করিয়া থাকে—ইহার প্রমাণাভাব। আমার বোধ হয়, তাহারা যে সকল গৃহে বাস করে, তাহা প্রকৃত পর্বত বটে, স্বভাবের সৃষ্টি ; তবে তাহা বহুগুহাবিশিষ্ট দেখিয়া বুদ্ধিজীবী মনুষ্যপশু তাহাতে আশ্রয় করিয়াছে।"

অনেকের গবেষণায় এরূপ গবত্ব থাকে, অথচ এই সমস্ত অসাধারণ উদ্ভাবনাই ওই সকল পণ্ডিতের অসাধারণত্ব প্রচার করিয়া থাকে। মানুষের মধ্যে সাধারণই সংখ্যায় বেশী ; তাহারা নূতন একটা কিছু দেখিলে বা শুনিলে কখনও বিস্ময়ে, কখনও ভক্তিতে, কখনও ভয়ে, কখনও বা উল্লাসে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সত্য মিথ্যা তলাইয়া দেখিবার অবকাশ পায় না।

বঙ্কিম এইরূপ উদ্ভট কল্পনার বিরুদ্ধে তাঁহার পরিহাসের ছুরিকা চালনা করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাদটীকা থাকায় রসের পরিধি ক্ষুদ্রতর হইয়া গেল। পাদটীকাটি এইরূপ:

"পাঠকমহাশয়, বৃহল্লাঙ্গুলের ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না! এইরূপ তর্কে মক্ষমূলর স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা লিখিতে জানিতেন না। এইরূপ তর্কে জেমস মিল স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা অসভ্য জাতি, এবং সংস্কৃত ভাষা অসভ্য ভাষা। বস্তুতঃ এই ব্যাঘ্র পণ্ডিতে এবং মনুষ্যপণ্ডিতে অধিক বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না।"

পাঠক পাছে বুঝিতে না পারেন এই ভয়েই নিশ্চয় বঙ্কিম টিপ্পনী দিয়াছেন, কিন্তু না দিলেই ভাল করিতেন। কৌতুকে এ জিনিসের কোনো প্রয়োজনই নাই। বঙ্কিম যে তাহা জানিতেন না এমন নয়। কিন্তু একজন বিদেশী শুধু রাজার জাত বলিয়াই যে আমাদের সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা বলিয়া যাইবে এবং

আমরা চক্ষু বুজিয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত তাহা হজম করিয়া যাইব, বঙ্কিমের পক্ষে ইহা অসহনীয় ছিল। তাঁহার অন্তরের জ্বালা তাই মধ্যে মধ্যে কৌতুকের আবরণ ছিন্ন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

ব্যক্তিগত আক্রমণ বঙ্কিমের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। যেখানে বিরুদ্ধ সমালোচনার কথা, সেখানেও তাঁহার ভাষা কখনও সৌজন্য ও সুরুচির মাত্রা তিলমাত্র অতিক্রম করে নাই।

রবীন্দ্রনাথ তখন মাত্র তেইশ বৎসরের যুবক। সে সময়ে হিন্দুধর্মের আদর্শ লইয়া দেশের মধ্যে খুব কথা-কাটাকাটি চলিতেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রও সেই তর্কবিতর্কে বিজড়িত ছিলেন। ঘটনাক্রমে যুবক রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতিপক্ষ হইয়া পড়েন। নবীন প্রবীণের এই লেখনীসংগ্রাম তদানীন্তন সাহিত্যসমাজে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল।

বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের এই বিরোধ বেশ কিছুদিন চলিয়াছিল। সে সময়কার 'ভারতী' ও 'প্রচার' পত্রিকায় তাহার নিদর্শন আছে। কিন্তু এই বিরোধে পরস্পরের মত এবং যুক্তি সম্পর্কে যতই কঠিন আলোচনা হউক না কেন, লেখকের প্রতি কোনোপক্ষই কোনোদিন অসম্মান দেখান নাই। এই তর্কযুদ্ধের সময়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, তাঁহাদের যুদ্ধের ধারাটা ছিল কি রকম। এ যেন তরণীসেনের যুদ্ধযাত্রা—রামনামের নামাবলী গায় দিয়া রামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ।

"আমি বঙ্কিমবাবুর সহিত মুখোমুখী উত্তর প্রত্যুত্তর করিবার যোগ্য নহি, তিনিই আমার স্পর্ধা বাড়াইয়াছেন। তবে বঙ্কিমবাবুর হস্ত হইতে বজ্রাঘাত পাইবার সুখ ও গর্ব অনুভব করিবার জন্যই আমি লিখি নাই, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া আমার জ্ঞান হইয়াছিল তাই আমার কর্তব্য সাধন করিয়াছি। নহিলে সাধ করিয়া বঙ্কিমবাবুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে আমার প্রবৃত্তি হয় না, ভরসাও হয় না।"

বঙ্কিমবাবুর উত্তর প্রত্যুত্তরও অনুরূপ ছিল। তবু বোধ হয় উভয়ের মনে একটু দাগ পড়িয়াছিল। কিন্তু সে দাগটি বঙ্কিম স্বহস্তেই মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন :

"এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে। যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছেন।"

হাস্যরসের প্রসঙ্গে এই কথা উঠাইবার উদ্দেশ্য শুধু এই যে ব্যক্তিগত আক্রমণ বঙ্কিমের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। ব্যক্তির প্রতি কটাক্ষে শুধু হাস্যরসের রসহানি হয় বলিয়াই তাহা খারাপ তাহা নহে, তাহাতে করিয়া সাহিত্যমাত্রেরই কৌলীন্য নষ্ট হয়, তাহার আভিজাত্য লোপ পায়। বৃহত্তের মধ্যে যাঁহারা আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা এই ক্ষুদ্রতা হইতে দূরে না থাকিয়া পারেন না।

রবীন্দ্রনাথের কথাই ধরা যাক। তাঁহার রচিত 'হিং টিং ছট' স্মরণ করুন।

স্বপ্নকথা শুনি মুখ গম্ভীর করিয়া
কহিল গৌড়ীয় সাধু প্রহর ধরিয়া,—
নিতান্ত সরল অর্থ অতি পরিষ্কার
বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার ;
ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ
শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দ্বিগুণ বিগুণ।
বিবর্তন আবর্তন সংবর্তন আদি
জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসম্বাদী।
আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি
আণব চৌম্বকবলে আকৃতি বিকৃতি।
কুশাগ্রে প্রবহমান জীবাত্ম বিদ্যুৎ
ধারণা পরমাশক্তি সেথায় উদ্ভুত।
ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট
সংক্ষেপে বলিতে গেলে—হিং টিং ছট।

অনেকে মনে করেন চন্দ্রনাথ বসুকে লক্ষ্য করিয়া কবিতাটি লেখা হইয়াছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহা অস্বীকার করিয়াছেন। বস্তুতঃ চন্দ্রনাথ বসুর সহিত তাঁহার যে পরিমাণ মসীযুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে আর তাঁহাকে প্রচ্ছন্নভাবে

আক্রমণ করিবার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। তবে এ কথা খুবই সত্য যে, তখন হিন্দুসমাজের পক্ষ লইয়া যাঁহারা লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের অযৌক্তিক মতবাদের সাড়ম্বর ব্যর্থতা হইতেই এই কবিতার উদ্ভব। তর্ক যখন যুক্তি মানে না, তখন হয় মারামারি করিতে হয় আর নয়তো চুপ করিয়া যাইতে হয়। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ওই দুটার কোনোটাই করেন নাই। তিনি বিদ্রূপের বজ্রশেল হানিলেন। তাহার দাহ অযুক্তিমাত্রকেই দগ্ধ করিল। অমুকের গোঁড়ামি বলিয়া নয়, গোঁড়ামিমাত্রই তাহার লক্ষ্য।

তথাপি যে ব্যক্তিগত আক্রমণ বলিয়া লোকে ধারণা করিল তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, লোকে তাহা মনে করিতে পারিলেই মজা পায়।

চরিত্র আঁকিবার ক্ষমতা যাঁহার আছে তিনি এমন চরিত্র অতি সহজেই আঁকিয়া থাকেন যে চরিত্রকে আমাদের অতি পরিচিত মনে হয়। লেখকের পর্যবেক্ষা ও প্রকাশের উপরই সেরূপ চিত্রাঙ্কন নির্ভর করে।

'ধর্মপ্রচার' শীর্ষক রবীন্দ্রনাথের আর একটি কবিতা এস্থলে উল্লেখযোগ্য মনে করি।

এই কবিতায় বলা হইয়াছে যে, ইহার বর্ণিত ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিমের মত রবীন্দ্রনাথকেও কৈফিয়ত দিতে হইয়াছে। কৈফিয়তের কারণ পূর্বে বঙ্কিম প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছি এখানেও অনেকটা তাই।

এই কবিতায় হিন্দুর হিন্দুয়ানি এবং বাঙ্গালীর বীরত্বের প্রতি বিদ্রূপ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য কোনো জাতির ধর্মবিশ্বাসের উপর রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কটাক্ষ করা অসম্ভব। কিন্তু ধর্মের নামে যেখানে অবিচার করা হয় সেখানে তিনি স্থির থাকিতে পারেন না। গোঁড়ামিমাত্রকেই তিনি ঘৃণা করিয়া গিয়াছেন।

দুর্বলতার প্রতি তাঁহার করুণা থাকিলেও অক্ষমের 'বীরত্ব' তাঁহার পক্ষে দুঃসহ ছিল। 'ধর্মপ্রচার' কবিতায় আছে সেই 'বীরত্বে'র প্রতি বিষোদ্গার।

দেশের লোককে তাঁহার ভয় ছিল, তিনি জানিতেন মনুষ্যজাতির প্রতি তাঁহার যে ইঙ্গিত, দেশের লোক তাহাকে সুবিধামত হিন্দুজাতির নামে লাগাইয়া লইতে পারে। যাহা নিন্দার্হ তাহা সকলের ক্ষেত্রেই নিন্দার্হ। হিন্দুর ছেলে যদি হিন্দুধর্মের বালাই লইয়া পাদরি খুন করে তাহা হিন্দুর পক্ষে গৌরবের

নয়। তিনি বিদ্রূপের বাণ হানিয়া তাহাই আমাদের মনে দাগিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন।

কবিতার বর্ণিত ঘটনাটি সত্য না হইলেও কোনো ক্ষতি হইত না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এমনতর করুণ ঘটনা কল্পনাও করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ দেশবাসীর ভুল বোঝার আশঙ্কা তো আছেই। ওই কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

ওই শোনো ভাই বিশু
পথে শুনি 'জয় যিশু'।
কেমনে এ নাম করিব সহ্য
আমরা আর্যশিশু।
ওঠো ওঠো ভাই জাগো
মনে মনে খুব রাগো।
আর্য শাস্ত্র উদ্ধার করি
কোমর বাঁধিয়া লাগো।

তাহার পর বাঙ্গালীবীর কেমন করিয়া পাদ্রি বেটার পা মাড়াইয়া, তাহাকে গালি দিয়া, ছুয়ো দিয়া, টুপি কাড়িয়া লইবেন, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। পাদ্রি যদি তাহাতেও অবিচলিত থাকে,

কিছু না বলিলে পড়িব তখন
বিশ পঁচিশ বাঙ্গালী।

এই 'বাঙ্গালী' হইতেই বুঝিতে পারি যে এ কবিতার মূলে বেদনা থাকিলেও বিদ্বেষ নাই। সমস্ত বাঙ্গালী জাতির দীনতা দুর্বলতা তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছে। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি হইতে এই ধরণের ব্যঙ্গ কবিতার উদ্ভব তাঁহার হাত দিয়া হয় নাই।

'পরশুরামের' রচিত চরিত্রগুলির কথা এই প্রসঙ্গে ভাবিয়া দেখুন। তাহাদের কোন্‌টিকে আমরা জানি না? প্রত্যেকটিই তো আমাদের পরিচিত।

ব্যঙ্গের মধ্যেও যদি বিশুদ্ধি থাকে তো সে নৈর্ব্যক্তিকতায়। ব্যক্তিকে অতিক্রম করিতে পারিলে তবেই হাস্যরস নির্মল হইয়া উঠে।

হিং টিং ছটের অনুরূপ আর একটি ব্যঙ্গ কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। কবিতার নাম 'বুঝিয়ে বলা', লেখক সুকুমার রায়।

"বলছিলাম কি বস্তুপিণ্ড সূক্ষ্ম হতে স্থূলেতে,
অর্থাৎ কিনা লাগছে ঠেলা পঞ্চভূতের মূলেতে,—
গোড়ায় তবে দেখতে হবে কোত্থেকে আর কি ক'রে,
রস জমে এই প্রপঞ্চময় বিশ্বতরুর শিকড়ে।
অর্থাৎ কিনা, এই মনে কর্ রোদ পড়েছে ঘাসেতে,
এই মনে কর্, চাঁদের আলো পড়্‌ল তারি পাশেতে।

সুকুমার রায় মহাশয়ের সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সহিত কাহারও তর্কযুদ্ধ হয় নাই, হইলে লোকে মনে করিত সুকুমারবাবু নিশ্চয় তাঁহাকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। অবশ্য এই ধরণের সন্দেহ লেখকের কৃতিত্বই প্রদর্শন করিয়া থাকে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে হাস্যরস

"তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) ব্যঙ্গাত্মক রচনাগুলির মধ্যে অন্যতম গ্রন্থ শেষের কবিতা।" ইহা অতি আধুনিক সমাজকে বিদ্রূপ করে লেখা। wit ও humour বইখানির মধ্যে সমভাবে আছে।" রবীন্দ্র সাহিত্যের হাস্যরসের আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক লেখক এই মন্তব্য করিয়াছেন। উক্ত লেখক রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সের লেখা ব্যঙ্গ কবিতার প্রশংসা করিতে গিয়া যে কবিতাটির উল্লেখ করিয়াছেন "সেটি হচ্ছে তাঁর 'পরকালের সাধ'।

এবার মরে সাহেব হব মা,
　　　　এবার মরে সাহেব হব।
রাঙা চুলে হ্যাট বসিয়ে মা,
　　　　পোড়া নেটীভ নাম ঘুচাব।
সাদা হাতে হাত দিয়ে মা,
　　　　বাগানে বেড়াতে যাব,
আর কালো মুখ দেখলে পরে
　　　　ব্ল্যাকি বলে মুখ ফিরাব।" [১]

লেখক যে পুস্তক হইতে গানটি উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া অনুমান করিলাম তাহার ১১৩ পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখিলাম, স্থানে স্থানে পাঠ মিলিতেছে না। [২] অবশ্য তাহাতে গুরুতর ক্ষতি হয় নাই, কেন না এই ব্যঙ্গ-কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ লিখেন নাই। প্রমাণ, পাশ্চাত্য ভ্রমণের ভূমিকা :

"আমার বিলাতের চিঠিতে 'এবার মলে সাহেব হব' গানটি উদ্ধৃত করেছিলেম। আমার স্নেহভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গ-সাহিত্যে হাস্যরসের দৃষ্টান্তস্বরূপ ঐ গানটি আমার রচনা বলে প্রচার করেছেন। তাতে অনামা রচয়িতার মান বেঁচে গেছে, কিন্তু আমার বাঁচে নি।

---

১. শ্রীপ্রিয়লাল দাস, 'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস' উদয়াচল, শ্রা ৭, ১৩৪৮

২. চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস'

আমার বিশ্বাস যথোচিত গবেষণা করলে আমার লেখা থেকে ওর চেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতেও পারে।" ১

আমাদের বিশ্বাস গবেষণা কিছু অল্প করিলেও দৃষ্টান্তের অভাব ঘটিবে না। কিন্তু সে কথা অবান্তর। সাহিত্যে হাস্যরস বলিতে কি বুঝায় তাহার সংজ্ঞা নির্দেশ না করিয়া সমালোচকের মন্তব্য তুলিবার কারণ এই যে, সূত্র অপেক্ষা দৃষ্টান্ত বুঝিবার পক্ষে সহজ।

কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যাহা সহজ বলিয়া মনে করা যায় একটু তলাইয়া দেখিতে গেলে তাহাই আবার সর্বাপেক্ষা কঠিন বোধ হয়। সূত্রের পথ সুগম। দৃষ্টান্তের পথ অদৃষ্টের মতই অনির্দিষ্ট। সমালোচকের ব্যক্তিগত রুচি ও বুদ্ধির উপরই তাহা নির্ভর করে। আর সেই রুচি ও বুদ্ধির দিক দিয়া সমালোচকদলের মধ্যে ঐক্য কদাচিৎ দেখা যায়।

ব্যঙ্গাত্মক রচনার নিদর্শনস্বরূপে একজন নাম করিলেন 'শেষের কবিতা'র। আবার আর একজন বলিতেছেন:

"তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) রচনায় হাস্যরস প্রায় কোনো স্থানেই উচ্চাঙ্গের হয় নাই।" হাস্যরসের দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের "প্রতিভার সঙ্কীর্ণতা" প্রমাণ করিতে গিয়া লেখক 'চিরকুমার সভা'র বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সেই বিশ্লেষণের ফল এইরূপ:

"তাঁহাকে (পূর্ণকে) লইয়া বিপিন, শ্রীশ ও রসিক দাদা অনেক মজা করিয়াছে, কিন্তু এই রসিকতার কোনো বৈশিষ্ট্য নাই।"

"যে চিরকুমারদের ব্রত ভঙ্গ করিবার জন্য রমণীর দরকার হয় না, শুধু স্ত্রীলোকের গানের খাতা বা রুমাল হইলেই চলে, তাহাদের পরাজয়ে যে হাস্যরসের সঞ্চার হয় তাহা উচ্চাঙ্গের নহে।"

"শ্রীশ ও বিপিন বিবাহ করিতে রাজী হইলেও রসিকদাদা তাহাদের মনের কথা বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। ইহাতে যে হাস্যরস আছে তাহা খুবই অপকৃষ্ট।"

"নাটকের অন্যান্য যে সব পাত্র-পাত্রী আছে তাহাদের কথাবার্তা ও ব্যবহারে কোন উচ্চাঙ্গের রসিকতা নাই।"

---

১. চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরে ভ্রম স্বীকার ও সংশোধন করিয়াছেন।

"অক্ষয়, পুরবালা, শৈলবালা, নৃপবালা ও নীরবালা ইহাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি আছে প্রচুর, কিন্তু কথার মারপ্যাঁচ ছাড়া আর বিশেষ কিছুই নাই।"

"বিবাহপ্রার্থীদের (দারুকেশ্বর ও মৃত্যুঞ্জয়) মূর্খতার কোন মাধুর্য্য নাই।"

"তাঁহার (চন্দ্রবাবুর) চরিত্রও শ্রেষ্ঠ কমিক চরিত্রের সঙ্গে এক আসন পাইতে পারে না।"

এই তো গেল চিরকুমারসভার বিশ্লেষণের ফল। অন্যান্য ব্যঙ্গ-রচনা সম্বন্ধেও সমালোচকের মতামত কয়েকটি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করি :

"'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রহসনের বৈকুণ্ঠ ও অবিনাশের চরিত্রেও এই ব্যাপকতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বৈকুণ্ঠের বাতিক লেখা, অবিনাশের বাতিক বাগান করা, দ্বিতীয় বাতিক মনোরমার জন্য প্রেম। এই সকল বাতিকের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। শুধু অবিনাশের স্ত্রী-বাতিকের প্রতিক্রিয়া একটু সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল; তাহার ফলে বৈকুণ্ঠ ও তাহার মেয়েকে প্রায় ঘরছাড়া হইতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহারও কোন সত্যকার মূল ছিল না এবং ইহার মধ্যে হাস্যরসও নাই।"

'গোড়ায় গলদ' সম্বন্ধে :

"এই প্রহসনের মূল উপজীব্য চরিত্র সৃষ্টি নহে, ঘটনার সমাবেশ। গোড়াতেই বলিয়া রাখা উচিত যে এই শ্রেণীর গল্প বা নাটক কখনও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আসন পাইতে পারে না।"

"প্রহসনের মধ্যে ঘটনার যে সন্নিবেশ হইয়াছে তাহাতেও আর্টের মহিমা কিছুই নাই।"

'ব্যঙ্গ-কৌতুক' ও 'হাস্য-কৌতুক' সম্বন্ধে :

"ইহার কোনটার মধ্যেই উচ্চাঙ্গের কমেডি নাই।"

মোট কথা :

রবীন্দ্রনাথ যেন শুধু কথার মারপ্যাঁচ লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। ইহাতে হাস্যরসের সৃষ্টি হয় বটে কিন্তু তাহা অপকৃষ্ট হাস্যরস।

তাহা হইলে দেখা গেল 'শেষের কবিতা'ও ব্যঙ্গাত্মক রচনার বিশিষ্ট উদাহরণ, আবার 'চিরকুমার সভা, 'গোড়ার গলদ' 'ব্যঙ্গ-কৌতুক' প্রভৃতিও

উৎকৃষ্ট হাস্যরসবর্জ্জিত। দ্বিতীয় সমালোচকের মতে উৎকৃষ্ট হাস্যরস কথার মারপ্যাঁচের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে না। এ কথা অস্বীকার্য নয়। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যের ক্ষীরসমুদ্রে যে অজস্র রসনির্ঝরিণীর সম্মিলন ঘটিয়াছে কথার কল্লোলে তাহাদের মাধুর্য বৃদ্ধি পায় নাই একথা কেমন করিয়া বলি? কথা ছাড়া রবীন্দ্রসাহিত্যে আর কিছু আছে কিনা সে কথা পরে হইবে, কিন্তু শুধু কথাই যদি ধরি সেও তো কথার কথা হইবে না। কবিওয়ালারা কথার খেলা খেলিয়াছেন, দাশু রায় কথার খেলা খেলিয়াছেন আর সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও কথার খেলা খেলিয়াছেন বলিয়া বাতিল করিয়া দিলে চলিবে কেন?

সমালোচক বলিয়াছেন: "সাধারণতঃ গীতিকাব্য রচয়িতাদের রচনায় হাস্যরসের অবতারণা করা হয় না। গীতিকাব্যের সৃষ্টি হয় ভাবের গভীরতা হইতে। যখন কোন কবি কোন ভাবে বিভোর হইয়া অন্য সকলপ্রকার বিষয় হইতে দূরে স্বপ্নলোকে গমন করেন, তখনই তিনি গীতিকাব্য লিখিতে পারেন। তাঁহার অনুভূতি যত গভীর ও তীব্র হইবে, তাঁহার কবিতাও তত উৎকৃষ্ট হইবে। হাস্যরসিকের মাপকাঠি সাধারণ বুদ্ধি; তিনি সাধারণ বুদ্ধি দিয়া বিচার করিয়া দেখেন কোন্ জিনিস বৈচিত্র্যের সীমায় আসিয়া পৌঁছিল বা সীমা ছাড়াইয়া গেল। তাঁহার কারবার অসামঞ্জস্য পরস্পর-বিরোধিতা বা কোন কিছুর আতিশয্য লইয়া।...কবি থাকেন স্বপ্নের রাজ্যে যেখানে সাধারণ জীবনের নিয়ম খাটে না, রসিক থাকেন সর্বদা সজাগ কোথায় সাধারণ আইনের লঙ্ঘন করিয়া অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হইল। কাজেই গীতিকবিতার সঙ্গে রসিকতার বিরোধিতা আছে।"

রবীন্দ্রনাথের "রচনায় হাস্যরস প্রায় কোন স্থানেই" যে "উচ্চাঙ্গের হয় নাই" সমালোচক মহাশয়ের মতে রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিত্ব তাহার কারণ হইতে পারে।

ভাষায় শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার দেখিয়া বৈয়াকরণ ব্যাকরণ রচনা করেন। কালক্রমে সে ব্যবহার পরিবর্তিত হইলে নূতন বৈয়াকরণকে নবতর সূত্র সংযোজন করিতে হয়। প্রচলিত ছন্দের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়া যে ছন্দঃশাস্ত্র এক যুগে রচনা করা হয় কালান্তরে নূতন কবি জন্মগ্রহণ করিয়া তাহা অসম্পূর্ণ প্রমাণ করেন। শক্তি যাঁহাদের অধিক তাঁহারা বিধানের

দাসত্ব করেন না, বিধান তাঁহাদের অনুগমন করে। অসামান্য প্রতিভা সাধারণের পথ অতিক্রম করে বলিয়াই তাহা অসামান্য। এমন একদিন ছিল যখন আধুনিক ভাষায় মিল না দিলে কবিতা হইত না। যেদিন অমিল কবিতা দেখা দিল লোকে তাহাকে কবিতা বলিবে কি' না ভাবিয়া পাইল না। এখন আবার গদ্যকবিতা কবিতা কি না তাহাই চিন্তার বিষয় হইয়াছে, যেহেতু কাব্যশাস্ত্রে গদ্য কবিতার বিধান নাই।

সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা যাহার আছে সে সৃষ্টি করে—সেই ক্ষমতা যাহার অসাধারণ তাহার সৃষ্টির মধ্যে অসাধারণত্ব থাকিলে বিস্ময় উদ্রিক্ত হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু পূর্বে এরূপ ঘটে নাই বলিয়া তাহার সৃষ্টি যে সৃষ্টি নয় এরূপ প্রমাণ করিতে যাওয়ায় বিপদ আছে। "সাধারণতঃ গীতিকাব্য রচয়িতাদের রচনায় হাস্যরসের অবতারণা করা হয় না।" রবীন্দ্রনাথকে "সাধারণতঃ"-র দলের ফেলিবার জন্য বদ্ধপরিকর না হইলে সুস্পষ্টরূপে দেখা যাইত তাঁহার রচনায় হাস্যরস প্রচুরপরিমাণে বিদ্যমান। লিরিক কবি যদি শব্দতত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার শক্তি রাখেন, জমিদারি তদারকে অপটু না হন, স্বজাতির উন্নতিবিধানে মনোযোগ দেন, সর্বোপরি ইস্কুলমাস্টারিও করিতে পারেন তবে হাস্যরসিক হইতে বাধা কোথায়? দেশী বিলাতী এমন কোনো শাস্ত্র আছে কি যেখানে গীতিকবিতা রচনা এবং ইস্কুলমাস্টারির মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের কল্পনা আছে?

'চিরকুমার সভা'র বিপিনের মুখে কবির এই উক্তিটি স্মরণযোগ্য: "সংসারের শ্রেষ্ঠ জিনিসমাত্রেই নিজের নিয়ম নিজে সৃষ্টি করে; ক্ষমতাশালী লেখক নিজের নিয়মে চলে, শ্রেষ্ঠ কাব্য সমালোচকের নিয়ম মানে না।"

রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস শুধু শব্দাশ্রয়ী ইহা যদি স্বীকার করিয়াও লই, তথাপি বলিতে হইবে তাঁহার শব্দালংকার ভাষালক্ষ্মীর অঙ্গে এমন পরিপাটিরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে তাহার অলংকৃতিটাকে পৃথক্ করিয়া দেখা যায় না। অঙ্গ ও অলঙ্কারে মিলিয়া যে একটি অখণ্ড সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে স্বতন্ত্রভাবে দেখিবার উপায় নাই। শব্দ কোথাও সগর্বে স্বীয় সত্তা প্রচার করে না।

শৈল। মুখুজ্যেমশায়, এইবার তোমার ছোট দুটি শ্যালীকে রক্ষা কর।

অক্ষয়। যদি অরক্ষণীয়া হয়ে থাকেন তো আমি আছি।

... ...

নৃপ। আঃ কি বর বর করছিস। দেখ তো ভাই মেজদিদি।

অক্ষয়। ওকে ওই জন্যেই তো বর্বরা নাম দিয়েছি। অয়ি বর্বরে, ভগবান তোমাদের কটি সহোদরা.ক এই একটি অক্ষয় বর দিয়ে রেখেছেন, তবু তৃপ্তি নেই ?

... ...

বনমালী। কুমারটুলির নীলমাধব চৌধুরীমশায়ের দুটি পরমাসুন্দরী কন্যা আছে। তাঁদের বিবাহযোগ্য বয়স হয়েছে।

শ্রীশ। হয়েছে তো হয়েছে, আমাদের সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কী ?

বনমালী। সম্বন্ধ তো আপনারা একটু মনোযোগ করলেই হতে পারে। সে আর শক্ত কী ? আমি সমস্তই ঠিক করে দেব।

বিপিন। আপনার এত দয়া অপাত্রে অপব্যয় করছেন।

বনমালী। অপাত্র। বিলক্ষণ। আপনাদের মতো সৎপাত্র পাব কোথায় ? আপনাদের বিনয়গুণে আরো মুগ্ধ হলেম।

শ্রীশ। এই মুগ্ধভাব যদি রাখতে চান তাহলে এই বেলা সরে পড়ুন। বিনয়গুণে অধিক টান সয় না।

... ...

শৈল। আমরা তোমার সব শালীরা মিলে তোমাকে শালীবাহন রাজা খেতাব দেব।

... ...

পুরবালা। তুমি আর তোমার মুখুজ্যেমশায়ে মিলে কদিন ধরে যে রকম পরামর্শ চলছে একটা কী কাণ্ড হবেই।

অক্ষয়। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড তো আজ হয়ে গেল।

রসিক। লঙ্কাকাণ্ডের আয়োজনও হচ্ছে। চিরকুমার সভার স্বর্ণলঙ্কায় আগুন লাগাতে চলেছি।

... ...

শৈল। আমি যে সভ্য হব।

পুরবালা। কী বলিস তার ঠিক নেই। মেয়েমানুষ আবার সভ্য হবে কী?

শৈল। আজকাল মেয়েরাও যে সভ্য হয়ে উঠেছে!

… …

রসিক। কোপো যত্র ভ্রূকুটি রচনা ।

শৈল। রসিকদাদা তুমি তো দিব্যি শ্লোক আউড়ে চলেছ—কোপ জিনিসটা কী, তা মুখুজ্যেমশায় টের পাবেন।

রসিক। আরে ভাই বদল করতে রাজি আছি। মুখুজ্যেমশায় যদি শ্লোক আওড়াতেন আর আমার উপরেই যদি কোপ পড়ত তাহলে এই পোড়া কপালকে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখতুম।

… . …

অক্ষয়। আরে দিদির হস্ত তো জোগাড় করেইছি, নইলে পাণিগ্রহণ কী জন্য?

… .. …

অক্ষয়। মশায় ভয় পাবেন না এবং অমন ভ্রূকুটি করে আমাকেও ভয় দেখাবেন না—আমি অভূতপূর্ব নই, এমন কী আমি আপনাদেরই ভূতপূর্ব ।

পূর্ণ। মশায়, অভূতপূর্বর চেয়ে ভূতপূর্বকেই বেশি ভয় হয়।

অক্ষয়। … সংসারে ভূতের ভয়টাই প্রচলিত। নিজে যে ব্যক্তি ভূত অন্য লোকের জীবনসম্ভোগটা তার কাছে বাঞ্ছনীয় হতে পারেই না। এই মনে করে মানুষ ভূতকে ভয়ংকর কল্পনা করে। অতএব সভাপতি মশায় চিরকুমার সভার ভূতটিকে সভা থেকে ছাড়াবেন না…!

… . …

পুরবালা। অবাক করলি। লজ্জা করছে না?

শৈল। দিদি লজ্জা যে স্ত্রীলোকের ভূষণ—পুরুষের বেশ ধরতে গেলেই সেটা পরিত্যাগ করতে হয়।

... ...

পুরবালা। এই বেশে তুই কুমার সভার সভ্য হতে যাচ্ছিস ?

শৈল। অন্য বেশে হতে গেলে যে ব্যাকরণের দোষ হয় দিদি। কী বল রসিক দাদা!

রসিক। তা তো বটেই ব্যাকরণ বাঁচিয়ে তো চলতেই হবে। ভগবান পাণিনি বোপদেব এঁরা কী জন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন ? কিন্তু ভাই শ্রীমতী শৈলবালার উপর চাপকান প্রত্যয় করলেই কি ব্যাকরণ রক্ষে হয় ?

অক্ষয়। নতুন মুগ্ধবোধে তাই লেখে। আমি লিখে পড়ে দিতে পারি, চিরকুমার সভার মুগ্ধদের কাছে শৈল যেমন প্রত্যয় করাবে তাঁরা তেমনি প্রত্যয় যাবেন। কুমারদের ধাতু আমি জানি কি না।

... ...

শ্রীশ। এই দেখো না (কোণের একটা টিপাই হইতে গোটা দুয়েক চুলের কাঁটা তুলিয়া দেখাইল)।

বিপিন। ওহে ভাই, এ স্থানটা তো কুমারদের পক্ষে নিষ্কণ্টক নয়।

... ...

অক্ষয়। একেই বলে ভগ্নীপতিব্রতা শালী।

... ...

রসিক। মধুরেণ সমাপয়েৎ।

শ্রীশ। কিন্তু সমাপনটা তো মধুর নয়।

... ...

বিপিন। যেটা পাতে পড়ে আছে, ওটা তৃতীয় কিস্তি।

শ্রীশ। ওটা না পড়ে থাকলে আমাদেরই পড়ে থাকতে হত।

... ...

হাস্যরসের মধ্যে যাহা একান্ত ভাবে শব্দাশ্রয়ী, শুধু সেইরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্তই উপরে উদ্ধৃত করা গেল। স্বীকার করি 'রেশমী রুমাল' অথবা 'আলিবাবা' যে সম্প্রদায়ের পাঠক ও দর্শকদের মনে আনন্দ সঞ্চার করে

'চিরকুমার সভা'র শব্দালঙ্কার তাঁহাদের মনে রেখাপাত করিতে পারিবে না। 'চিরকুমার সভা' সর্বসাধারণের প্রহসন নহে। সাধারণ থিয়েটার দর্শকের পক্ষে ইহার রসোপলব্ধি দুষ্কর, 'আলিবাবা ফতেমা' শুনিয়া যাহারা উচ্চহাস্য করে চিরকুমার সভা তাহাদের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে না। আলিবাবা নাটকে ফতেমাকে 'আলি বাবা' (বাবা শব্দের উপর জোর দিয়া) এবং আলিবাবাকে 'ফতে মা' (মা শব্দের উপর জোর দিয়া) ডাকিতে শুনিয়াছি। সম্ভবতঃ প্রয়োগশিল্পী দর্শকগণের মনে এই ভাবে হাস্যরস সঞ্চারের চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রসাহিত্যের শব্দাশ্রয়ী হাস্যরসের যদি কোনো দোষ থাকে তো তাহা এই যে, মার্জিতরুচি শিক্ষিত সম্প্রদায় ভিন্ন সে রস উপভোগ করিতে পারে না। সাধারণ রঙ্গালয়ে এ ধরণের হাস্যরস অকেজো হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় নাট্যশালার 'মূর্খ'দের জন্য এ রস সৃষ্টি করেন নাই। তাহাদের 'ধাতু' তিনি বিশেষ রূপেই জানিতেন। তবে হীরার ধার নষ্ট হইল বলিয়া আক্ষেপ করিব কেন? মেষশৃঙ্গ তো হীরার ধার পরীক্ষা করিবার ক্ষেত্র নহে।

রবীন্দ্র সাহিত্যের হাস্যরসে wit-এর বাহুল্য এবং humour-এর অভাব—এইরূপ অভিযোগ করা হইয়াছে। যে সমালোচক গীতিকবিতার সহিত হাস্যরসের স্বাভাবিক বিরোধিতার উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রসাহিত্যে উৎকৃষ্ট হাস্যরসের অভাব লক্ষ্য করিয়াছেন তিনিও wit-এর প্রাচুর্য সম্বন্ধে সন্দেহ করেন নাই। উৎকৃষ্ট হাস্যরস বলিতে তিনি humour বুঝেন। সকলেই তাহা স্বীকার করে।...

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে হাস্যরসকে এভাবে ব্যবচ্ছিন্ন করিয়া দেখা হয় নাই। সাহিত্যদর্পণকার হাস্যরসের সংজ্ঞা দিয়াছেন:

বিকৃতাকারবাগ্‌বেশ চেষ্টাদেঃ কুহকাদ্ ভবেৎ।
হাসঃ ·· ॥

ইউরোপীয় আলংকারিকগণ এই রসের সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কিন্তু মূলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে অমিল নাই।

হাস্যরসের প্রধান অবলম্বন হইল অসংগতি। যাহার মধ্যে বৈসাদৃশ্য বা বৈচিত্র্য নাই, যাহা যটা উচিত বলিয়া নিত্য ঘটে, যাহার সুসংগতি ও স্বাভাবিকতা বুদ্ধিকে কিছুমাত্র বিচলিত করে না তাহা হাস্যরসের বিষয় নহে। বিকৃত আকার, বিকৃত বাক্য বেশ, বিকৃত চেষ্টা প্রভৃতির দ্বারা নট যে রসের সৃষ্টি করেন তাহাই ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে হাস্যরসের অবলম্বন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই স্থলে উল্লিখিত সংস্কৃত শ্লোকে আর একটি পাঠান্তর লক্ষ্য করিবার বিষয়। 'কুহকাৎ' স্থলে 'কুতুকাৎ' পাঠও দেখা যায়। তাহাতে অর্থ হয়, বিকৃত আকার প্রভৃতির দ্বারা যে কৌতুক উৎপন্ন হয় তাহাই হাস্যরস। বস্তুত হাস্যরসের সহিত কৌতুকের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।

'সাধারণ ভাবে সুখের সহিত আমোদের একটা প্রভেদ আছে। নিয়মভঙ্গে যে একটু পীড়া আছে সেই পীড়াটুকু না থাকিলে আমোদ হইতে পারে না।··· কৌতুকের মধ্যেও নিয়মভঙ্গজনিত একটা পীড়া আছে; সেই পীড়াটা অনতিঅধিক মাত্রায় না গেলে আমাদের মনে যে একটা সুখকর উত্তেজনার উদ্রেক করে সেই আকস্মিক উত্তেজনার আঘাতে আমরা হাসিয়া উঠি।'[১]

বিরোধ বৈষম্য অসংগতি আকস্মিকতা অর্থাৎ যাহা কিছু কৌতুকজনক তাহাই হাস্যকর। এ বিষয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও একমত।[২]

যাহা স্বাভাবিক ও সংগত তাহার সহিত অস্বাভাবিক ও অসংগত-র যে বিরোধ তাহাই হাস্যরসের মূল কারণ।[৩] সে হাস্যরস শব্দগতই হউক বা অর্থগতই হউক বা চরিত্রগতই হউক।

কি wit কি humour কি ব্যঙ্গ কি বিদ্রূপ—হাস্যরসের যে কোনো শ্রেণীতেই

---

১. কৌতুকহাস্যের মাত্রা। পঞ্চভূত

২. Comic effect implies contradiction . and incongruity excites laughter —Bergson

Laughter is the result of an expectation, which, of a sudden ends in nothing.—Kant

৩. Humour thus grew to turn on a contrast between the thing as it is, or ought to be, and the thing smashed out of shape and as it ought not to be.—Stephen Leacock

—এই সংগতি অসংগতির বিরোধটাই হইল মুখ্য কথা। wit-এর মধ্যে যে হাস্যরস তাহা তীব্রোজ্জ্বল বিদ্যুৎশিখার মত চকিত আলোকে বুদ্ধিকে বিচলিত উত্তেজিত করিয়া তুলে। সেই আকস্মিক উত্তেজনায় একপ্রকার দুঃখাবহ সুখের উদয় হয়। এই সুখ হাস্যরসের কারণ।

humour এবং wit-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিবার পূর্বে বলা আবশ্যক যে humour শব্দটি বড় ব্যাপক। বাঙ্গালায় ইহাকে এক কথায় হাস্যরস বলা যায়। কিন্তু wit-এর সহিত তুলনা করিবার সময় ইহার অর্থ কিছু সংকীর্ণ হইয়া যায়। সে ক্ষেত্রে humour কে উচ্চস্তরের humour বলা যায়। এই যে humour ইহা wit-এর ন্যায় বুদ্ধিকে তৃপ্ত করিয়া ক্ষান্ত হয় না, সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়কেও প্রীত করে। বাহ্যিক বিদ্বেষের আবরণে ইহা অন্তরের সমবেদনাই প্রকাশ করে। মানুষের চরিত্র, মানুষের প্রাত্যহিক জীবন, মানুষের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অসামঞ্জস্য কতই আছে।[১] সে অসামঞ্জস্য দেখিয়া কেহ তিরস্কার করে, কেহ ধর্মোপদেশ দেয়, আবার কেহ বা সস্নেহে একটু পরিহাস করে। উচ্চদরের humour এই সস্নেহ পরিহাস।

শব্দাশ্রয়ী হাস্যরসের সহিত, শব্দশ্লেষ অর্থশ্লেষ কৌতুক কৌতূহলের সহিত যে প্রশস্ত হাস্যরসের সম্বন্ধ নাই তাহা নয়। wit প্রভৃতি প্রথমোক্ত শ্রেণীর হাস্যরস মহত্তর হাস্যরসের সোপান। অনেক ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর হাস্যরস উন্নততর হাস্যরসের অঙ্গমাত্র—বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ—বাক্য ও অর্থের ন্যায় পরস্পর সংযুক্ত।

রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস এইরূপ। বাক্‌চাতুর্য আছে কিন্তু তাহা অর্থকে সার্থক করিবার জন্যই। বাক্য ভাবকে অতিক্রম না করিয়া ভাবকে সমৃদ্ধ ও সফল করিয়া তুলিয়াছে। কথা আছে কিন্তু তাহা সুরকে আচ্ছন্ন করিবার জন্য নহে, বহন করিবার জন্য।

শেক্‌স্‌পীয়র সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক বলিয়াছেন :

His humour, it is true, is everywhere, even the grimmest and wildest tragedies cannot keep it out, but if we are to

---

১. It reaches its real ground when it becomes the humour of situation and character.—Stephen Leacock.

look at it more closely, we must restrict ourselves to the broadly comic scenes and characters. [১]

রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও এই কথাটি খাটে। 'শেষের কবিতা' তাঁহার "ব্যঙ্গাত্মক রচনা"র একটি বিশিষ্ট নিদর্শন হইতে পারে এবং "wit ও humour বইখানির মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান আছে" বলিলে প্রতিবাদ না ও করিতে পারি, কিন্তু এতদূর যাইব কেন? হাতের কাছে স্রোতস্বিনী থাকিতে পাহুপাদপের সন্ধান করার প্রয়োজন কি? সুতরাং "চিরকুমার সভা" দিয়াই আলোচনা শুরু করা যাক।

'চিরকুমার সভা'র মূল তত্ত্ব লইয়া গুরুগম্ভীর গ্রন্থ রচনা করা চলে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' তাহার দৃষ্টান্ত।

"...কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে গিয়াছিল। অনন্ত যেন সব কিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল—ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি।"[২]

এই ভাবটাই 'মুক্তি' কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে:

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর সন্ন্যাসী একদিন এই মুক্তির স্বাদ পাইয়া বাঁচিয়াছিল:

"যাক্, রসাতলে যাক্ সন্ন্যাসীর ব্রত।
দূর কর, ভেঙে ফেল দণ্ড কমণ্ডলু!
পাষাণ সংকল্পভার দিয়ে বিসর্জন
আনন্দে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি একবার।" [৩]

---

১ English Humour, Priestly.

২. জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ

৩. 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'

'চিরকুমার সভা'র সন্ন্যাসীরাও প্রকৃতির সহিত বিরোধ করিয়াছিল। তবে তাহাদের এবং তাহাদের গুরুর বৈরাগ্য সাধনের উদ্দেশ্য ছিল দেশ-সেবা, নির্বাণলাভ নহে। এই পার্থক্য। উদ্দেশ্যটা এ ক্ষেত্রে গৌণ। উপায়টাই মুখ্য এবং উপায়টা যে উপায় নয় তাহাই উজ্জ্বলে মধুরে চিত্রিত করা হইয়াছে।

প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে জয়লাভের সম্ভাবনা নাই। প্রতিপক্ষের দুর্বলতায় সেই অসম্ভাব্যতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। একজন শীর্ণদেহ ক্ষীণজীবী লোক যদি তাল ঠুকিয়া ব্যায়ামপুষ্ট বৃহৎকায় পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করিতে যায়—তাহা হইলে কৌতুকের কারণ ঘটে। শ্রীশ বিপিন ও পূর্ণর 'চিরকুমার সভা'র সভ্য হওয়ায় সেই কারণের উদ্ভব হইয়াছে। সমালোচক মহাশয় বলিয়াছেন :

"যে চিরকুমারদের ব্রতভঙ্গ করিবার জন্য রমণীর দরকার হয় না, শুধু স্ত্রীলোকের গানের খাতা বা রুমাল হইলেই চলে, তাহাদের পরাজয়ে যে হাস্যরসের সঞ্চার হয় তাহা উচ্চাঙ্গের নহে।" পুরাণে অপ্সরাদের দ্বারা মুনিঋষির তপোভঙ্গের বৃত্তান্ত পাঠ করা যায় কিন্তু তাহাতে হাস্যরসের—অপকৃষ্ট হাস্যরসেরও— সঞ্চার হয় বলিয়া তো জানি না। বলবানের সহিত বলবানের যে বিরোধ, সমানে সমানে যে দ্বন্দ্ব, তাহার মধ্যে অসংগতি কোথায় ?

মনসামঙ্গলের চাঁদসদাগর সারা জীবন ধরিয়া মনসার সঙ্গে বিরুদ্ধতা করিয়া শেষ পর্যন্ত যখন তাঁহার পায়ে ফুল দিতে বাধ্য হইলেন তখন হাসি পায়, না বেদনাবোধ হয় ?

উৎকৃষ্ট হাস্যরসের মধ্যে যে আনন্দ তাহা বেদনাবিনির্মুক্ত নয় সত্য, কিন্তু সে বেদনার মাত্রা অল্প। যে বেদনায় হাসি পায়, মাত্রা বাড়াইতে থাকিলে তাহাই একসময়ে নয়নে অশ্রুসঞ্চার করে। চাঁদসদাগরের পরাজয়ে—সমবলের সহিত সমবলের বিবাদে অন্তরের পরাজয়ে—বেদনার মাত্রা অধিক ! চাঁদসদাগরের পরাজয় কৌতুকের নহে তাহা করুণার বিষয়। শ্রীশ বিপিনের পরাজয় তাহার বিপরীত বলিয়াই তাহা সকরুণ না হইয়া সকৌতুক হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠ হাস্যরস যে রসে "laughter and tears become one" সে রস 'চিরকুমার সভা'য় কোথায় ?

প্রথমত পরাজয় জিনিসটাই করুণ। প্রবৃত্তির কাছে principle-এর

পরাজয়—করুণার বিষয় সন্দেহ নাই। চিত্রাঙ্গদার কাছে ব্রহ্মচর্যব্রতধারী অর্জুনের সত্যভঙ্গে যে সকরুণতা আছে চিরকুমার সভার সভ্যদের ব্রত ভঙ্গেও তাহাই প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান; তবে প্রথমটার মধ্যে গাম্ভীর্যের কারণ এই যে, সেখানে সমানে সমানে লড়াই। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে অসমানে অসমানে সঙ্ঘর্ষ। হাস্য ও করুণ উভয় রস এখানে অবিচ্ছিন্ন হইয়া নূতনতর রূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

'চিরকুমার সভা'র সভ্যদের পরাজয় অপেক্ষা সভাপতির যে পরাভব তাহারই মধ্যে আঘাতের পরিমাণ অধিক। humourএর উৎকর্ষ এই খানেই বিশেষভাবে অনুভব করি। সযত্নপোষিত বহুদিনের মতটিকে পরিহার করার মধ্যে তাঁহার দৃঢ়নিষ্ঠার অভাব লক্ষ্য করা হইয়াছে এবং এই নিষ্ঠার অভাবই নাকি তাঁহার চরিত্রকে শ্রেষ্ঠ কমিক চরিত্র হইতে দেয় নাই। তবে কি নিষ্ঠা রক্ষা করিবার জন্য আত্মহত্যা করিলেই চন্দ্রবাবুর চরিত্র "শ্রেষ্ঠ কমিক চরিত্রের সঙ্গে এক আসন পাইতে" পারিত?

'চিরকুমার সভা' সর্বতোভাবে কমেডি। এমন কি 'বৈকুণ্ঠের খাতা'ও সে হিসাবে ট্রাজেডি। বৈকুণ্ঠের লেখা ছাড়িয়া দেওয়ায় পাঠকের মনে আমোদ হয় না বরং বিষাদই দেখা দেয়। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার লেখা লইয়া লোকে হাস্য পরিহাস করে:

"আমার লেখা! সে আবার একটা জিনিস! সবাই হাসে আমি কি তা জানি নে ঈশেন? ওসব বইল পড়ে। সংসারে লেখায় কারো কোনো দরকার নেই।"

বৈকুণ্ঠ তাঁহার বাতিক সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহার খেয়াল লইয়া লোকে হাস্য পরিহাস করে। কিন্তু চন্দ্রবাবু শেষ পর্যন্ত সে বিষয়ে অন্ধ। বাহিরের জগতে যেমন তিনি নিতান্ত নিকটের বস্তু ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পান না অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেও তেমনি। 'চিরকুমার সভা'র সভাপতি রীতিমত সভাস্থলে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া, সম্ভবত সভ্যদের ভোট লইয়া, চিকুমারব্রত উঠাইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। এদিকে ব্রত যে উঠিয়া গিয়াছে সে দিকে তাঁহার খেয়ালমাত্র নাই। যে ব্রত প্রস্তাবের অপেক্ষা না করিয়াই অন্তর্ধান করিয়াছে তাহাকে উঠাইবার জন্য

সভ্যদের সহিত তুমুল তর্ক করিয়া শেষ পর্যন্ত যখন বুঝিলেন "তাহলে কুমারব্রত উঠিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করাই বাহুল্য" তখনও তাঁহাকে হতাশ হইতে দেখি না। তাঁহার দৃষ্টিতে সভার ব্রত গেলেও সভাটি অক্ষুণ্ণ রহিল, বরং নূতন নিয়মে সভার সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল।

কমেডির অনুরোধে চন্দ্রবাবুর মত পরিবর্তন আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার চরিত্র পর্যবেক্ষণ করিলে বেশ বুঝা যায় নাটকের অনুরোধে চরিত্রের বা চরিত্রের অনুরোধে নাটকের সৌষ্ঠব কোথাও ব্যাহত করা হয় নাই।

আর যে মত পরিবর্তনের কথা বলা হইতেছে তাহাই বা কিরূপ? তিনি "অম্লানবদনে" সভার নিয়ম শিথিল করিয়া দিলেন। কিন্তু কৌতুক যে এইখানেই। 'চিরকুমার সভা'টি ঠিকই রহিল শুধু সভার নিয়মাবলী হইতে কৌমার্যরক্ষার নিয়মটি মাত্র তুলিয়া দেওয়া হইল।

চন্দ্রবাবু সংসারানভিজ্ঞ লোক। তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু সেই উদ্দেশ্যসাধনের উপায়গুলি ব্যবহারিক জগতে অচল। "মাতৃভূমির উন্নতির জন্য ক্রমাগতই নানা মতলব তাঁহার মাথায় আসিতেছে।" "বিষয়কর্মে চন্দ্রবাবুর মত অপটু কেহ নাই কিন্তু তাঁহার মনের খেয়াল বাণিজ্যের দিকে।" তিনি ভারতবর্ষের দারিদ্র্যমোচনকেই সভার প্রথম কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে দারিদ্র্যমোচনের "আশু উপায় বাণিজ্য" এবং সেই বাণিজ্যের সূত্রপাত করিবার জন্য তিনি প্রস্তাব করিয়া বসিলেন:

"মনে কর আমরা সকলেই যদি দিয়াশলাই সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করি। এমন যদি একটা কাঠি বের করতে পারি যা সহজে জ্বলে, শীঘ্র নেবে না এবং দেশের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহলে দেশে সস্তা দেশলাই নির্মাণের কোনো বাধা থাকে না।" এই প্রসঙ্গে জাপানে ও য়ুরোপে কত দিয়াশলাই প্রস্তুত হয়, কি ভাবে প্রস্তুত হয়, তাহারা কি কাঠ এবং কি কি দাহ্যবস্তু ব্যবহার করে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিলেন।

তাহার পরে শ্রীশের বাসায় অকস্মাৎ সবেগে প্রবেশপূর্বক অর্ধঘণ্টাকালযাবৎ যে বক্তৃতা করিলেন—শ্রীশের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও বসিবার সময় এবং বিলম্ব হইয়া গিয়াছে বলিয়া পূর্ণবাবুর কথায় কর্ণপাত করার অবসর পাইলেন না—সেই বক্তৃতার কথা মনে করুন। ডাক্তারি শিক্ষার প্রয়োজন, আইনশাস্ত্র

অধ্যয়নের আবশ্যকতা, গোরুর গাড়ি ঢেঁকি তাঁত প্রভৃতি সংশোধনের চেষ্টা, চিরকুমার সভা বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িলে তাহাকে দুইটি বিভাগে বিভক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা, ঐতিহাসিক জনশ্রুতি পুরাতন শিলালিপি তাম্রশাসন আদির পুনরুদ্ধার প্রভৃতি সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতার পর দ্রুতবেগের প্রস্থানের দৃশ্যে যে চন্দ্রবাবুকে দেখিতে পাই তাঁহার চরিত্রাঙ্কনে নাট্যকার humourএর সৃষ্টি করেন নাই? শ্রীশের উক্তিতে চন্দ্রবাবুর দেশোদ্ধারের আগ্রহ সম্বন্ধে আরও নূতন তথ্য পাওয়া যায়:

"কিন্তু তিনি তাঁর দেশলাইয়ের কাঠি ছাড়েননি তিনি বলেন সন্ন্যাসীরা কৃষিতত্ত্ব বস্তুতত্ত্ব প্রভৃতি শিখে গ্রামে গ্রামে চাষাদের শিখিয়ে বেড়াবে—এক টাকা করে শেয়ার নিয়ে একটা ব্যাঙ্ক খুলে বড় বড় পল্লীতে নূতন নিয়মে এক একটা দোকান বসিয়ে আসবে—ভারতবর্ষের চারদিকে বাণিজ্যের জাল বিস্তার করে দেবে।"

অন্য চরিত্রের কথা যাহাই হউক কিন্তু চন্দ্রবাবুর কথায় witএর কোনো স্থান নাই, শব্দেরও মারপ্যাঁচ নাই। লেখক সেই humour সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে বিদ্রূপ থাকিলেও অসূয়া নাই, যাহা আঘাত করিতে গিয়া প্রশ্রয় দিয়া বসে।

চন্দ্রবাবু বাতিকগ্রস্ত মানুষ। কিন্তু "তিনি কুমারীকে কুমারসভার সভ্য করিয়াছেন এবং অম্লানবদনে বিবাহকে চিরকুমার সভার principle করিয়া লইয়াছেন।" এবং সমালোচক মহাশয়ের মতে "সত্যিকার বাতিকগ্রস্ত লোকের ইহা লক্ষণ নয়।" ঠিক কি কি লক্ষণ থাকিলে খাঁটি বাতিকগ্রস্ত লোক বলা যায় তাহা জানি না, কিন্তু বাতিকের রূপ কি বাঁধাধরা হইতেই হইবে? আর সেই বাতিক সম্পূর্ণ নীরন্ধ্র না হইলেই হাস্যরস নির্দোষ হইবে না? উৎকৃষ্ট হাস্যরসের কি উহাই সর্বপ্রধান মানদণ্ড?

বাঙ্গালায় রসিক লোক বলিলে যাহা বুঝায় রসিক দাদা সত্যসত্যই সেইরূপ রসিক। অক্ষয় যে তাঁহাকে "সার্থকনামা" বলিয়াছেন সে কথা সত্য। কিন্তু তিনি যে পিতৃসত্য রক্ষা করিবার জন্যই রসিকতা করেন ইহা কেহ স্বীকার করিবে না। তবে এই কথাটির মধ্যেই রসিকতা আছে। যত্নের দ্বারা চেষ্টার দ্বারা আর যাহাই আয়ত্ত হউক না কেন, রসিকতা নয়। "লেজ" এবং

"কবিত্বের" মত রসিকতাও প্রকৃতির মধ্যে না থাকিলে কেহ টানিয়া বাহির করিতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব সুপরিস্ফুট। কবিতায় তাহার অজস্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। আলোচ্য নাটকেও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব প্রচুর আছে।

রসিকদাদার চরিত্র আলোচনা করিতে গেলেই সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রোক্ত শৃঙ্গারসহায়গণের কথা মনে পড়ে।

শৃঙ্গারস্তসহায়া বিটচেটবিদূষকাদ্যাঃ স্যুঃ।
ভক্তানর্মাসুনিপুণাঃ কুপিতবধূ-মানভঞ্জনাঃ শুদ্ধাঃ॥ [১]

এই শৃঙ্গারসহায়দের সাধারণ গুণ হইল এই,—ইহারা নায়কের অনুরক্ত, পরিহাসরসিক এবং শুদ্ধচরিত্র।

ইহাদের মধ্যেও আবার গুণভেদে শ্রেণীবিভাগ আছে। যাহারা সম্ভোগের দ্বারা দরিদ্র, চতুর, কলাবিদ্যাতেও কিছু কিছু দক্ষ, সুবক্তা, মনোরঞ্জনকুশলী এবং গোষ্ঠীতে সর্বজনপ্রিয় তাহাদের নাম বিট।

সম্ভোগহীনসম্পদ্ বিটস্তু ধূর্তঃ কলৈকদেশজ্ঞঃ।
বেশোপচারকুশলো বাগ্মী মধুরোঽথ বহুমতো গোষ্ঠ্যাম্॥ [২]

আর এক শ্রেণীর শৃঙ্গারসহায় হইল বিদূষক।

কুসুমবসন্তাভিধঃ কর্মবপুর্বেশভাষাদ্যৈঃ।
হাস্যকরঃ কলহরতির্বিদূষকঃস্যাৎ স্বকর্মজ্ঞঃ। [৩]

পুষ্প বসন্ত প্রভৃতির নামে তাহার নাম হইবে, সে কর্ম বপু বেশ ভাষা প্রভৃতির দ্বারা হাস্যোৎপাদন করিবে, কলহপ্রিয় এবং ভোজনে পটু হইবে।

বিট বিদূষকের অনেকগুলি গুণ লইয়া রসিকচরিত্র পরিকল্পিত, যদিও শাস্ত্রমতে রসিক বিটও নহেন বিদূষকও নহেন। তিনি কোনো নায়কের শৃঙ্গারে সহায়তা করিতেছেন না।

---

১. সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ, কারিকা ৭৭
২. " " " ৭৮
৩. সাহিত্যদর্পণ ৩য় পরিচ্ছেদ কারিকা ৭৯

শৃঙ্গারসহায় নায়কের অনুরক্ত হইবে। রসিক যে কাহার অনুরক্ত নন তাহা বলা কঠিন। তিনি পরিহাসরসিক এ বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং তিনি যে শুদ্ধচরিত্র তাহাও সংশয়াতীত। তিনি দরিদ্র বটেন কিন্তু টাকা উড়াইয়া দরিদ্র হন নাই, তিনি চতুর, মনোরঞ্জনকুশলী, গোষ্ঠীতে সর্বজনপ্রিয়, সুবক্তা। তিনি কৌতুকবচনে শ্রোতার হাস্য উৎপাদনে সমর্থ। এই সদানন্দ বৃদ্ধের অন্তরটি যেমন সুন্দর বাহিরটিও তেমনি। সর্বদা জগত্তারিণীর তিরস্কার সহিয়াও তাঁহার মুখের প্রফুল্লতা মলিন হইতে পায় না। তাঁহার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য এবং চরিত্রমাধুর্যে সমগ্র নাটকটি বিশুদ্ধ হাস্যরসে উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে।

নৃপ ও নীর শকুন্তলার অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। "নৃপ শান্ত স্নিগ্ধ, নীরু তাহার বিপরীত, কৌতুকে এবং চাঞ্চল্যে সে সর্বদাই আন্দোলিত।" নৃপর গম্ভীরতা এবং সারল্যের পটভূমিকায় নীরুর কৌতুকচপল চরিত্রটি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অনসূয়া প্রিয়ংবদা শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের মিলন ঘটাইয়াছিল। কিন্তু এখানে তাহারাই এক রকম নায়িকার আসন দখল করিয়াছে (অবশ্য নায়িকা বলিয়া যদি কাহাকেও ধরা যায়)। সুরাং দূতীবৃত্তি তাহাদের দ্বারা চলে না। সে কাজটা রসিকদাদার দ্বারাই সম্পাদিত হইল এবং সুরসিক অক্ষয়েরও তাহাতে অনেকখানি হাত ছিল।

মৃত্যুঞ্জয় ও দারুকেশ্বর এই দুইটি চরিত্রের মধ্যে যে বিদ্রূপরস আছে তাহার মধ্যে করুণা অপেক্ষা বিদ্বেষ অধিক। ভণ্ডামির প্রতি, লুব্ধতার প্রতি, চারিত্রিক দীনতার প্রতি কবির চিরোদ্যত কশাঘাত বহন করিবার জন্য ইহাদের আবির্ভাব। অসংগতি ইহাদের চরিত্রেও আছে আবার চন্দ্রবাবুর চরিত্রেও আছে। কিন্তু উভয়ের প্রকৃতি এক নহে। চন্দ্রবাবুর খেয়াল দেখিয়া যে হাসি পায় তাহার সহিত বেদনার এবং এই দুইটি বিবাহার্থীর চরিত্র যে হাস্যের উদ্রেক করে তাহার সহিত কিছু নিষ্ঠুরতার যোগ আছে। হাস্যরসের মধ্যে যদি স্তরভেদ করিতে হয় তো এই ক্ষেত্রে তাহার সুযোগ আছে।

হাস্যোদ্দীপক চরিত্র বলিলে যাহা বুঝি শৈলবালার চরিত্র ঠিক সেরূপ নহে, কিন্তু তাহার কথায় বার্তায় কার্যকলাপে রসিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সুগভীর করুণার সহিত এই রসিকতার অপূর্ব সংমিশ্রণে একটি পরম রমণীয় নূতন রসের উৎপত্তি হইয়াছে।

শৈলবালার চরিত্র সরস অথচ সুগম্ভীর। বাহিরের চঞ্চলতার অন্তরালে করুণার অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা প্রচ্ছন্ন, কিন্তু তাহার প্রবাহবেগের প্রচণ্ডতা উপর হইতেও টের পাওয়া যায়। অশ্রুবিন্দুর উপরে আলো পড়িলে তাহাও উজ্জ্বল দেখায়। শৈলবালার উজ্জ্বলতা বুঝি সেইরূপ। কিন্তু সে নিজে যেমনই হউক নাটকটির মিলন মধুর পরিণতিসম্পাদনে তাহার অংশ নিতান্ত কম নয়। অক্ষয় রসিকদাদা স্বাভাবিক বেশভূষায় যে হাসি হাসাইয়াছেন শৈলের পুরুষবেশ আমাদের সেই উচ্চহাস্য উদ্দীপন করিতে পারে নাই কিন্তু সমগ্র গ্রন্থটির মধ্যে উচ্চস্তরের হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছে এই শৈল। অন্য চরিত্রের বহিরাড়ম্বরে তাহাকে শেষ পর্যন্ত ভুলিয়া যাই। সে খেলা সারিয়া খুশী মনে দরজা বন্ধ করিয়া পূজায় বসে।

উচ্চস্তরের হাস্যরস নির্দিষ্ট সীমা পার হইলে অশ্রুর উদ্রেক করে। হাস্য-রসের আলোচনা সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে।

পরীক্ষক রবীন্দ্রনাথ

শিক্ষা ও পরীক্ষা কথা দুইটা প্রায় একার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক এক সময় মনে হয় আর কিছুকাল পরে দেশে কেবল পরীক্ষাই থাকিবে শিক্ষাটা উঠিয়া যাইবে। আজ স্কুলে কলেজে শিক্ষা আছে বটে কিন্তু তাহার অর্থ পঠন-পাঠন নয়, পরবর্তী পরীক্ষায় যথাসম্ভব অল্পায়াসে উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুতি। যে কোন ব্যক্তি বিদ্যালয়ে না পড়িয়াও আই-এ, বি-এ, বি-কম, পরীক্ষা দিতে পারিবে—এই মর্মে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি এক নববিধান প্রবর্তন করায় দেশের লোক ধন্য ধন্য করিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়ন-অধ্যাপনার অধিকতর উন্নতির ব্যবস্থা করিলেও লোকে এত খুশী হইত কিনা সন্দেহ। কারণ, লোকে জানে অধ্যয়নটা পরীক্ষা পাসের উপায় মাত্র। পরীক্ষা পাসটাই চরম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হইবার অধ্যয়ন ছাড়া অন্য উপায়ও আছে, এবং সে সকল উপায় অনেক ক্ষেত্রেই অবলম্বিত হইয়া থাকে। সুতরাং অধ্যয়নের গুরুত্ব স্বভাবতঃই কমিয়া যায়, কিন্তু পরীক্ষার গুরুত্ব কমে না।

শিক্ষাব্যবস্থা হইতে পরীক্ষা তুলিয়া দেওয়া হউক এমন কথা বলি না। অর্জিত বিদ্যার মান নির্ণয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। ইহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু বর্তমান পরীক্ষাপ্রণালীতে সেই মান নির্ণয় করা সম্ভব হয় কি? অর্থপুস্তক পড়িয়া, তথাকথিত সম্ভবপর প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করিয়া, পরের খাতা নকল করিয়া, অথবা রামের ছদ্মবেশে শ্যামকে বসাইয়া—যে-পরীক্ষায় হাজারে হাজারে ছাত্র পাস করিয়া যাইতেছে সেই পরীক্ষা আর যাহাই হউক, তাহা বিদ্যার্থীর বিদ্যার পরিচয় বহন করে না। প্রশ্ন রচনা করিবার কালে প্রশ্ন-কর্তারা অনেক চেষ্টা করিয়াও পথ দেখিতে পান না। শেষ পর্যন্ত গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করিতে বাধ্য হন। তাহা ছাড়া পাঠ্যব্যবস্থা এক থাকিলে কোন নূতন পথই বেশীদিন নূতন থাকিতে পারে না। একটা দৃষ্টান্ত বলি:

প্রবেশিকা বাংলা পরীক্ষায় প্রবন্ধ রচনার জন্য একটি বিষয় দেওয়া হইল—'তোমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন।' দেখা গেল, পরীক্ষার্থী এ প্রশ্নের উত্তরে বিহারের ভূমিকম্পের ভয়াবহ বর্ণনা দিয়া এক বিধ্বস্ত গৃহের মধ্য হইতে

কিভাবে নিজপ্রাণ বিপন্ন করিয়াও একটি বালিকাকে আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছিল তাহার এক রোমাঞ্চকর বিবরণ লিখিয়াছে। ঘটনাটি যদি সত্য ঘটিয়া থাকিত তাহা হইলে বালকের জীবনের পক্ষে সে-দিনটি যে স্মরণীয় হইয়া থাকিবার যোগ্য হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঘটনাটি তাহার জীবনারম্ভ হইবার বছর সাতেক পূর্বে ঘটিয়া গিয়াছে। এখন, লেখার ভাষাটা ভাল বলিয়া তাহাকে শতকরা ষাট নম্বর কেন দেওয়া হইবে না তাহা লইয়া তর্ক উঠিতে পারে। আমার বিশ্বাস, তাহাকে ষাট নম্বর দিবার পক্ষের পরীক্ষকের সংখ্যাই বৃহত্তর হইবে। সুতরাং গণতান্ত্রিক কারণে পরীক্ষার্থী কেবল মুখস্থ শক্তির দ্বারাই প্রথম বিভাগের প্রশংসাপত্র অধিকার করিয়া বসিবে।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার এইরূপ বহুবিধ ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াই রবীন্দ্রনাথ নিজে এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সে বিদ্যালয়টি ছিল তাঁহার পরীক্ষাগার। অতি অল্পসংখ্যক পাঠার্থী লইয়া তিনি এমন এক শিক্ষাধারা প্রবর্তনের জন্য উদ্যোগী হন, যাহা তথাকথিত পরীক্ষা পাসের উপায় মাত্র বলিয়া গণ্য না হয়, যাহা আমাদের মনকে বলিষ্ঠ ও চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিয়া আমাদের জীবনকে সর্বতোভাবে জীবনযাত্রার উপযোগী করিয়া তুলিতে সমর্থ হয়। আমরা ভাষা শিক্ষা করিয়া যদি তাহা ব্যবহার করিতে না পারি, তবে সে ভাষা শিক্ষার কোনো সার্থকতা নাই। সাহিত্য পাঠ করিয়া যদি না রস গ্রহণ করিতে পারি তো, সে সাহিত্যচর্চা নিষ্ফল। বি.এ., এম.এ. উপাধিধারী এমন লোকের অসদ্ভাব নাই যাঁহারা মাতৃভাষাও দুইছত্র শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারেন না, একটা কবিতা পড়িয়া তাহার অন্তর্নিহিত রসটুকু উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন না। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাপদ্ধতিকে এই বিড়ম্বনা হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে কিনা তাহার বিচার বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে আমরা এস্থলে আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা কি ছিল, একটি নূতন ধরণের উপকরণ সাহায্যে শুধু সেইটি দেখিবার চেষ্টা করিব।

শিক্ষাপদ্ধতি কথাটা অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু ব্যাপক আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে ছাত্রদের কোন্ স্তরে কিরূপ

জ্ঞান হওয়া উচিত এবং কিরূপ প্রশ্নের দ্বারা সেই জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া রবীন্দ্রনাথ মনে করিতেন এই প্রবন্ধে তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। রবীন্দ্রনাথ-রচিত প্রশ্নগুলি এ যুগের প্রশ্নকর্তাদের কিছুটা সহায়তা করিতেও পারে।

আজ হইতে প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে বাঙ্গালাদেশে যে জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহার এক প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। বস্তুতঃ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের উপরে শিক্ষাসংস্কারের প্রায় সম্পূর্ণ ভারই অর্পণ করেন। তাঁহার 'শিক্ষাসমস্যা' নামক প্রবন্ধে তদানীন্তন শিক্ষার দোষ কি ছিল এবং জাতীয় শিক্ষা বলিতে তিনি কি বুঝেন তাহার উল্লেখ আছে। নেতৃবৃন্দ শিক্ষাপরিষদের স্কুলবিভাগের গঠনপত্রিকা রচনা করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলে এই প্রবন্ধটি লিখিত হয়।

এই শিক্ষাপরিষদেরই প্রথম পরীক্ষায় বাঙ্গালার দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র রবীন্দ্রনাথ রচনা করিয়াছিলেন। প্রশ্নপত্রটি ১৯০৬ সালের "Fifth Standard Examination" এর জন্য রচিত হয়। Fifth Standard Examination তৎকালীন এনট্রান্স পরীক্ষার সমতুল। প্রশ্নপত্রটির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল:

Fifth Standard Examination

1906

Bengali

Second Paper

Full Marke—50

Paper Set by—

Babu Rabindra Nath Tagore

Examiners—

Babu Kshirodprasad Vidyabinode, M. A., Babu Purna Chandra De, B. A., Babu Kshetra Mohan Sen Gupta.

N. B.—Candidates are required to answer any THREE out of the four questions of this paper.

১। প্রবন্ধ রচনা

(ক) ছিনু মোরা সুলোচনে গোদাবরী তীরে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে, ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্যে সুরবনসম।

গোদাবরী তীরে স্থিত রাম ও সীতার কুটীর এমন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর, যেন তাহা স্বচক্ষে দেখিতেছ ; অর্থাৎ কুটীরের সম্মুখবর্তী নদীর তটভাগ কিরূপ, তাহার সমীপবর্তী বনে কি কি গাছ কিরূপে অবস্থিত, কুটীরের মধ্যে কোথায় কি আছে তাহা প্রত্যক্ষবৎ লিখ।

অথবা—

(খ) পুরাণে বা ইতিহাসে যাঁহার চরিতে তোমার চিত্তকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা কর।

অথবা—

(গ) যে কোন বাল্যপরিচিত প্রিয় আত্মীয় বন্ধুর বা পুরাতন ভৃত্যের বা পোষা প্রাণীর কথা ও তৎসম্বন্ধে হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়া লিখ।

একথা মনে রাখা আবশ্যক যে, যে বৎসর শিক্ষা পরিষদ্ স্থাপিত হয়, এ প্রশ্নও সে বৎসরের, নূতন পাঠ্যতালিকাদির প্রবর্তন হইলেও ঐ বৎসরের পরীক্ষায় তাহা অনুসৃত হইতে পারে নাই। সম্ভবতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন এন্ট্রান্স পরীক্ষার পাঠ্যসূচী অনুসারেই এ প্রশ্ন রচিত হইয়াছিল। যে সব ছাত্র তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়া স্কুল ছাড়িয়া আসিয়াছিল তাহাদেরই জন্য জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ একটি বিকল্প পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বুঝিতে হইবে। ১৯২০-২১সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বেও অনুরূপ আর একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। আমরা স্কুল ছাড়িয়া গিয়া সেই পরীক্ষা দিয়া দেশবন্ধুর স্বাক্ষরিত তুলট কাগজে লাল কালিতে ছাপা অভিজ্ঞানপত্র পাইয়াছিলাম মনে আছে। ১৯০৬ এবং ১৯২০-এর মধ্যে তফাত এই যে, ১৯০৬-এর শিক্ষা-পরিষদ এখনও জের টা নয়া চলিতেছে। ১৯২০-এর গৌড়ীয় সর্বাবিদ্যায়তন দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই দেহরক্ষা করে।

যেখানে পাঠ্যতালিকার উপর হাত দিবার অবকাশ নাই অথচ পরীক্ষার দ্বারা পরীক্ষার্থীর বিদ্যাবুদ্ধি নিরূপণ করিতে হইবে সেখানে কোনোদিকেই কোনোপ্রকার নূতনত্বের অবকাশ থাকে না। কিন্তু জাতীয় শিক্ষাপরিষদের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ ইহারই মধ্যে একটু নূতনত্বের সঞ্চার করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত প্রশ্নের সহিত পাঠ্যপুস্তকের সম্পর্ক আছে বলিয়া কেহ যেন ভ্রম না করেন। দ্বিতীয় পত্রটি সম্পূর্ণভাবেই রচনা-পরীক্ষার জন্য অভিপ্রেত।

১। (ক) প্রশ্নে প্রশ্নকর্তা একটি রচনা লিখিতে বলিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু প্রশ্নটি এমন যে ইহার উত্তরের জন্য লেখককে আত্মশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে—শুধু প্রকাশের শক্তি নয়, তাহার কল্পনার শক্তিও থাকা চাই। পরীক্ষার্থীর বিদ্যাবুদ্ধির পরীক্ষার জন্য আজিকার দিনেও এ জাতীয় প্রশ্নের উপযোগিতা আছে; কারণ, রচনার বই হইতে 'important essay' মুখস্থ করিয়া জীবনের স্মরণীয় দিনের রচনা লেখা গেলেও গোদাবরী তীরস্থ রাম ও সীতার কুটীর বর্ণনা কল্পনাশক্তির সহায়তা ব্যতীত একেবারেই অসম্ভব। অথচ এই প্রশ্ন-টিকে অনতিপরিচিত বলিলেও ছেলেমেয়েদের পক্ষে কঠিন বলা সংগত হইবে না।

পরীক্ষার্থী মেঘনাদবধ পড়িয়া থাকিতে পারে। কিন্তু পড়ে নাই ধরিয়াও এ প্রশ্ন করিতে বাধা নাই। প্রশ্নকর্তার মনটাকে বুঝিবার চেষ্টা করিতে গিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, পরীক্ষার্থী কৃত্তিবাসী রামায়ণটা একবার পড়িয়াছে এ কথা তিনি ধরিয়া লইয়াছেন। পাঠ্যপুস্তক বলিয়া কিছু পড়ুক বা না পড়ুক প্রবেশিকার স্তরে যাহারা উঠিবে তাহারা অন্ততঃ রামায়ণ মহাভারতটা পড়িয়া ফেলিবে এইটুকু তিনি প্রত্যাশা করেন।

এই প্রশ্নের মধ্য দিয়া দেখিতে পাই, পরীক্ষার্থীর মন সচেতন এবং দৃষ্টি সজাগ আছে কিনা তাহা প্রশ্নকর্তা জানিতে চান। কল্পনাশক্তির কথা তো পূর্বেই বলিয়াছি। সমস্ত প্রশ্নটির মধ্যে 'প্রত্যক্ষবৎ' কথাটি বিশেষ লক্ষণীয়। এই কথাটির দ্বারাই প্রশ্নকর্তার জিজ্ঞাসাটি অতিশয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

১। (খ) প্রশ্নটি এ যুগের পরীক্ষার্থীরও পরিচিত। সে যুগের পুস্তকে না থাকিলেও এ যুগের প্রাক্ষ-পুস্তকে এ প্রশ্নের এমন উত্তর থাকিবে যে, তাহা মুখস্থ করিয়া অনায়াসে নিজের বলিয়া চালাইয়া দেওয়া শক্ত হইবে না।

১। (গ) প্রশ্নের মধ্যেও গতানুগতিকতা নাই। এ প্রশ্নের অভিপ্রেত উত্তর কেবল সেই সব ছেলেমেয়ের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব যাহারা চোখ কান খুলিয়া চলে। কেবলমাত্র বইয়ের দুইটি মলাটের মধ্যে মুখটি ঢুকাইয়া যাহারা জগৎকে ভুলিয়া যায় তাহাদের পক্ষে এ প্রশ্ন বড় মারাত্মক। তবু কি কেহ একথা বলিবে যে, এ প্রশ্ন কঠিন ?

এই প্রশ্নের শেষাংশটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য। বাল্যপরিচিত প্রিয় আত্মীয় বন্ধুর বা পুরাতন ভৃত্যের বা পোষা প্রাণীর কথা লিখিলে প্রশ্নের অর্ধেক মাত্র উত্তর হইল। কিন্তু প্রশ্নকর্তা তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন। তিনি চান পরীক্ষার্থী যাহার কথা বলিবে তাহার সম্বন্ধে তাহার নিজের হৃদয়ের ভাবটি কিরূপ তাহাও ব্যক্ত করিবে। এই একটি প্রশ্নের সাহায্যে পরীক্ষার্থীর ভাব প্রকাশের শক্তি কতখানি জাগিয়াছে এবং তাহার ভাষার উপর অধিকার কতখানি জন্মিয়াছে এই দুইটিই বুঝা যাইবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের বিষয় পত্ররচনা। প্রশ্নটি এইরূপ :

২। পত্র রচনা

নিম্নলিখিত যে কোনো বিষয় অবলম্বন করিয়া অভিভাবক বা বন্ধু বা যাঁহাকে ইচ্ছা পত্র লিখ।

(ক) মেস অর্থাৎ ছাত্রাবাসে কিরূপ ব্যবস্থা আছে এবং সেখানে কিরূপে দিন যাপন করা হয়।

(খ) বর্তমান বৎসরে জলবায়ু ও শস্যাদি ঘটিত পল্লীবাসীদের অবস্থা।

(গ) যে পাড়ায় বাস কর তাহার বর্ণনা।

(ক) প্রশ্নটি এ যুগের ছাত্রছাত্রীর অপরিচিত নহে। আর এ প্রশ্নটি ছাত্রসাধারণের জন্যও নহে; কারণ, আমাদের দেশে যে সকল ছাত্র মেসে থাকিয়া পড়াশুনা করে, তাহাদের সংখ্যা শতকরা পাঁচের অধিক হইবে না। নূতন কিছু লেখা যাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়, স্বাধীনভাবে কোনো রচনায় হাত দিতে যাহাদের সাহসে কুলাইবে না, এ ধরণের গতানুগতিক দুই একটি প্রশ্ন তাহাদের জন্য। এ ধরণের প্রশ্ন প্রত্যাশিত বা প্রতীক্ষিত—আজকাল কলেজের ছেলেমেয়েরা যাহাকে 'common' বলে এ তাহাই।

কিন্তু পরবর্তী প্রশ্ন দুইটির মধ্যে মৌলিকতা আছে, অথচ এই দুইটি প্রশ্নেরই বিষয় নিতান্ত সাধারণ।

(খ) প্রশ্নটির উত্তর গ্রামের ছেলেমেয়েদের সহজেই লেখা উচিত।

(গ) প্রশ্নের উত্তর কি পল্লীবাসী আর কি নগরবাসী সকল পরীক্ষার্থীই ইচ্ছা করিলে লিখিতে পারিবে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের বাঙ্গালা দেশে কি হইত জানি না। কিন্তু আজ যদি আমরা এই তিনটি বিকল্প প্রশ্ন দিই তো অধিকাংশ পরীক্ষার্থী ছাত্রাবাসের আবাসিক না হইয়াও (ক) প্রশ্নের উত্তর দিবে। এ প্রশ্নের জন্য তাহারা প্রস্তুত হইয়া আসে, এ প্রশ্নের উত্তর বাজারে প্রচলিত রচনা পুস্তকে দেওয়া আছে। অন্য দুইটি 'common' নয়।

পরীক্ষার্থী যাহাই করুক (খ) ও (গ) প্রশ্নের মধ্য দিয়া আমরা পরীক্ষককে বুঝিতে পারি। এই প্রশ্নাবলী প্রবর্তন করার উদ্দেশ্য ছাত্রদের অর্জিত বিদ্যার যথার্থ মান নির্ণয়। শুধু তাহাই নহে, আমাদের দেশের শিক্ষা পদ্ধতি কিভাবে পরিবর্তন করা উচিত ইহার মধ্যে সে ইঙ্গিতটাও ব্যক্ত হইয়াছে, ভবিষ্যৎকালের শিক্ষকগণ এই প্রশ্নাবলী হইতেই কিছুটা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিবেন এমন আশাও বোধ হয় প্রশ্নকর্তার ছিল। "বইয়ের ভিতর হইতে জ্ঞান সঞ্চয় করা আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্ম নহে। প্রত্যক্ষ জিনিসকে দেখিয়া শুনিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া সঙ্গে সঙ্গেই অতি সহজেই আমাদের মনন শক্তির চর্চা হওয়া স্বভাবের বিধান ছিল।" এবং স্বভাবের বিধান যাহাতে আমাদের মধ্যে আপন ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয় তাহারই জন্য রবীন্দ্রনাথ উৎসুক হইয়াছিলেন।

তিনি দেখিয়াছিলেন আমাদের মন ও বাহিরের মধ্যে বইয়ের এক অত্যুচ্চ প্রাচীর। তিনি সেই বইয়ের ব্যবধান ভাঙ্গিয়া মনের সহিত বাহিরের সংযোগ-সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। এস্থলে 'আবরণ' প্রবন্ধ হইতে তাঁহার একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"আমাদের মাস্টাররা বই পড়াইবার একটা উপলক্ষমাত্র এবং আমরাও বই পড়িবার একটা উপসর্গ। ইহাতে ফল হইয়াছে এই, আমাদের শরীর যেমন কৃত্রিম জিনিসের আড়ালে পড়িয়া পৃথিবীর সঙ্গে গায়ে গায়ে যোগটা হারাইয়াছে এবং হারাইয়া এমন অভ্যস্ত হইয়াছে যে, সে যোগটাকে আজ ক্লেশকর লজ্জাকর বলিয়া মনে করে, তেমনি আমাদের মন এবং বাহিরের মাঝখানে বই আসিয়া

স্বাদশক্তি অনেকটা হারাইয়া ফেলিয়াছে। সব জিনিসকে বইয়ের ভিতর দিয়া জানিবার একটা অস্বাভাবিক অভ্যাস আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গেছে। পাশেই যে জিনিসটা আছে, সেইটেকেই জানিবার জন্ম বইয়ের মুখ তাকাইয়া থাকিতে হয়।...তুচ্ছ বিষয়টুকুর জন্যও বই নহিলে মন আশ্রয় পায় না।... জগৎকে আমরা মন দিয়া ছুঁই না, বই দিয়া ছুঁই।"

অদ্যাবধি তাহাই চলিতেছে। আজও আমাদের বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা গোরুর রচনা লিখিতে হইলে গোরুর দিকে না তাকাইয়া রচনার বই উল্টায় এবং আমরা শিক্ষকরা সেই বই দেখিয়া গোরুর বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে উৎসাহ দিই। মানুষের বিষয়েও যে এই রীতির বড় একটা ব্যতিক্রম করি এমন কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না।

ঐ ১৯০৫ সালেই Seventh Standard Examination-এরও বাঙ্গালা প্রশ্নের দ্বিতীয় পত্রের রচয়িতা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। Seventh Standard Examination তদানীন্তন ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষার সমতুল্য।

ঐ প্রশ্নপত্রের প্রথম প্রশ্নটি ছিল এইরূপ :

১। প্রবন্ধ রচনা

নিম্নে উদ্ধৃত দুইটি রচনার মধ্যে যে কোনটি অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ লিখ—

(ক) সঞ্চয় ও সঞ্চার।

শক্তি সঞ্চয় যে প্রকার আবশ্যক, তাহার বিকিরণও সেইরূপ বা ততোধিক অধিক আবশ্যক। হৃৎপিণ্ডে রুধির সঞ্চয় অত্যাবশ্যক; তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু। কুলবিশেষে বা জাতিবিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য বিদ্যা বা শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া এককালের জন্য অতি আবশ্যক, কিন্তু সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্বতঃ সঞ্চারের জন্য পুঞ্জীভূত। যদি তাহা না হইতে পারে, সে সমাজ-শরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

(খ) শিক্ষার উদ্দেশ্য।

And the entire object of true education is to make people not merely do the right things, but enjoy the right things—not merely industrious, but to love industry—not merely

learned, but to love knowledge—not merely pure but to love purity—not merely just but to hunger and thirst after justice.

অথবা

(গ) রাম ও লক্ষ্মণের চরিত্র তুলনা করিয়া প্রবন্ধ লিখ।

এই প্রশ্নগুলির উত্তরও বই মুখস্থ করিয়া দেওয়া যাইবে না। তবে যে-ছাত্রের চিন্তাশক্তি কিছু পরিমাণে জাগরূক হইয়াছে সে প্রতিটি সংকেতসূত্রকে এক-এক অনুচ্ছেদে সম্প্রসারিত করিয়া একটি অনতিবৃহৎ প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিবে। (গ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য রামায়ণের জ্ঞান আবশ্যক। প্রশ্নকর্তা আশা করেন যে, যে ছেলেমেয়ে ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষা দিতেছে কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীদাসী মাহাভারত—এই দুইটা বই তাহাদের অবশ্য পড়া আছে। আর রামায়ণ যাহার পড়া আছে, নোট বই না দেখিয়াও রাম-লক্ষ্মণের চরিত্র সম্বন্ধে তাহার নিজের মতামত সে প্রকাশ করিতে না পারিবে কেন? রামায়ণ পড়িয়া রাম-লক্ষ্মণের কথা যে বলিতে পারিবে না তাহার রামায়ণ পড়া নিষ্ফল।

এই পরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ আর একটি জিনিসের প্রবর্তন করেন। অদ্যকার শিক্ষাসংস্কারক এবং প্রশ্নকর্তাদের দৃষ্টি বিশেষ করিয়া সে দিকে আকর্ষণ করিতে চাই। এ যুগেও স্কুল ফাইনাল, ইণ্টারমিডিয়েট, বি. এ. এবং বি. কম. পরীক্ষার বাঙ্গালা প্রশ্নপত্রে ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা অনুবাদের জন্য কয়েক নম্বর নির্দিষ্ট আছে। তাহাতে আমরা প্রতিছত্রের অনুবাদ আশা করি। এমন কি আমরা লাইন ধরিয়া নম্বর ভাগ করি। রবীন্দ্রনাথ জানিতেন দুই ভাষার প্রকৃতি এতই স্বতন্ত্র যে এক ভাষাকে অন্য ভাষায় অবিকল অনুবাদ করা অত্যন্ত কঠিন, অনেক সময় অসম্ভব। 'অনুবাদচর্চা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এই কথাটি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। তাই তিনি Seventh Standard Examination-এর প্রশ্নপত্রে ইংরাজী হইতে বাঙ্গলায় অনুবাদ করিতে না দিয়া ভাবার্থ লিখিতে বলিয়াছেন। প্রশ্নে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে: "অবিকল অনুবাদ অনাবশ্যক।"

এ বাক্যটি অতিশয় মূল্যবান্—অবিকল অনুবাদ অনাবশ্যক। আমাদের জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই এই মহাবাণী-প্রয়োগ করিতে যেন ভুল না করি, বিশেষ করিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে।

শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

আজ অর্ধ শতাব্দীর এপারে দাঁড়াইয়া ওপারের বাঙ্গালা দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি। তখনকার বালক-বয়সীদের মধ্যে দুই চারিজন আজও বর্তমান আছেন। সেদিনকার প্রসঙ্গ তাঁহাদের মনে পূর্বস্মৃতির এবং এ-যুগের পাঠকের মনে কৌতূহলের উদ্রেক করিতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের কথা বলিতেছি। বাঙ্গালা দেশে শিক্ষা-সমস্যা সম্পর্কে তখন গুরুতর আন্দোলন চলিতেছে। সে আন্দোলন শখের আন্দোলন নয়। কোনো রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা বৃদ্ধির উপলক্ষ হিসাবে সে আন্দোলনের জন্ম হয় নাই; চিন্তাশীল দেশ-হিতৈষী কয়েকজন মনীষী সেই আন্দোলনের প্রবর্তক—রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতম না হইলেও উৎসাহে, উদ্দীপনায়, কর্মশক্তিতে সর্বাগ্রগামী।

এই আন্দোলনের গোড়ার কথাটি ছিল—বাঙ্গালা দেশের বালক-বালিকাকে বাঙ্গালা ভাষাশিক্ষার সুযোগ-সুবিধা ও উৎসাহ দিতে হইবে এবং বাঙ্গালা ভাষাকে এ-দেশে শিক্ষার ও পরীক্ষার বাহন করিতে হইবে। দেশের চিন্তানায়কগণের মধ্যে কেহ কেহ এ-কথা গভীরভাবে অনুভব করিতেছিলেন যে মাতৃভাষায় লেখা বা বলা হইলে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি ছাত্রগণ যত সহজে আয়ত্ত করিতে পারিবে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে তাহা কখনোই সম্ভব নয়। তাঁহারা উপলব্ধি করিতেছিলেন ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ফলে ছেলেরা বাঙ্গালাও শিখিতেছে না, ইংরাজীও শিখিতেছে না, বিষয়-জ্ঞানও তাহাদের কাঁচা থাকিয়া যাইতেছে। মাতৃভাষার ভিতটা শক্ত হয় না বলিয়াই এই দুর্বিপাক। বঙ্কিমচন্দ্র, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ চিন্তানায়কগণ এই বিষয়ে স্ব স্ব অভিমতও মধ্যে মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন কিন্তু তেমন কোনো ফল না পাওয়ায় তাঁহারা নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। এমন সময়ে রবীন্দ্রনাথ আন্দোলনে অবতীর্ণ হইলেন।

১৮৯২ সালে রাজসাহী এসোসিয়েশনে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাসমস্যা সম্পর্কে যে ভাষণ দেন তাহা হইতেই এই আন্দোলনের সূত্রপাত বলিয়া ধরা যায়।

এই ভাষণে তিনি তদানীন্তন শিক্ষা-পদ্ধতির কয়েকটি মৌলিক ত্রুটি দেখাইয়া দেন। তাহার মধ্যে প্রধান হইল অসামঞ্জস্য—ভাষার সহিত ভাবের অসামঞ্জস্য, ভাবের সহিত জীবনের অসামঞ্জস্য। তিনি বলেন :

"বাল্যকাল হইতে যদি ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা হয় এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবনযাত্রা নিয়মিত হইতে থাকে তবেই আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে, আমরা বেশ সহজ মানুষের মত হইতে পারি এবং সকল বিষয়ের একটা যথাযথ পরিমাণ ধরিতে পারি।"

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হইবার উপায় ছিল না। কারণ, ইংরাজী ভাষা শিক্ষার বাহন হওয়ায় ভাষা শিক্ষা করিতেই দীর্ঘকাল কাটিয়া যায়। একে ভাষা নিতান্তই বিদেশীয় তাহাতে শিক্ষকগণও অধিকাংশই অল্পশিক্ষিত এবং অযোগ্য। ফলে ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাহার পর ইংরাজী ভাষায় যখন সামান্য জ্ঞান হয় এবং যখন ইংরাজী গ্রন্থ পড়িয়া ছাত্ররা অর্থ বুঝিতে পারে তখন ইংরাজী ভাব রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেখানে আর অন্তরঙ্গের মত বিহার করিবার শক্তি থাকে না। ভাবগুলা বুঝা যায় বটে কিন্তু মর্মস্থলে আকর্ষণ করা যায় না। জীবনের কার্যে সেগুলা ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থায় বাঙ্গালা ভাষাকে যথোচিত মর্যাদা দিলে তবেই এ অসামঞ্জস্য দূর হইতে পারে—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য।

রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণ "শিক্ষার হেরফের" নামে প্রকাশিত হয় ১২৯৯ সালের পৌষ সংখ্যা 'সাধনা' পত্রিকায়। প্রতিবাদও কিছু কিছু বাহির হয়। কিন্তু প্রতিবাদ অপেক্ষা সমর্থনের সংখ্যা ছিল অধিক, আর যাঁহারা সমর্থন করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই ছিলেন সেকালের সর্বজনমান্য চিন্তানায়ক।

প্রধান সমর্থক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। "শিক্ষার হেরফের" প্রবন্ধ পড়িয়া তিনি লেখককে যে পত্র দেন তাহার একাংশ এইরূপ :

"পৌষ মাসের 'সাধনা'য় প্রকাশিত শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। সার গুরুদাস বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগবশতঃ এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে চেষ্টার ফলও অনুরূপই হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়িয়া গুরুদাসবাবু যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহার অংশ-বিশেষ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি :

"প্রবন্ধটি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি তাহার প্রধান প্রধান কথাগুলি আমারও একান্ত মনের কথা এবং সময়ে সময়ে তাহা ব্যক্তও করিয়াছি। আমার কথানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রদ্ধাস্পদ একজন সভ্য বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদানার্থে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা গৃহীত হয় নাই।"

আনন্দমোহনবাবুও রবীন্দ্রনাথের সহিত ঐক্যমত জানাইয়া তাঁহার প্রস্তাবকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করেন। তিনি লিখেন :

"প্রবন্ধটি আহ্লাদের সঙ্গে পড়িয়াছি। আপনি এ-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন অনেক পূর্বে হইতে আমারও সেই মত; সুতরাং সেই মত এমন অতি সুন্দরভাবে এবং দক্ষতার সহিত সমর্থিত ও প্রচারিত হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইব ইহাও স্বাভাবিকই। প্রবন্ধটি যেমন গুরুতর বিষয় সম্বন্ধীয়, ভাব গুণে ও বিষয়লালিত্যে আবার তেমনি মধুর ও উপাদেয় হইয়াছে। এখন আলোচ্য, প্রদর্শিত অনিষ্টের প্রতিকারের উপায় কি? বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ভাষা ও নিয়মাদি সম্বন্ধে কতক কতক পরিবর্তন করিলে উপকার হইতে পারে। কিন্তু এই বিষয়ের আমি যখনই আলোচনা করিয়াছি তখনই আমাদের স্বদেশীয়দের নিকট হইতেই আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে আমাদের মধ্যে পাবলিক ওপিনিয়ান অনেকট, পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক। আমি সময়ে সময়ে এ-সম্বন্ধে প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে আনিব মনে করিয়াছি, কিন্তু যে পর্যন্ত এই পরিবর্তন সাধিত না হয় কিছুই করা যাইতে পারিবে না বলি। নিরস্ত হইয়াছি।"

শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষার উপযোগিতা যে সমধিক, এই কথাটা বুঝাইবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সর্বজনমান্য ব্যক্তিগণকেও দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট হইতে কি পরিমাণ বিরোধিতা সহ্য করিতে হইয়াছিল উল্লিখিত পত্রগুলি তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। তাঁহাদের কাত্র

তখন শেষ হইবার মুখে। তাহা ছাড়া সাফল্য সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে গভীর সন্দেহ। শিক্ষিতজনের মূঢ়তায় তাঁহাদের মন বেদনায়-নৈরাশ্যে মুহ্যমান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিন্দুমাত্র ভয় না পাইয়া বাঙ্গালা শিক্ষার প্রসারে অগ্রসর হইলেন; উল্লিখিত সমর্থকগণের শুভেচ্ছা ও আনুকূল্য তাঁহার সহায়ক হইল। সেইদিন হইতে স্বীয় সাহিত্য সাধনার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের চিত্তে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি মর্যাদাবোধ জাগ্রত করিবার জন্য তিনি যে নিরলস চেষ্টা করিয়া চলিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাহার বিরাম ছিল না। সে চেষ্টা যে ব্যর্থ হয় নাই এবং তিনি যে পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার পূর্বে নব দিনের উদ্বোধন লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন আজ তাহা স্মরণ করিয়া কিছু সান্ত্বনা পাই।

১৯৩৭ সাল আমাদের পক্ষে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে রবীন্দ্রনাথ প্রধান বক্তারূপে ভাষণ দান করিবার জন্য আহূত হন। তিনি বাংলা ভাষায় ভাষণ দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নব-রীতির প্রবর্তন করেন। দেহের অপটুতা সত্ত্বেও তিনি যে সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বান অমান্য করিতে পারেন নাই, মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগই তাহার কারণ সেদিনকার "একটি বিশেষ গৌরবের উপলক্ষ" তাঁহাকে সমস্ত বাধার উপর দিয়া আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল। ১২৯৯-এর রাজসাহী এসোসিয়েশন হইতে—সম্ভবতঃ তাহারও পূর্ব হইতে যে কথা তিনি বলিতে আরম্ভ করেন তাহার পর নানা স্থানে নানা বক্তৃতায় নানা প্রবন্ধে তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া আসিয়াছেন। ১৯৩৭-এর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ পদবীসম্মান বিতরণ উৎসবেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। সেখানেও বলিলেন :

"দুর্ভাগ্য দিনের সকলের চেয়ে দুঃসহ লক্ষণ এই যে, সেই দিনের স্বতঃস্বীকার্য সত্যকেও বিরোধের কণ্ঠে জানাতে হয়। এদেশে অনেক কাল জানিয়ে আসতে হয়েছে যে, পর-ভাষার মধ্য দিয়ে পরিস্রুত শিক্ষায় বিদ্যার প্রাণীন পদার্থ নষ্ট হয়ে যায়।"

কিন্তু ঐ ভাষণেই তাঁহার কণ্ঠে প্রথম আশার সুর শুনিতে পাইলাম। বাঙ্গালা শিক্ষার ক্ষেত্রে যে-বাঙ্গালা ভাষা নিতান্ত অপাংক্তেয় ছিল, কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে সাদর সম্মান নিবেদন করিলেন—ইহা রবীন্দ্রনাথ দেখিয়া গিয়াছেন এবং স্বীকার করিয়াও গিয়াছেন। "ছাত্র সম্ভাষণ" নামে প্রকাশিত ঐ ভাষণে সে স্বীকৃতির নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে। ইংরাজী ভাষার সম্পর্কে যে কৃত্রিম কৌলীন্যগর্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তরে অন্তরে সংস্কারগত হইয়া গিয়াছিল, সেই পরভাষাশ্রিত আভিজাত্য ভাঙিয়া পড়িল। স্যর আশুতোষ ছাড়া আর কাহারও পক্ষে এই অঘটন ঘটানো সম্ভব হইত কিনা বলা শক্ত। আশুতোষের হাত দিয়া বঙ্গীয় বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবাণীর চরণে প্রথমে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলেন দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্যামাপ্রসাদ পিতৃনির্দিষ্ট পথে আরও বহুদূর অগ্রসর হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত শিক্ষাব্যবস্থায় অন্ততঃ প্রথম স্তরে যে বাঙ্গালাকে শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যমরূপে প্রয়োগ করার নীতি শ্যামাপ্রসাদের চেষ্টায় গৃহীত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া কবি নিশ্চয় সান্ত্বনার নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন। ১৯৪০ সালে যে প্রবেশিকা পরীক্ষা গৃহীত হয়, সেই পরীক্ষা হইতেই প্রবেশিকায় মাতৃভাষাকে মাধ্যমরূপে স্বীকার করা হয়। এই পরীক্ষার উদ্দেশ্যে পঠন-পাঠন শুরু হইয়াছিল ১৯৩৭ সাল হইতেই।

প্রবেশিকা-স্তরে বাঙ্গালা ভাষাকে শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম করিবার জন্ম কাজ আরম্ভ হয় তাহারও আগে। নূতন ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল বিষয়ের গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি যাবতীয় প্রবেশিকা পাঠ্য বিষয় সম্পৃক্ত পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় লেখা আরম্ভ হয়। বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিতে গেলে পরিভাষা লইয়া অসুবিধা হইবে ইহা বুঝিয়া শ্যামাপ্রসাদ কয়েকজন বিশেষজ্ঞের হাতে বিভিন্ন বিষয়ে পরিভাষা রচনার ভার অর্পণ করেন। তাঁহাদের নির্ধারিত পরিভাষা অবলম্বনেই প্রবেশিকা পাঠ্য গ্রন্থসমূহ রচিত হয়।

এই সময়ে আর একটি সমস্যার দিকে শ্যামাপ্রসাদের দৃষ্টি পড়ে। সে হইল বাঙ্গালা বানানের সমস্যা। বাঙ্গালার একই শব্দের বহু বিচিত্র ও বিভিন্ন বানান দেখা যায়।* এমন কি, একই লেখকের হাতে একাধিক বানান বাহির

হয়। কোনো ভাষার পক্ষেই বানানের এই বিশৃঙ্খলা প্রশংসার বিষয় নহে। ভাবিয়া চিন্তিয়া এমন একটি বানান-পদ্ধতি ঠিক করিতে হইবে যাহা সকলে, অন্ততঃ দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি, আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন। সে ভার লইবে কে? শ্যামাপ্রসাদ শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হইলেন। রবীন্দ্রনাথ সানন্দে সে ভার গ্রহণ করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরে যে বানান-পদ্ধতি প্রকাশিত হয়, সে বানান সংস্কারের সূচনা হয় রবীন্দ্রনাথের হাতেই।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়িয়া একদিন আনন্দমোহনবাবু লিখিয়াছিলেন, "আমাদের মধ্যে 'পাবলিক ওপিনিয়ান' অনেকটা পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক।" তিনি ইহাও আশা করিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের ঐ প্রবন্ধ এই পরিবর্তনে অনেক সাহায্য করিবে। সৌভাগ্যের বিষয় আনন্দমোহনবাবুর আশা বিফল হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ শুধু যে 'পাবলিক ওপিনিয়ান'-ই পরিবর্তন করিয়া গিয়াছেন তাহা নয়, ঐ পরিবর্তিত 'পাবলিক ওপিনিয়ান'-এর নূতন ক্ষুধার উপযোগী আহার্যের ব্যবস্থাও তিনি নিজের হাতেই রচনা করিয়া গিয়াছেন। সে 'পাবলিক ওপিনিয়ান'-এর অঙ্কুর আজ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষার শুধু প্রথম স্তরে নয়—সকল স্তরেই আজ সে বিদেশী ভাষার শৃঙ্খল ভাঙিয়া মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার দাবি জানাইতেছে। রবীন্দ্রনাথ পাল তুলিয়া দিয়া বাতাসের অপেক্ষায় বসিয়া থাকেন নাই, অবিরত দাঁড় টানিয়া চলিয়াছিলেন, তাই নৌকা বহুদূর আগাইয়া গিয়াছে। এখন পালে হাওয়া লাগিয়াছে, এদিকে জোয়ারও বুঝি আসিয়া পড়িল।

ভানুসিংহ

১২৮৪ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতী'তে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদ প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন কবির বয়স ১৬ বৎসর ৫ মাস। রচনা শুরু হয় নিশ্চয় আরও আগে। প্রথম পদটি কবে রচিত হইয়াছিল? কবি লিখিয়াছেন:

"একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলা দিনের ছায়াঘন আকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা স্লেট লইয়া লিখিলাম, 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে।' লিখিয়া ভারি খুশি হইলাম।"

এইটিই যে ভানুসিংহের প্রথম পদ তাহা উপরের উক্তি হইতে অনুমান করা যায়। পদটি লিখিয়া তিনি এত খুশি হইয়াছিলেন যে তখনই তাহা কাহাকেও শুনাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন এবং একজন বন্ধুকে[১] পড়িয়া শুনাইয়াও ছিলেন। 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে' ভানুসিংহের প্রথম পদ বলিয়া অনুমান করিবার ইহাও একটি কারণ।

'রবীন্দ্র জীবনী'র লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন "এই নূতন কবিতা লিখিত হয় ১২৮৪ সালের বর্ষাকালে—অর্থাৎ 'ভারতী' বাহির হইবার সময়ে।" তাঁহার অনুমান সংগত বটে। বর্ষাকাল বলিতে যদি আষাঢ় মাস ধরি, তাহা হইলে কবির বয়স তখন ১৬ বৎসর ২ মাস।

ভানুসিংহ ঠাকুর যে তাঁহারই নাম একথা প্রথমে কবি প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু এই আত্মগোপনের ইচ্ছা কেন হইল? সে সম্বন্ধে কবি বলেন:

"গাছের বীজের মধ্যে যে অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নিচে যে রহস্য অনাবিষ্কৃত তাহার প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল। আবরণ মোচন করিতে করিতে একটি অপরিচিত ভাণ্ডার হইতে একটি আধটি কাব্যরত্ন চোখে পড়িতে থাকিবে এই আশাতেই আমাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল।"

---

১. প্রবোধচন্দ্র ঘোষ

এই রহস্যের মধ্যে তলাইয়া দুর্গম অন্ধকার হইতে রত্ন তুলিয়া আনিবার চেষ্টায় যখন আছি তখন নিজেকেও একবার এইরূপ রহস্যাবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার একটা ইচ্ছা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।"

ইহা ছাড়া আত্মগোপনের আর এক কারণ আছে। তিনি অক্ষয় (চৌধুরী) বাবুর কাছে ইংরেজ বালক কবি চ্যাটার্টনের কাহিনী শুনিয়াছিলেন। চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের অনুকরণে এমন কবিতা লিখিতেন যে, অনেকেই তাহা ধরিতে পারেন নাই। এই বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহার মনে কৌতূহলের উদয় হইল। তিনি "কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত" হইলেন।

অনেকগুলি কবিতা লেখা হইল। অনুকরণ ধরা পড়ে কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য পূর্বোল্লিখিত বন্ধুকে বলিলেন, "সমাজের লাইব্রেরি খুঁজিতে খুঁজিতে বহু-কালের একটি জীর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ভানুসিংহ নামক কোনও প্রাচীন কবির পদ কপি করিয়া আনিয়াছি।" এই বলিয়া কবি ঐ পদগুলি পড়িয়া শুনাইলেন। শুনিয়া বন্ধু অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিলেন, "এ পুঁথি আমার নিতান্তই চাই। এমন কবিতা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের হাত দিয়াও বাহির হইতে পারিত না। আমি প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে ছাপিবার জন্য ইহা অক্ষয়বাবুকে দিব।"

তাহার পর কবি যখন নিজের খাতা দেখাইয়া স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিলেন যে এ পদগুলি সত্য সত্যই বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের হাত দিয়া বাহির হওয়া অসম্ভব কারণ ইহা তাঁহারই লেখা, তখন "বন্ধু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, 'নিতান্ত মন্দ হয় নাই'।"

এই সময়ে শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় জার্মানিতে ছিলেন। তিনি য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া ভারতীয় গীতিকাব্য সম্বন্ধে একটি পুস্তক লিখেন। তাহাতে প্রাচীন পদকর্তা-রূপে ভানুসিংহকে প্রচুর সম্মান দিয়াছিলেন। এই পুস্তক লিখিয়া তিনি ডাক্তার উপাধি পান। কবি তাঁহার প্রথম বয়সের রচনাগুলিকে পরিণত বয়সে নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, একথা সকলেই জানেন। কারণ এই পদাবলী 'বর্জিত' বয়সের একমাত্র অবর্জিত রচনা। অতএব ইহার বিস্ময়করতা সম্বন্ধে সংশয়ের কোনও অবকাশই থাকিতে পারে না।

অপরিণত রচনা মনে করিয়া কবি প্রথম বয়সের লেখা গ্রন্থগুলি পুনর্মুদ্রিত হইতে দেন নাই। ভানুসিংহের পদাবলী একমাত্র ব্যতিক্রম। কবি লিখিয়াছেন :

"আমার রচনার অবর্জিত অংশ অনেক দিন আমি প্রচ্ছন্ন রেখেছিলুম। তার অধিকাংশই অসম্পূর্ণ অপরিপক্ক।...... যে বয়স থেকে নিজের পরিচয় আমি নিজের স্বভাবেই প্রতিষ্ঠিত উপলব্ধি করেছি সেই বয়স থেকেই আমি সাহিত্যিক দায়িত্ব নিজের বলে স্বীকার করে নিয়ে সাধারণের বিচারসভায় আত্মসমর্পণ করতে আজ পর্যন্ত প্রস্তুত ছিলাম।"

ভানুসিংহের পদাবলী অধিকাংশ রচনা সেই বয়সের মধ্যে পড়িলেও কবি উহাকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে যত্নবান হন নাই। সুতরাং ঐ সময়কার অন্যান্য লেখা সম্বন্ধে তাঁহার বিতৃষ্ণা ও ঔদাসীন্য যতই গভীর হউক না কেন, ভানুসিংহ সম্বন্ধে ততটা ছিল না বুঝিতে হইবে। তথাপি সমালোচকের হাতে "ভানুসিংহ ঠাকুর" সাদর সম্মান লাভ না করিয়া 'পৃষ্ঠপোষণ' মাত্র পাইলেন কেন? সমালোচকগণের মতামতগুলি নির্বিচারে মানা যায় না বলিয়া বিচার করিবার চেষ্টা করা যাক।

সমালোচকগণের মধ্যে একজন ভানুসিংহের আলোচনা প্রসঙ্গে মাইকেলের ব্রজাঙ্গনা সম্বন্ধে যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিম্নলিখিত মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন :

"যে প্রেম-ভক্তির উচ্ছ্বাসে বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী উদ্গত হইয়াছিল, ব্রজাঙ্গনায় অবশ্য তাহা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। সে ভাবাবেশ বঙ্গসমাজ হইতে চলিয়া গিয়াছিল, তেমন ভাব আর কোথা হইতে উঠিবে?......ভক্ত ও প্রেমিক ভিন্ন আর কাহারও রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব লিখিবার অধিকার নাই। বৈষ্ণব কবিগণ একাধারে ভক্ত ও প্রেমিক ছিলেন, তাই তাঁহাদিগের নীতি মাধুর্য ও ভাবের সম্মিলনে মর্মস্পর্শী হইয়াছিল। মধুসূদন প্রেমিক হইলেও ভক্ত ছিলেন না। তাঁহার সংগীত কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করিলেও মর্মস্থল স্পর্শ করিতে পারে না।"

এ মন্তব্যটি উদ্ধার করিয়া সমালোচক নিজে মন্তব্য করিয়াছেন :

"ঐ উক্তি ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে।"

অতঃপর প্রমাণস্বরূপ জীবনস্মৃতি হইতে কবির নিজের মত তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এবং সে মত চৌদ্দ আনা স্বীকার এবং দুই আনা অস্বীকার করিয়া সমালোচক বলিয়াছেন :

"রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখাকে যে পরিমাণে খেলো প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা (তাহা অর্থাৎ সে পরিমাণ) যে নয়, তাহা পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। ভানুসিংহের পদাবলীর মধ্যেও অনেক কবিতায় গভীর ভাবাবেগ আছে, বিশেষ করিয়া......'মরণ' ও 'কো তুহুঁ'—বিশ্বকালীন কবিত্বে ও ভাবমাধুর্যে বিভূষিত।"

"রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিদের ছন্দ, ভঙ্গী, বলাকৌশল ঠিক আয়ত্ত করিয়াছিলেন ; সেই দিক দিয়া ভানুসিংহের দ্বারা যাঁহারা প্রতারিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের খুব অপরাধী করা যায় না ; বিষয়নির্বাচনেও তিনি পদকর্তাদের সার্থক অনুকরণ করিয়াছিলেন ;...তবে, বৈষ্ণব পদকর্তাদের একটা জিনিস রবীন্দ্রনাথ সে বয়সে ধরিতে পারেন নাই, কারণ, তাহা অনুকরণ করা যায় না। তাহা তাঁহাদের অনুভূত সত্য, তাঁহাদের ভাবের অকৃত্রিমতা। আমরা বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন, তাঁহার এই বয়সের সমস্ত রচনাই ভাবহীন, বস্তুহীন, কল্পলোকের সৃষ্টি। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'ও তাহা হইতে বাদ পড়ে নাই। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ পদকর্তাদের বহির্দিকটাই দেখিয়াছিলেন এবং সেই বহির্দিক তাঁহার মত প্রতিভার পক্ষে অনুকরণ করা কঠিন ছিল না; কিন্তু তাঁহাদের অন্তর্লোকের মধ্যে তিনি প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। সেই জন্যই 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' অন্য সকল দিক দিয়া সার্থক হইলেও কবিমনের সত্য পরিচয় ইহাতে নাই।..."

অকুণ্ঠ আত্মপ্রত্যয় না থাকিলে এই মত প্রচার করা রবীন্দ্র-সাহিত্যের কোনো সমালোচকের পক্ষে সম্ভব হইত না। আলোচ্য লেখকের সে আত্ম-প্রত্যয় অবশ্য আছে। কিন্তু অন্যের প্রত্যয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথের উক্তি ভিন্ন আর কোনো প্রমাণ তিনি উপস্থাপিত করেন নাই, প্রথম সমালোচকও নয়। প্রথম সমালোচকের বক্তব্য, রবীন্দ্রনাথ প্রেমিক হইলেও ভক্ত নহেন। যথার্থ ভক্তভিন্ন রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব লিখিবার অধিকারী হইতে পারেন না। অনধিকারী হইয়াও সেই কার্যে হস্তক্ষেপ করার ফলে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' মর্মস্পর্শী হইতে পারে নাই।

আর দ্বিতীয় সমালোচকের উক্তির তাৎপর্য, বৈষ্ণব কবিগণের 'অনুভূত সত্য' এবং 'ভাবের অকৃত্রিমতা' ঐ পদাবলীর মধ্যে নাই।

বৈষ্ণব কবিদের 'অনুভূত সত্য' ও 'ভাবের অকৃত্রিমতা'—যাহার অভাবে ভানুসিংহ ঠাকুরের কবিতায় 'মেকি'ত্ব ধরা পড়িয়া গিয়াছে—বস্তুটা কি? বৈষ্ণব পদের সহিত ভানুসিংহের পদের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া দেখাইলে সেটা আমাদের পক্ষে সুবোধ্য হইত। কিন্তু সমালোচকগণ গ্রন্থ মধ্যে এরূপ আলোচনা দেন নাই। অতএব আমরা একবার সেই চেষ্টা করিয়া দেখি।

বৈষ্ণব কবি বলিলে তো অনেকের নামই আসে। জয়দেব (বাঙ্গালা পদ লিখেন নাই, তবু তাঁহাকে বাদ দেওয়া যায় না), চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি[১], জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, যদুনন্দন প্রভৃতি কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে ধরিব? ইঁহারা তো সকলেই ভক্ত কবি। ইঁহাদের রচনার মধ্যে একটা 'অন্তর্লোক' অবশ্যই আছে। কিন্তু যে "অন্তর্লোকের মধ্যে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) প্রবেশাধিকার পান নাই" সেই অন্তর্লোকটা তো জানা আবশ্যক।

'আধ্যাত্মিক' শব্দটা একটু অস্পষ্ট—একটু আবছায়া রকমের। ব্যাখ্যার নয়, উহা অনুভূতির জিনিস। বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যেও যখন আধ্যাত্মিকতার কথা উঠে, তখন শুনিতে পাই, বৈষ্ণবের গান ভক্তির সাম্রাজ্য। সেখানে রাধা ও কৃষ্ণের যে সম্বন্ধ, তাহা বাহ্যত নরনারীর সম্বন্ধরূপে চিত্রিত হইলেও আসলে জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্বন্ধেরই রূপক স্বরূপ। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,—

"অর্থ, নাম, খ্যাতি এবং এই তুচ্ছ সংসারের আসক্তি পরিত্যাগ না করিলে গোপীগণের প্রেমতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে না। সর্বস্ব বিসর্জন না করিলে আত্মাকে একান্ত বিশুদ্ধ না করিলে সেই অতি নির্মল অতি পবিত্র প্রেমের তত্ত্ব অনুভব করা অসম্ভব। অর্থ, যশ এবং ইন্দ্রিয় বিষয়ক ধারণায় যাহাদের মন পঙ্কিল, গোপী-প্রেমের সমালোচনা করিয়া তাহার তত্ত্ব বুঝিবে এমন দুঃসাহস তাহারা কিরূপে পোষণ করে।"

---

১. মৈথিলী হইলেও বাঙ্গালা পদসাহিত্যে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত

স্বচক্ষে দেখিয়াছি, 'রতিসুখসারে গতমভিসারে' পদ গীত হইতে শুনিয়া ভক্ত শ্রোতাশ্রোত্রীর দল বিগলিত ধারে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। অথচ আমরা, যাহারা অর্থ এবং নাম এবং খ্যাতি—এবং এই অকিঞ্চিৎকর সংসারটার পর্যন্ত আসক্তি পরিত্যাগ করিতে অক্ষম, বুঝিতে পারি না ইহার মধ্যে ভাবাবেগের কারণটা কোন্ খানে। 'পীন-পয়োধর-পরিসর-মর্দন-চঞ্চল-করযুগ-শালী' যে বনমালী, তিনি যমুনার তীরে অপেক্ষা করিতেছেন। অতএব হে নিতম্বিনী গমনে আর বিলম্ব করা বিহিত নয়। কাব্য হিসাবে ইহার প্রশংসা করিতে কেহই দ্বিধা করে না, কিন্তু সহজিয়া সাধনপথের পথিক ভিন্ন ইহার অন্তর্লোকের সন্ধান করিবে কে?

বৈষ্ণব পদের মধ্যে গভীর তত্ত্বকথা থাকিতে পারে। কোনো কোনো কবি হয়তো সত্যসত্যই স্ব স্ব ঐশ্বরিক উপলব্ধি রাধাকৃষ্ণ-লীলার ছদ্মবেশে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সেদিক দিয়া বিচার করিলে বিপদ বিস্তর।

কারণ, যেমন ধর্মের তেমনি গানেরও তত্ত্ব অনেক ক্ষেত্রেই 'নিহিতং গুহায়াম্'। যেখানে তত্ত্ব নাই গানই আছে, সেখানেও তত্ত্ব খুঁজিয়া পাইবার ভয় আছে। তাহাতে সাধককে সন্ধান করিতে গিয়া কবিকে হারাইব। তাহা ছাড়া "তত্ত্ব যখন রূপকের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে, তখন তো আপন তত্ত্বরূপ গোপনই করে। বাহ্যরূপেই সে সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া থাকে রাধাকৃষ্ণের রূপকের মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে, যাহা বাঙলার বৈষ্ণব অবৈষ্ণব, তত্ত্বজ্ঞানী ও মূঢ় সকলেরই পক্ষে উপাদেয়। এই জন্যই তাহা ছড়ায়, গানে, যাত্রায় কথকতায় পরিব্যাপ্ত হইতে পারিয়াছে।" [২]

কাব্যের প্রধান অবলম্বন প্রেম—নরনারীর প্রেম। পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত্যেই এই প্রেমের সৌন্দর্যকে নব নব রূপে রঞ্জিত করিয়া নব নব রসে অভিষিক্ত সাধনা অঙ্কিত করা হইয়াছে। যাহা চিরকালের পুরাতন তাহাকে চিরনবীন করিয়া তাহার মোহকরতাকে সঞ্জীবিত রাখা হইয়াছে।

১, The Sages of India, Swami Vivekananda—Madras Lectures

২, গ্রাম্য-সাহিত্য

"কাব্যের পক্ষে এমন সামগ্রী আর দ্বিতীয় নাই। ইহা একই কালে সুন্দর এবং বিরাট, অন্তরতম এবং বিশ্বগ্রাসী, লৌকিক এবং অনির্বচনীয়।" [১] অথচ সমাজ ইহার প্রচণ্ডতাকে ভয় করে বলিয়া ইহাকে শাসনদণ্ডে সংযত রাখিতে চায়। ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া স্ত্রীপুরুষের স্বাধীনভাবে মেলামেশার অবসর অল্প। ভারতের সামাজিক বিধিবিধান স্ত্রীপুরুষের স্বাধীন মিলনের অনুকূল নহে। তাই স্বভাবের রুদ্ধবেগ অনেক সময় গোপন প্রণালীর পথ বাহিয়া সমাজের তলদেশে বিষকুণ্ডের সৃষ্টি করে। আর কখনও বা চিত্রে, ভাস্কর্যে, সাহিত্যে রূপান্তরিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। মূলতঃ অভিন্ন হইলেও শিক্ষা রুচি ও সংস্কৃতি অনুসারে এই মানবীয় প্রেমের বিচিত্র প্রতীক বিচিত্র রূপ ধরিয়া দেখা দেয়।

যে উদ্দাম প্রবৃত্তিকে সমাজ কণ্ঠরোধ করিয়া দমন করিতে চায় সমাজের চোখে ধূলি দিয়া মানুষ সেই প্রবৃত্তিকে নূতন সাজে নূতন নামে সমাজের বুকের উপরেই প্রতিষ্ঠিত করে। তোমার আমার কথা বলিলে যে সমাজ দণ্ড তুলিয়া ধরিত, সেই কথার উপরে যখন দেবদেবীর নাম চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইল, তখন দণ্ডধারী বিচারকও মাথা হেঁট করিয়া বসিলেন।

নরনারীর প্রেমের একটি মোহিনী শক্তি আছে। সে শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে এমন ক্ষমতা সাধারণ মানুষের নাই, অসাধারণ মানুষের যদি থাকে তো তাহাও সামান্য। তাহার কাছে মাথা যখন হেঁট করিতেই হইল, তখন মোহকে মহত্ত্ব দিয়া ভূমিকে ভূমা কল্পনা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এই কারণেই আধ্যাত্মিক ভাবুকরা এই শক্তিকে অধ্যাত্ম শক্তির রূপক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং সাধনার দ্বারা কেহ কেহ তাহা অনুভবও করিয়া থাকিবেন।

ভাবপ্রধান বাঙ্গালাদেশে এইটার বাহুল্য দেখা দিয়াছিল। তাই বাঙ্গালী গীত রচনা করিতে গেলেই কানুকে ছাড়িতে পারিত না। আদি রসের গান রচনা করিতে গেলেই রাধাকৃষ্ণের মার্কা মারিয়া সে স্বর্গে তোলার কৌশলটা সহজেই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। তাহার ফলে কে আসল কে নকল, কোন্

---

১. গ্রাম্য-সাহিত্য

রাধাকৃষ্ণ জীবাত্মা পরমাত্মার সম্বন্ধ প্রদর্শনে কল্পিত আর কোন্ রাধাকৃষ্ণ সাধারণ মানবমানবীরই প্রতীকরূপে কল্পিত তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

এই প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি :

"এখনও আমাদের দেশে দেখা যায়, আদি রসের গান লিখিতে গেলেই লোকে রাধাকৃষ্ণেরই নাম করে। একদিন দেখিয়াছিলাম, জনদশেক কয়েদী লইয়া দুইজন কনস্টেবল নির্জন রাস্তা দিয়া জেলের দিকে যাইতেছে।...আমিও সেই পথ দিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু সকলের পিছনে। একজন কনস্টেবল একজন কয়েদীকে ডাকিয়া বলিল, 'ওরে এই সময় তুই একটা গান গা'। সেখানে বাদ্যও নাই, ভাণ্ডও নাই, বাদ্যের মধ্যে তুড়ি। কয়েদী গান ধরিল, তাহাদেরও বাজনা তুড়ি। গানটা আমার বেশ মনে আছে, সেটা এই :

আজকে যদি থাকৃত আমার শ্যাম,
ধান ভানতে গিয়ে যখন
পড়ত মাথার ঘাম,
আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিত
করৃত কত কাম।

এখানে শ্যাম নাম শুনিয়া আমার বেশ বোধ হইল, আমাদের দেশের কবিরা আদি রসের গান লিখিতে গেলেই রাধাকৃষ্ণের দোহাই দিতেন। নিজের মনের ভাব ছল করিয়া রাধাকৃষ্ণের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতেন।"

শাস্ত্রী মহাশয়ের মন্তব্য যুক্তি ও প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, কেবলমাত্র ভাবুকতার জোরে তাহা উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। এ অবস্থায় বহুশত রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গানের মধ্যে ভক্ত বৈষ্ণবের 'অনুভূত সত্য' ও 'ভাবের অকৃত্রিমতা' কোন্ কোন্ গানে আছে তাহা কে দেখাইয়া দিবে?

রাধাকৃষ্ণের নাম আছে বলিয়াই বৈষ্ণবরচিত পদমাত্রকেই অকৃত্রিম ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ অথবা ভক্তহৃদয়ের অনুভূত সত্য সংস্পর্শে অপার্থিব মনে করিবার কারণ নাই। পদাবলী সংগ্রহে যে সকল কবির পদ আছে, তাঁহারা সকলেই যে ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন তাহার কোনও প্রমাণ আছে কি? অথচ কবিত্বের মানদণ্ডে বিচার করিলে বহুশত পদকেই শ্রেষ্ঠ কবিতার পর্যায়ে স্থান দিতে হয়। "বস্তুতঃ আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণের কথায়

সৌন্দর্যবৃত্তি…চর্চা হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে ধর্মপ্রবৃত্তির অবতারণা হয় নাই।”—এইটুকু স্মরণ রাখিলে অনেক অনাবশ্যক বিপত্তির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

ভানুসিংহ ঠাকুরকে যখন বিচার করিব, তখন তাঁহার কবিতায় কবিত্ব কি পরিমাণ আছে, তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করাই সমালোচকের কর্তব্য। সে কাজটাও সহজ নয়, কিন্তু অধ্যাত্মভাবের সন্ধান করা ততোধিক দুরূহ। বালকের লেখা বলিয়া কৃপণ মনোভাব লইয়া বিচার করিতে গেলে কবির প্রতি সুবিচার করা হইবে না।

স্বয়ং বিদ্যাপতি ঠাকুরের কথাই ধরা যাক। কিছুকাল আগে পর্যন্ত লোকে বিদ্যাপতিকে পরম বৈষ্ণব বলিয়া জানিত। কিন্তু আজ প্রমাণিত হইয়াছে তিনি পরম বৈষ্ণব তো ছিলেনই না, তাঁহার মধ্যে বৈষ্ণবত্ব ঠিক কতটা পরিমাণে ছিল তাহাও বলা কঠিন। “বিদ্যাপতিকে আমরা প্রধানত তিন মূর্তিতে দেখিতে পাই। এক মূর্তিতে তিনি পণ্ডিত, সংস্কৃত সাহিত্যে খুব ব্যুৎপন্ন, তিরহুতের রাজাদের একজন প্রধান সভাসদ এবং হিন্দু সমাজের পুনর্গঠনে কৃতসংকল্প। আর এক মূর্তিতে দেখি তিনি কবি, কবির চক্ষে জগৎ দেখিতেছেন, আদি রসের পদ লিখিতেছেন এবং সময়ে সময়ে ভক্তির উচ্ছ্বাসে গদগদ হইতেছেন। তাঁহার আরও এক মূর্তি আছে, তিনি ইতিহাস লিখিতেছেন। বিদ্যাপতি সংস্কৃতে যে বই লিখিয়াছেন, তাহাতে স্মৃতি অর্থাৎ হিঁদুয়ানি তো আছেই, তার উপর শিব আছেন, দুর্গা আছেন, গঙ্গা অছেন, কৃষ্ণ একেবারেই নাই। আবার মৈথিল ভাষায় যে গান লিখিয়াছেন, তাহাতে শিবও আছেন, সেই সঙ্গে দুর্গাও আছেন, গঙ্গাও আছেন, বেশীর ভাগ কৃষ্ণরাধা আছেন। ইহার অর্থ কি? যখন পণ্ডিত হইয়া লিখিতেছেন, তখন কৃষ্ণের নামও করেন নাই। কিন্তু যখন মৈথিলী লিখিতেছেন, তখন রাধা ও মাধবে ভরপুর।…যেখানে আদি রসের গান লিখিতেছেন সেইখানেই রাধা ও কৃষ্ণের নাম বেশী। আদি রসের গান লিখিতে গেলেই যেন রাধাকৃষ্ণ আপনিই আসিয়া পড়িয়াছে।”

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা একথা বিশেষরূপেই অবগত আছেন যে, ভারতের আধুনিক ভাষাসমূহ দেশের

পণ্ডিত সমাজের কাছে যথাযোগ্য সম্মান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পায় নাই। বিদগ্ধমণ্ডলীর মধ্যে সংস্কৃতেরই প্রচলন ছিল। আর জনসাধারণ সাহিত্য সৃষ্টির তৃষ্ণা মিটাইত আপন আপন প্রাদেশিক ভাষায় কাব্য রচনা করিয়া কি হিন্দী, কি বাঙ্গালা, কি মৈথিলী, কি গুজরাটী-মারাঠী সকল ভাষাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছে। বিদ্যাপতি স্মার্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, সংস্কৃতে তাঁহার অগাধ অধিকার ছিল। তাঁহার পক্ষে মৈথিলী ভাষায় কবিতা লেখা অনেকটা অবসর বিনোদনের উপায়মাত্র ছিল, এরূপ অনুমান করিলে সম্ভবতঃ অসংগত হইবে না। হাল্‌কা সাহিত্য রচনার জন্যই তিনি মাতৃভাষায় হাত দিয়াছিলেন এবং রাধাকৃষ্ণকে তাহারই উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সরস কবিতা তাঁহার হাত দিয়া বাহির হইতে দেখিয়া রাজার সভাসদেরা এবং বন্ধুবান্ধবেরা হয়তো মাঝে মাঝে ধরিয়া বসিত—অমনি কবি দুটা একটা গান বাঁধিয়া দিতেন। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন :

"তিনি ছিলেন রাজকবি রাজপারিষদ। রাজারা বা রাজসভাসদেরা যেমন ফরমাইস করিতেন, তিনি তেমনই গান লিখিতেন এবং তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিবার জন্য তাঁহাদের এবং তাঁহাদের পরিবারের নাম সেই সঙ্গে জুড়িয়া দিতেন। রাজসভায় খুব একটা আমোদ হইত। অনেক সময়ই তাঁহাকে ফরমাস-কর্তাকে শ্যাম সাজাইতে হইত এবং তাঁহার সোহাগিনীকে রাধা সাজাইতে হইত। তাই করিয়াই বিদ্যাপতির এত আদি রসের গান সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি কীর্তন লিখিতেও বসেন নাই, রাধাকৃষ্ণের প্রেম লইয়া বই লিখিতেও বসেন নাই। গানগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের ফরমাইস মত লেখা হইয়াছিল। ইদানীন্তন বৈষ্ণবেরা যে রসে যেটি খাটে কীর্তনে সেইটিকে সেইখানে বসাইয়া দিয়াছেন এবং বিদ্যাপতিকে বৈষ্ণব কবি সাজাইয়া তুলিয়াছেন। এমন কি সহজিয়াও করিয়া তুলিয়াছেন।"

আজ ভানুসিংহ ঠাকুরের পরিচয় যদি আমাদের কাছে অপরিজ্ঞাত বা অস্পষ্ট থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার পদগুলিও যে পদকর্তাকে বৈষ্ণব কবির আসনে বসাইত না, এমন কথা জোর করিয়া কে বলিবে? বিদ্যাপতি

শ্রীরাধার বসন্তকালোচিত বিরহ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য রাধার নাম কোথাও নাই।

ফুটল কুসুম কুঞ্জকুটীর বন
কোকিল পঞ্চম গাওই রে।
মলয়ানিল হিম শিখরে শিধারল
পিয়া নিজ দেশে না আইও রে॥
চাঁদচন্দন তনু অধিক উতাপই
উপবনে অলি উতরোল।
সময় বসন্ত কান্ত রহু দূরদেশ
জানল বিহি প্রতিকূল॥
অনিমিখ নয়নে নাহ-মুখ নিরখিতে
তিরপিত না হয় নয়ান।
এ সুখ সময়ে সহয়ে এত সঙ্কট
অবলা কঠিন পরাণ॥
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু হিমে কমলিনী জনু
না জানি কি হৈ পরিবন্ত।
বিদ্যাপতি কহ ধিক্ ধিক্ জীবনে
মাধব নিকরুণ অন্ত॥

পাশাপাশি ভানুসিংহের অনুরূপ একটি পদ শুনাই।

বসন্ত আওল রে!
মধুকর গুন গুন অমুয়া মঞ্জরী
কানন ছাওল রে।
শুন শুন সজনী হৃদয় প্রাণ মম
হরখে আকুল ভেল,
জর জর রিঝসে দুখ জালা সব
দূর দূর চলি গেল।
মরমে বহই বসন্ত-সমীরণ,
মরমে ফুটই ফুল,

মরম-কুঞ্জ 'পর বোলই কুহু কুহু
অহরহ কোকিল কুল ॥
সখিরে উছসত প্রেমভরে অব
ঢল ঢল বিহ্বল প্রাণ,
নিখিল জগত জনু হরখ-ভোর ভই
গায় রভসরস গান।
বসন্তভূষণ ভূষিত ত্রিভুবন
কহিছে দুখিনী রাধা,
কঁহিরে সো প্রিয় কঁহি সো প্রিয়তম
হৃদি বসন্ত সো মাধা ॥
ভানু কহত অতি গহন রয়ন অব,
বসন্ত সমীর শ্বাসে
মোদিত বিহ্বল চিত্ত কুঞ্জতল
ফুল্ল বাসনা-বাসে।

বিদ্যাপতির রাধা বিরহে ক্ষীণ তনু। চাঁদচন্দনে তাঁহার দেহে উত্তাপ বৃদ্ধি করে। এই বসন্ত সময়ে কান্ত দূরদেশে অবস্থান করায় তিনি বুঝিতেছেন বিধাতা তাঁহার প্রতিকূল। কুঞ্জবনে নূতন ফুল ফুটিয়াছে, উপবনে অলিকুল উতরোল জুড়িয়াছে। কোকিল পঞ্চমে গান ধরিয়াছে—এ অবস্থায় প্রিয়-বিরহিত জীবনযাপন বিদ্যাপতির রাধার পক্ষে সঙ্কটস্বরূপ।

ভানুসিংহের রাধার অবস্থা কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। ত্রিভুবনে বসন্তের আবির্ভাব হইয়াছে। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি আজ আনন্দে পরিপূর্ণ। সেই বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দসুর রাধার অন্তরবীণার তারে সমান সুরে ঝংকার তুলিয়াছে। বসন্ত ভূষিত এই যে বসুন্ধরা পুষ্পে-পল্লবে সৌরভে-সৌন্দর্যে শোভায়-সংগীতে কাননভূমিকে উৎসবের মিলনবাসরে পরিণত করিয়া বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশে দুই ব্যাকুল বাহু উদ্যত করিয়া বলিতেছে, "কঁহিরে সো প্রিয়, কঁহি সো প্রিয়তম" রাধার হৃদয়কুঞ্জতলে সেই বাণীরই প্রতিধ্বনিরূপে গুঞ্জরিত হইয়া উঠে, "কঁহিরে সো প্রিয় কঁহি সো প্রিয়তম।" রাধার স্বতন্ত্র সত্তা নাই। বিশ্বনাথের উৎসবমুখর বিশ্বভুবন রাধার হৃদয়কুঞ্জবনে মূর্তি পাইয়াছে। আজ

তাহার তনু ক্ষীণ হইল কিনা, সে কথা ভাবিবার অবসর নাই। চাঁদচন্দনে তাহার দেহতাপ বৃদ্ধি পাইল কিনা, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিবার অবকাশ নাই। নিষ্ঠুর বিধাতা দয়িতকে আনিয়া দিলেন না বলিয়া তাঁহার প্রতি অভিমান নাই। কোরকের কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া পুষ্পসৌরভ যখন প্রভাতের অরুণালোকের মধ্যে মুক্তি পাইবার জন্য ব্যগ্র হয়, তখন সে কি তাহার বদ্ধ জীবনের জন্য বিধাতার প্রতি দোষারোপ করে? তখন সে কি তার ক্ষীণদেহের দিকে বারংবার তাকাইয়া আক্ষেপ করে? ঐ ফুলটিও যেমন বিশ্বপ্রকৃতির মূর্তি ভানুসিংহের রাধাও তেমনি। তাই জগতে বসন্ত যখন আসে তখন সে দেহের দ্বারে আঘাত করিয়া যায় না।

মরমে বহই বসন্তসমীরণ
মরমে ফুটই ফুল।

রাধার বসন্ত বাহিরে নয় অন্তরে। তাহার ফুল কুঞ্জবনে ফুটে কি ফুটে না তাহার খবর কে লয়, কিন্তু "মরমে ফুটই ফুল।" কোকিলের কুহুতান যদি সে বাহিরে শুনিয়া থাকে তো সে কথা সে ভুলিয়া যায়। সে শুনিতে পায়—

মরম-কুঞ্জ 'পর বোলই কুহু কুহু
অহরহ কোকিল কুল।

ঐ সঙ্গে ব্রজাঙ্গনার রাধার অবস্থাও লক্ষ্য করিয়া দেখা যাক। তাঁহার জীবনেও বসন্তের আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

বন অভিরমিত হইল ফুল ফুটনে
পিককুল কল, কল, চঞ্চল অলিদল
উছলে সুরবে জল

সুতরাং রাধা সখীকে ডাকিয়া বলিতেছেন:

চল লো বনে।
চল লো জুড়াব আঁখি দেখি ব্রজরমণে!

অতঃপর কিরূপে মিলনোৎসব সম্পন্ন হইবে তাহারই বিবরণচ্ছলে রাধা বলিতেছেন:

পাত্তরূপে অশ্রুধারা দিয়া ধোব চরণে !
দুই কর কোকনদে পূজিব রাজীব পদে ,
শ্বাসে ধূপ, লো প্রমদে, ভাবিয়া মনে !
কঙ্কণ কিঙ্কিণী ধ্বনি বাজিবে লো সঘনে !
সখী রে,—
এ যৌবন ধন দিব উপহার রমণে !
ভালে যে সিন্দুর বিন্দু, হইবে চন্দন বিন্দু,—
দেখিব লো দশ ইন্দু স্তনগগণে
চিরপ্রেম বর মাগি লব, ওলো ললনে।

[২]

মধুসূদনের রাধা অতিশয় ধৈর্য ধরিয়া বিরহ-বিভাবরী অতিক্রম করিয়াছেন, আর তিনি থাকিতে পারিতেছেন না। প্রিয়সঙ্গমোৎসুক তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই অবস্থাতেও শ্রীরাধিকা নিজের রূপ যৌবন প্রসাধন প্রভৃতি সম্বন্ধে চৈতন্য হারান নাই। তাঁহার নিজের দুইটি কর যে কোকনদসদৃশ আর তাঁহার শ্বাসবায়ু যে সৌরভময়—সুতরাং কৃষ্ণপূজার বিশিষ্ট উপকরণ এ সম্বন্ধে তাঁহার সংশয় নাই। তিনি স্বীয় "যৌবনধন" শ্রীকৃষ্ণকে "উপহার" দিবেন। মুখে উপহার বলিয়াছেন বটে, কিন্তু আসলে তাহা উৎকোচ। কারণ এত সব যে করা হইতেছে কোনটাই নিঃস্বার্থ ভাবে নয়। এই সব করিয়া

চিরপ্রেম বর মাগি লব, ওলো ললনে।

ব্রজাঙ্গনা-রাধা যৌবনধন উপহারের পরিবর্তে শ্যামের কাছে চিরপ্রেম বর প্রার্থনা করিবেন বলিয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। বিদ্যাপতির রাধা প্রিয়বিরহে বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছেন, চন্দ্রচন্দনে তাঁহার হৃদয়দাহ বৃদ্ধি পাইতেছে। আর ভানুসিংহ ঠাকুরের রাধা ? ত্রিভুবন বসন্তের যে অভ্যুদয়, তাহা তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিল। তাঁহার হৃদয় হইতে দুঃখ জ্বালা সব অন্তর্হিত হইল, মর্মকুঞ্জে পুষ্প-বাটিকায় কুসুমদল বিকশিত হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে আর কোন দুঃখ নাই, আর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই—সেই মাধব—হৃদয়-বসন্তস্বরূপ সেই মাধব—তিনি আসিলেই হইল। তিনি না আসার জন্য কি হইল, কি না হইল, এবং

আসিলে পরে কি হইবে, কি না হইবে, সে কথা ভাবিবার মত মনের অবস্থা তাঁহার নয়। তাঁহার সমগ্র অন্তর উন্মথিত করিয়া শুধু একটি জিজ্ঞাসা ধ্বনিত হইতেছে :

কঁহিরে সো প্রিয়, কঁহি সো প্রিয়তম
হৃদি-বসন্ত সো মাধা?

কিন্তু সে যাই বল, ভানুসিংহ যে ছেলেমানুষ, তাঁহাকে যে আমরা জানিয়াছি, চিনিয়াছি, তিনি যে আমাদের ঘরের লোক—এবং সর্বোপরি তিনি যে নিজেই নিজেকে বাতিল করিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাপতির যে পদে রাধাকৃষ্ণের নামগন্ধও নাই, সে পদেও বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবতার স্পর্শ অনুভব করেন। উদাহরণস্বরূপ একটি পদ উদ্ধৃত করি :

আজু মঝু শুভদিন ভেলা।
কামিনী পেখলুঁ সনান ক বেলা॥
চিকুর গরয়ে জলধারে।
মেহ বরিস জনু মোতিমহারে॥
বদন পোহল পর ছুরে।
মাজি ধরল জনি কনক মুকুরে॥
তেঁই উদসল কুচজোরা।
পলটি বৈঠাওল কনক কটোরা॥
নীবিবন্ধ করল উদেস।
বিদ্যাপতি কহ মনোরথ সেস॥

আর একটি পদ :

কামিনী করএ সনানে।
হেরিতে হৃদঅ হনএ পচবানে॥
চিকুর গরএ জলধারা।
জনি মুখশশি ডরে রোঅএ অন্ধারা॥
কুচযুগ চারু চকেবা।
নিঅকুল মিলত আনি কোন দেবা॥

তেঁ সঞে ভুজপাসে
বাঁধি ধএল উড়ি জাএত অকাসে ॥
ভিতল বসন তনু লাগু
মুনিহুক মানস মনমথ জাগু ॥
ভনই বিদ্যাপতি গাবে
গুণমতি ধনী পুনমত জনি পাবে ॥

রাধা না থাকিলেও সেখানে রাধা আসেন, শ্রীকৃষ্ণ না থাকিলেও তাঁহার কল্পনায় বাধা হয় না।

নব কুচে নখ দেখি জীউ মোর কাঁপে
জনু নব কমলে ভ্রমর করু ঝাঁপে ॥
টুটল গীমক মোতিম্ হার।
রুধিরে ভরল কিয়ে সুরঙ্গ পঙার ॥
সুন্দর পয়োধর নখক্ষত ভারি
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারি ॥
পুন না যাইহ ধনি সো পিয়া ধাম।
জীবন রহিলে পুরাইহ কাম ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সুন্দরি আজ
আনন্দে পড়িলে পুন আনন্দে কাজ ॥

এই যে কয়টি পদ ইহার মধ্যে রাধাও নাই, কৃষ্ণও নাই। কিন্তু ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে বিদ্যাপতির নাম, বিদ্যাপতির ভাষা এবং বিদ্যাপতির ছন্দ—এই যথেষ্ট।

কিন্তু ভক্ত বৈষ্ণবের দৃষ্টিকোণ দিয়া যদি না দেখি, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? বিদ্যাপতির পদে আধ্যাত্মিকতা আছে কি নাই, অপার রহস্যময় রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব সে পদের মধ্যে পাওয়া যায় কিনা, এ বিচার নাই বা করিলাম। তিনি কবি কিনা, সেইটাই তো দেখার কথা। তাঁহার রচিত পদ পাঠ করিয়া রসিকজন কাব্যরসের আস্বাদ লাভ করেন কিনা, তাহাই তো বিচারের বিষয়। আমরা জানি, রসবিচারের ক্ষেত্রে বিদ্যাপতির কবিতা অপরাজেয়। আধুনিক ভারতীয় ভাষায় গীতি-কবিতার ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি একটি মহোচ্চ আসন অধিকার

করিয়া আছেন, এ সম্বন্ধে কাহারও সংশয় নাই। ভানুসিংহ ঠাকুরকেও যদি আধ্যাত্মিকতার দিক হইতে না বিচার করিয়া শুধু কবিত্বের দিক দিয়াই দেখি, যদি তাঁহার পদ পড়িয়া মনে আনন্দের উদ্রেক হয়, যদি তাঁহার বাক্যে সত্যই রসাত্মকতা থাকে, তবে বলিতে কুণ্ঠাবোধ করি কেন? এ রচনা "ভাবহীন বস্তুহীন কল্পলোকের সৃষ্টি" বলিয়া একপাশে সরাইয়া রাখি কেন? কাঁচা বয়সের লেখা হওয়াটাই কি অপরাধের? কাঁচা হাতের পরিচয় কোথায়?

শাস্ত্রজ্ঞ আচারনিষ্ঠ স্মার্ত ব্রাহ্মণের রচিত আদিরসের কবিতাগুলিকে আমরা কি ভাল কবিতা বলিয়া এতদিন ভালবাসিয়া আসিয়াছি, না, রাধাকৃষ্ণের তত্ত্ববিষয়ক পদ বলিয়া সমাদর করিয়াছি? যদি বলি ভাল কবিতা বলিয়া ভালবাসিয়াছি, তাহা হইলে ভানুসিংহকেও বাদ দিবার উপায় নাই। আর যদি বলি, রাধাকৃষ্ণের লীলার কথা আছে বলিয়াই বিদ্যাপতির পদ আমাদের প্রিয়, তাহা হইলে বলিব, বিদ্যাপতির অনেক পদে রাধাকৃষ্ণের নাম না থাকা সত্ত্বেও আমরা মুগ্ধভাবে সে পদ গান করিয়া আসিতেছি, ভানুসিংহের কবিতা সে সকল পদের তুলনায় অনাধ্যাত্মিক হইল কিভাবে?

আমরা বৈষ্ণব বলিতে যাহা বুঝি, বিদ্যাপতি সে হিসাবে বৈষ্ণব ছিলেন না। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন সুখের কবি, ভোগের কবি। চণ্ডীদাসের সঙ্গে তাঁহার তুলনা করিয়া দেখিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে। চণ্ডীদাস সহজ কথার কবি, সহজ ভাষার কবি। গভীর অনুভূতির কথা কাহাকে বলে, তাহা দেখিতে হইলে চণ্ডীদাসের কবিতার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। বিদ্যাপতির মত বাগ্‌বিন্যাস, জয়দেবের মত কোমলকান্তি তাহাতে নাই, কিন্তু বিরহিণীর মর্মবেদনা তাহাতে অকপটভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের রাধা বিরহ বেদনায় কাতর হইয়া চন্দ্র-চন্দনকে অভিশাপ প্রদান করেন না, আবার প্রিয়তমকে নিকটে পাইলেই বিরহ-জ্বালা একেবারে ভুলিয়া যান না। বিদ্যাপতির রাধা বিরহে ব্যাকুল হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের রাধা শ্যামচাঁদকে নিকটে পাইয়াও সুস্থির নহেন। তাঁহার প্রেমিকপ্রেমিকা—

দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।

তাঁহার রাধা—নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি।

শ্যামকে নিকটে পাইয়াও তাঁহার আশঙ্কা যায় না—

এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে,
না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি ছুটে।

বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকেই সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি।···বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে, মিলনে সুখ বিরহে দুঃখ, কিন্তু চণ্ডীদাসের হৃদয় আরও গভীর। তিনি উহা অপেক্ষা আরও অধিক জানেন।" তাঁহার প্রেম সুখ-দুঃখে জড়িত। তাঁহার মুরলীর ধ্বনিও বিষামৃতে মিশ্রিত।

কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী,
সুখ দুঃখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি,
দুখ যায় তার ঠাঁই॥
শ্যামের প্রেম সে তো সুলভ বস্তু নয়।
যেন মলয়জ ঘষিতে শীতল, অধিক সৌরভময়।
শ্যাম-বঁধুয়ার পিরীতি ঐছন
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥

"দুঃখের পাষাণে ঘর্ষণ করিয়া প্রেমের সৌরভ বাহির করিতে হয়। যতই ঘর্ষিত হইবে, ততই সৌরভ বাহির হইবে।

এমন প্রেমের কল্পনা বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যেও কয়জন করিয়াছেন? প্রিয়বিরহে যাঁহারা দুঃখ পান এবং প্রিয়মিলনেই যাঁহাদের দুঃখ অবসিত হয়—তাঁহারা প্রেমের জন্য এত কষ্ট সহ্য করিতে পারেন না। কিন্তু প্রেমকে যাহারা জগতেরও ঊর্ধ্বে স্থান দেয়, যাহারা প্রেম এবং প্রাণকে তুলাদণ্ডে মাপিয়া প্রেমকেই ভারী দেখে, তাহারা প্রেমের জন্য সব সয়।

ভানুসিংহের রাধাকে চণ্ডীদাসের রাধার পাশে বসাইয়া তুলনা করিয়া দেখা যাক, কারণ ভানুসিংহের রাধাও প্রেমকে অবিমিশ্র সুখ বলিয়া স্বীকার করেন না।

ভানুসিংহের রাধারও ঐ ভাব :

বাঁশরিধ্বনি তুহ অমিয় গরল রে
হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরল রে
আকুল কাকলি ভুবন ভরল রে,
উতল প্রাণ উতরোয়।

অতি গভীর যে সুখ, তাহা আনন্দে উজ্জ্বল নয়, বিষাদের সংমিশ্রণে তাহা প্রশান্ত সুস্থির। সে প্রেম মানুষকে ইন্দ্রিয়-জগতের মধ্য হইতে কিছুদূরে লইয়া গিয়া অতীন্দ্রিয়ের সান্নিধ্য দান করে। সে গভীর প্রেম-সমুদ্রে সমস্ত হৃদয়-মন মগ্ন হইয়া যায়। প্রেমময়ের নাম জপ করিতে করিতে তাঁহার বেণুরব শ্রবণ করিতে করিতে স্থূল দেহ অন্তর্ধান করে। মনে হয় এ দেহ তো দেহ নয়, এ তাঁহারই হাতের বাঁশী। এ বাঁশীতে তিনি যে সুর তোলেন, সেই সুরই বাজিতে থাকে। রাধা বলেন,—

সাধ যায় পহু রাখি চরণ তব
হৃদয় মাঝ হৃদয়েশ,
হৃদয় জুড়াও ন বদনচন্দ্র তব
হেরব জীবনশেষ।
সাধ যায় ইহ চন্দ্রম-কিরণে
কুসুমিত কুঞ্জবিতানে
বসন্ত বায়ে প্রাণ মিশায়ব
বাঁশিক সুমধুর গানে।"

রাধার প্রাণ, শ্রীকৃষ্ণের বেণু এবং বেণুর সুর সব একাকার হইয়া যায়। রাধার কাছে আর কাহারও স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না। তিনি বলেন,—

প্রাণ ভৈবে মঝু বেণু-গীতময়,
রাধাময় তব বেণু।

রাধা বলিয়া যে রমণীটিকে দেখিতেছ, সে তো আর কিছুই নয়, সে তো তোমারই বেণু। আর বেণুর ধ্বনি বলিয়া যাহা জগতের কানে বাজিতেছে, সেও আর কিছুই নয়, রাধার প্রাণই সুর ধরিয়া তোমার বংশিমুখে মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

এই জ্যোৎস্না রাতে জাগে আমার প্রাণ ;
পাশে তোমার হবে কি আজ স্থান ?"
দেখতে পাব অপূর্ব সেই মুখ,
রইবে চেয়ে হৃদয় উৎসুক,
বারে বারে চরণ ঘিরে ঘিরে
ফিরবে আমার অ''ভরা গান ?

"প্রাণ ভৈবে মঝু বেণু-গীতময় রাধাময় তব বেণু"—এই সুরই কি গীতাঞ্জলির এই গানে এবং অন্যান্য বহু গানে ধ্বনিত হইতেছে না ?

এই মোর সাধ যেন এ জীবন মাঝে
তব আনন্দ মহাসংগীত বাজে।

ভানুসিংহের রাধা এবং পরিণতবয়স্ক কবির মুখে কি একই সাধ ব্যক্ত হইতেছে না ?

ভানুসিংহের রাধা চণ্ডীদাসের রাধার মতই সংশয়-শঙ্কাকুল মনে প্রিয়তমকে পাশে পাইয়াও স্থির নহেন। তিনি বলেন,—

সজনি, সত্য কহি তোয়।
খোয়ব কব হম শ্যামক প্রেম
সদা ডর লাগয়ে মোয়॥
হিয়ে হিয়ে অব রাখত মাধব
সো দিন আসব সখি রে।
বাত ন বোলবে, বদন ন হেরবে
মরিব হলাহল ভখি রে॥

বলরামের রাধারও সেই আশঙ্কা :

মরিব মরিব সখি না রাখিব জীউ।
কে রাখিবে দেহ না হেরিয়া সেই পিউ॥

সেই ভাল, এ জীবন আর রাখিব না। যে প্রিয়তম বিহনে মনের সুখ, মুখের হাসি, নয়নের নিদ্রা সব যায়—সেই প্রিয় বিরহিত জীবন তো ত্যাগেরই যোগ্য।

বৈষ্ণব কবি বলেন,—

নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস,
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ মঝু পাশ।

ভানুসিংহের রাধাও তেমনি বলেন—

লয়ি গলি সাথ বয়ানক হাসয়ে
লয়ি গলি নয়ন আনন্দ!

সুতরাং হে মৃত্যু, তোমারই অমৃতসাগরে রাধা আত্মবিসর্জন করিবেন।

মৃত্যুকে ভয় করিবার কিছুই নাই। শোক-দুঃখ, আশা-আনন্দ, ভয়-ভাবনা মিশ্রিত জীবনের বিচিত্র প্রবাহধারা যে মহাসমুদ্রে মিলিত হয়, তাহাই তো মৃত্যু। তাই মৃত্যুকে 'এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা' বলা হইয়াছে। জীবন-দেবতাই মানবজীবনের যাত্রাশেষে মৃত্যুরূপে জীবনবধূর সহিত মিলিত হন।

গীতাঞ্জলির কবি 'মরণ'কে ডাকিয়া বলিয়াছেন:

বরণমালা গাঁথা আছে
আমার চিত্ত মাঝে
কবে নীরব হাস্যমুখে
আসবে বরের সাজে।
সেদিন আমার রবে না ঘর
কেই-বা আপন কেই-বা অপর
বিজন রাতে পতির সাথে
মিলবে পতিব্রতা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা॥

ভানুসিংহের মরণও একইভাবে কল্পিত। কবির জীবনবধূ ভানুসিংহের রাধার মুখে ঐ একই কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। কোনো বৈষ্ণব কবির কল্পনায় যাহা উচিত হয় না, ভানুসিংহ সেই মৃত্যুকে জীবনেশ্বরের মূর্তিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।

একথা ভানুসিংহের পূর্বে আর কে বলিয়াছেন?

তাপবিমোচন করুণ কোর তব,
মৃত্যু অমৃত করে দান।
তুঁহু মম শ্যাম সমান॥

এটা কি অনুকরণের কথা হইল? হইলে কাহার অনুকরণ?

মরণ রে শ্যাম তোঁহারই নাম,
তুঁহু মম মাধব তুঁহু মম দোসর
তুঁহু মম তাপ ঘুচাও
মরণ, তু আওরে আও।

মৃত্যুর ওপারের উৎসবের জন্যই তো এপারে এত আয়োজন।

এসেছি এই পৃথিবীতে,
হেথায় হবে সেজে নিতে
রাজার বেশে চল রে হেসে
মৃত্যুপারের সে উৎসবে॥

মরণের আগমনপ্রতীক্ষায় জীবনের ডালা সাজানো রহিয়াছে :

ভরা আমার পরাণখানি
সম্মুখে তার দিব আনি,
শূন্য বিদায় করব না তো উহারে
মরণ যেদিন আসবে আমার দুয়ারে॥

আমি প্রস্তুত এখন, হে মরণ,
ভুজ পাশে তব লহ সম্বোধয়ি
আঁখিপাত মঝু আসব মোদয়ি
কোর উপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি
নীদ ভরব সব দেহ।

শ্যামের বিরহে যে নয়নের নিদ্রা অপগত হইয়াছিল, হে মরণরূপী শ্যাম, তোমার কোলের উপর কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমার সর্বদেহ সেই নিদ্রায় অবশ হইয়া আসিবে। হে সর্বদুঃখতাপের পরম শান্তি মরণ, তুমি আমাকে ডাকিয়া লও।

রাধার বিহ্বলতা দেখিয়া ভানুসিংহ বলিলেন,—মরণকে আহ্বান কেন? মরণ তোমাকে আশ্রয় দিবে, কিন্তু তিনি যে জন্ম-মৃত্যু সকলেরই আশ্রয়—তিনি মরণের অপেক্ষাও প্রিয়।

মাধব পহু মম, পিয়সো মরণসেঁ
অব তুঁহুঁ দেখ বিচারি।

রাধা জীবনে একটা সমাধানের পথ দেখিতে পাইয়াছিলেন; কিন্তু ভানুসিংহ বাদ সাধিলেন। বলিলেন, বিচার করিয়া দেখ। বিচার করিয়া কি তাঁহার কিনারা পাওয়া যায়?

রূপে-রসে-গানে-গন্ধে তাঁহাকে দেখি, তাঁহাকে শুনি, তাঁহাকে অনুভব করি। তিনি আমার দেহ মনে ব্যাপ্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তিনি আমার হৃদয়ের মধ্যে সদা জাগ্রত, তিনি আমার দুই অনিমেষ নয়নের উপর আসন রচনা করিয়া আছেন, আমার মর্মের দিকে তাঁহার অরুণ নয়নের দৃষ্টি সর্বদাই ন্যস্ত রহিয়াছে, মুহূর্তের জন্যও ব্যাহত হয় না। তবু তো তাঁহাকে চিনিলাম না।

কো তুঁহু বোলবি মোয
হৃদয় মাহ মঝু জাগসি অনুখন
আঁখ উপব তুঁহু রচলহি আসন
অরুণ নয়ন তব মরম সঙে মম
নিমিখ ন অন্তর হোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়॥
হৃদয়কমল, তব চরণে টলমল,
নয়ন যুগল মম উছলে ছল ছল,
প্রেমপূর্ণ তনু পুলকে ঢল ঢল
চাহে মিলাইতে তোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়?
হেরি হাসি তব মধুঋতু ধাওল,
শুনয়ি বাঁশি তব পিককুল গাওল
বিকল ভ্রমরসম ত্রিভুবন আওল

চরণকমল যুগ ছোঁয় ।
কো তুঁহু বোলবি মোয়?
তৃষিত আঁখি তব মুখ'পর বিহরই
মধুর পরশ তব, রাধা শিহরই
প্রেম-রতন ভরি হৃদয় প্রাণ লই
পদতলে অপনা থোয়
কো তুঁহু বোলবি মোয় ?
কো তুঁহু কো তুঁহু সবজন পুছয়ি
অনুদিন সঘন নয়নজল মুছয়ি,
যাচে ভানু সব সংশয় ঘুচয়ি
জনম চরণ 'পর গোয় ।
কো তুঁহু বোলবি মোয় ?

এই সুরই গীতাঞ্জলির গানে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান ?
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান ।
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান ।
আমার চিত্তে তোমার দৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী
তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান ।

হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ প্রাণ,
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান ॥

... ...

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।
আমার নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে ॥

রূপের মধ্যে অরূপের যে প্রকাশ রবীন্দ্র কাব্যে অপরূপ হইয়া দেখা দিয়াছে ভানুসিংহের পদেই তাহার সার্থক এবং সক্ষম সূচনা। রাধার হৃদয়বৃন্তে নীল কমলের পূর্ণ প্রকাশ ভানুসিংহের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করি।

ভানুসিংহের কবিতা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিলাম, কিন্তু সমালোচকগণ যখন তাঁহার কবিত্ব এবং ভাবের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে অসংশয় নহেন তখন আমাদের পক্ষে আর বেশী কিছু বলা সংগত নয়।

তবে একটা কথা এ প্রসঙ্গে না বলিয়া পারিতেছি না। সে হইতেছে চ্যাটার্টনের কথা। প্রথমেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের গল্প রচনা করিবার পূর্বে ইংরেজ কবি চ্যাটার্টনের গল্প শুনিয়াছিলেন। ইনি ষোল বৎসর বয়সে যাজক কবি রাউলির ছদ্ম নামে কতকগুলি গদ্য পদ্য মিশ্রিত রচনা প্রণয়ন করেন। পাঠক সাধারণকে তিনি জানান নাই যে এ রচনাগুলি তিন চারিশত বৎসর পূর্বে রাউল নামক কবির দ্বারা লিখিত হইয়াছিল; তিনি রেডক্লিফ গির্জার সিন্দুক হইতে পাণ্ডুলিপিগুলি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিন চার শতাব্দী পূর্বেকার ভাষা এই বালক কবি এমন দক্ষতার সহিত অনুকরণ করিয়াছিলেন যে তদানীন্তন পণ্ডিতগণ জাল বলিয়া ধরিতে পারেন নাই।

চ্যাটার্টনের অসাধারণ প্রতিভা সম্বন্ধে যাঁহারা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কোলরিজ, ওঅর্ডসওঅর্থ, শেলি, রসেটি পর্যন্ত ছিলেন।

বস্তুতঃ বালক হইলেও তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা ছিল। কোলরিজ ওঅর্ডসওঅর্থ প্রমুখ কবিগণ যে তাঁহাকে ঐশী শক্তির অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাহা একেবারে অহেতুক নয়। কিন্তু রচনায় ভাষা বা ভঙ্গীর দিক দিয়া হয়তো অনুকরণে কোথাও কিছু অসম্পূর্ণতা ছিল। তাই একদিন ফাঁকি ধরা পড়িয়া গেল। (অবশ্য ধরা পড়ার পরও রাউলির কবিতার নাম ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস হইতে লুপ্ত হয় নাই। আর চ্যাটার্টন ধরা পড়েন তাঁহার জীবদ্দশাতেই এবং তাঁহার জীবদ্দশা দীর্ঘ ছিল না। ১৭ বৎসর বয়সেই তিনি আত্মহত্যা করেন)। এই ধরা পড়িবার একটা কারণ ছিল। হোরেস ওয়ালপোল তখনকার দিনে একজন নামকরা লোক ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির দিক দিয়া যে যুগসন্ধি দেখা দেয় তৎসম্বন্ধে ইনি চর্চা করিতেন। এতদ্ব্যতীত ইনি নিজেও একটি জাল প্রাচীন পুঁথি রচনা করিয়াছিলেন।

এ হেন ওয়ালপোলও প্রথমে কিছুই ধরিতে পারেন নাই। চ্যাটার্টন প্রথমে রাউলির রচনার নিদর্শন বলিয়া যে কবিতা পাঠান, ওয়ালপোল তাহা দেখিয়া খুশী হইয়াছিলেন। সেগুলিকে সংগতি ও ভাবের দিক দিয়া বিস্ময়কর বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল।

যাহাই হউক এই ওয়ালপোলের হাতেই তিনি ধরা পড়েন। প্রথমে কোন কারণে সন্দেহ হয়। তখন তিনি গ্রে ও মিসন নামে দুই বন্ধুর কাছে কবিতাগুলি পরীক্ষা করিবার জন্য পাঠান। তাঁহারা ঐ কবিতা আধুনিক বলিয়া মত প্রকাশ করেন। যাহাই হউক এতৎসত্ত্বেও তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে কোন অমর্যাদা হয় নাই। ভাষা বা ভঙ্গীর ত্রুটিতে যদি তাহার প্রাচীনত্বের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়, ভাবসংগতির দিক দিয়া কবিতার মূল সৌন্দর্যের কোন হানি তো হয় নাই।

ভানুসিংহের কথা কিন্তু স্বতন্ত্র। ভানুসিংহের সমালোচকেরা বলেন, পুরাতন কবিদের ভাষা ও ভঙ্গী তিনি ঠিকই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এদিকে

তাঁহারা আপত্তি করিতেছেন না। তাঁহাদের আপত্তি ভাবের দিক দিয়া। কিন্তু ভাবের কথা তো যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি।

আসল কথা এই যে, কবি আগেভাগেই নিজের সমালোচনা নিজে সারিয়া ফেলাতেই সমালোচকগণ স্বাধীন মত প্রকাশ করিবার অবকাশ পাইলেন না। চ্যাটার্টন আত্মহত্যা করিয়াছিলেন সেই প্রসঙ্গ মনে করিয়া কবি জীবনস্মৃতিতে রহস্যচ্ছলে লিখিয়াছেন,—"আপাতত ঐ আত্মহত্যার অনাবশ্যক অংশটুকু হাতে রাখিয়া কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।"

তখন হয়তো হাতে রাখিয়াছিলেন কিন্তু নিজেই নিজের বাল্য রচনা সম্বন্ধে বার বার সমালোচনা করিয়া শেষ পর্যন্ত অল্পই হাতে রাখিতে পারিয়াছিলেন। তাহার পরও যেটুকু বাকি ছিল সেটুকু সমালোচকেরা নিঃশেষে চুকাইয়া দিয়াছেন।

শিশু-সাহিত্য

জগৎ পারাবারের যে তীরে শিশুগণের চিরন্তন মেলা আমরা যেন তাহার বিপরীত তীরে নির্বাসিত রহিয়াছি, লবণাক্ত জলরাশির দুস্তর ব্যবধান অতিক্রম করিয়া তাহাদের কাছে আসিতে পারিতেছি না। তাহাদের মানস লোকের গভীর রহস্য আমাদের কাছে অজ্ঞাতই রহিয়া গেল। মানবলোকে যাহারা দেবতার দূত হইয়া যাওয়া আসা করিতেছে তাহারা অনেকেই প্রাপ্য পূজা না পাইয়া শুধু হাতেই ফিরিয়া যায়। আমরা কাগজের ফুল দিয়া যে নৈবেদ্য সাজাই তাহাতে রূপের ভান থাকে কিন্তু রূপ থাকে না, আর রসের তো একান্তই অভাব।

শিশুসাহিত্যের প্রসঙ্গে এই বেদনার কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। যাহাদের দেহের এতটুকু অসুখে পিতামাতা আত্মীয় অভিভাবকদের মুখের আহার চোখের নিদ্রা দূর হয় তাহাদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে এ নির্মম ঔদাসীন্য কেন? উপনিষদ্ বলিয়াছেন পুত্রকে পুত্র বলিয়াই যে ভালবাসি তাহা নয়। পুত্রকে ভালবাসি এইজন্য যে তাহার মধ্যে আমি আমাকেই প্রত্যক্ষ করি। মানুষের জৈব জীবন প্রতিদিনের তুচ্ছতায় পরিপূর্ণ। ইহার উর্ধ্বে তাহার একটি আদর্শ জীবন আছে। আদর্শ জীবন না বলিয়া জীবনাদর্শই বলি, তাহা হইলেই কথাটা সুস্পষ্ট হইবে। এই আদর্শকে সে জীবনে লাভ করিতে না পারুক, কিন্তু লাভ করিতে চায়। এই আদর্শকে সে পুত্রের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে চায়। আমাদের মধ্যে একটা মানুষ আছে। সে আহার করে, নিদ্রা যায়, জীবিকার্জন করে; মিথ্যাকথা বলে, উৎকোচ গ্রহণ করে, আত্মপরায়ণ হইয়া অন্যকে দুঃখ দেয় নিজে দুঃখ পায়। সঙ্গে সঙ্গে একটি দেবতাও থাকেন। তিনি ক্ষুধাতুরের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে ব্যগ্র হন, হতভাগ্যকে দেখিয়া ব্যথিত হন, সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেন, অন্যায় না করিতে পারিলে আনন্দিত হন, পরের কথা ভাবিয়া নিজেকে বিস্মৃত হইতে চান। আমাদের দ্বৈত জীবনের এই দেবতাটিকেই আমরা পুত্রের মধ্যে দেখিতে চাই। অনেকক্ষেত্রেই না পাইয়া নিরাশ হই।

আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির উপরেই আমরা পুত্রকন্যাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিয়া দিয়া বসিয়া আছি। দুঃখকষ্টে যেমন করিয়াই হউক পেটের ভাত, পরনের কাপড় ও ইস্কুলের মাহিনাটুকুর সংস্থান করিতে পারিলেই পিতামাতার কর্তব্য সমাপ্ত হইল বলিয়া নিশ্চিন্ত হই। অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান যাঁহারা তাঁহারা পুত্রকন্যার জন্য গৃহশিক্ষকেরও ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ফল কি হয়?

শিক্ষাপদ্ধতির দোষগুণের আলোচনা করিব না, সে আলোচনা নিতান্তই পুরাতন। তবে বালক রবীন্দ্রনাথ যে ইস্কুলের ভয়ে ইস্কুল-পালানো ছেলে নাম লইয়াছিলেন, তাহার আবহাওয়া আজও বিশেষ পরিবর্তিত হয় নাই। এই জেলখানার গরাদ যতদিন না ভাঙ্গিয়া পড়ে ততদিন এদেশের ছেলেমেয়েদের গারদেই থাকিতে হইবে কিন্তু তাহার বাহিরেও তো আমাদের করিবার কিছু আছে।

সেই কথাটা অনেকদিন হইতে মনের মধ্যে ঘুরপাক খাইতেছিল, আজ সুযোগ পাইয়া প্রকাশ করিতেছি।

আমাদের একটা সুবৃহৎ সম্পত্তি আছে—সেটা হইল সাহিত্য। সৌভাগ্যের বিষয় বাংলা সাহিত্যের প্রসারই শুধু বাড়িতেছে না, উহার শক্তিও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। বাঙ্গালার নিজস্ব প্রতিভা এই সাহিত্যের মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। আমার বিশ্বাস, জাতির তরুণ সম্প্রদায়কে উদ্বোধিত করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ. উপায় এই সাহিত্য। নবোদ্‌গত মানবাঙ্কুরগুলির মনের মূলে যথোচিত পরিমাণে সাহিত্যরস সেচন করিয়া যাইতে পারিলে তাহারা সঞ্জীবিত ও সংবর্ধিত হইয়া বনস্পতিতে পরিণত হইতে পারিবে।

সাহিত্য কথাটাই যথেষ্ট ব্যাপক। শিশু-সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝি তাহাও সেই ব্যাপক সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত। এতকাল তাহার স্বতন্ত্র মর্যাদা স্বীকৃত হয় নাই, বর্তমানে কিছুটা হইয়াছে। বিভিন্ন সাহিত্যসম্মেলনে শিশুসাহিত্য-শাখার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা তাহারই পরিচায়ক। কিন্তু শিশু-সাহিত্য বলিলে ঠিক কি বুঝায়, সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট। শিশু-সাহিত্য কথাটা Juvenile literatureএর অক্ষম অনুবাদ। কিন্তু কথাটা এতই প্রচলিত হইয়াছে যে এখন আর উহার পরিবর্তন করা সহজ নয়।

শিশু-সাহিত্যের পাঠকপাঠিকার বয়স বাঁধিয়া দেওয়া অনাবশ্যক।

পৃথিবীর সর্বদেশের সাহিত্যে শিশুদিগের উপযোগী অনেক বই আছে, বয়স্কদের পক্ষেও যাহা পরম উপভোগ্য। তথাপি একথা অস্বীকার করিবার নয় যে পাঠক-পাঠিকার বয়স এবং চিত্তবৃত্তির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া লেখককে সাহিত্য রচনা করিতে হইবে। বয়স্ক লোকদের জন্য যাহা লিখা যায় তাহাকে বিচার করিবার লোক আছে। কড়া সমালোচনার সিংহদ্বারে সতর্ক প্রহরী সর্বদাই সজাগ। কিন্তু শিশুদের সাহিত্যের বেলা সে বালাই নাই। আমাদের দেশে শিশু-সাহিত্যের চাহিদা যে পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা আশার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু আশঙ্কাও আছে। কারণ নির্বাচন করিবার লোক নাই, সমালোচকেরও সংখ্যা কম।

অধিকাংশ ইস্কুলে দেখি অযোগ্য শিক্ষকদের হাতেই শিশুদের শিক্ষাদানের ভার পড়ে। উপরের শ্রেণীর জন্য ভাল শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যত বেশী ছাত্রছাত্রীকে উত্তীর্ণ করা যায় ততই বিদ্যালয়ের নাম। ভিতপত্তনের বেলায় যত ঔদাসীন্য। সেখানে তো আর আশু লাভের সম্ভাবনা নাই; শিশুসাহিত্যের অবস্থাও অনুরূপ। এই ক্ষেত্রে প্রতিভাবান লেখকের অভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। যাঁহাদের প্রতিভা আছে তাঁহারা অন্যদিকে তাহার প্রয়োগ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। আর্থিক লাভ সেদিকে কিছু আছে কিন্তু সেটা বড় কথা নয়, মর্যাদার কথাটাই প্রধান। শিশু-সাহিত্যের লেখকের অদৃষ্টে সেটা কিছু কমই জোটে। খোকনের বাবার কাছে খোকনের 'মাস্টারের' যে দাম খোকনের পাঠ্য বই-এর লেখকের দাম তাহার অপেক্ষা অধিক নয়। অথচ সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে ঐ দুইটি লোকের উপর।

অসম্মান করিব বলিয়া কেহ যে ইহাদের অসম্মান করেন এমন কথা বলিতেছি না। যদি তাহাও করিতেন তাহা হইলেও খুশী হইতাম, বুঝিতাম তাঁহাদের সম্বন্ধে লোকে ভাবে। কিন্তু ঔদাসীন্য যে অসম্মান অপেক্ষাও অপমানজনক।

আমি শিশু-সাহিত্যিকদের পক্ষ লইয়া বিবাদ করিতে আসিয়াছি এমন কথা কেহ যেন মনে না করেন। বস্তুতঃ আমি তাঁহাদের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারি এমন যোগ্যতা আমার নাই। তাঁহাদের যা বলিবার একদিন হয়ত তাঁহারাই বলিবেন। আমি শুধু নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথা বলিতেছি। প্রদেশে প্রদেশে

এক বা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক, স্থানে স্থানে গবেষণাগার স্থাপিত হউক কেহই তাহাতে আপত্তি করিবে না। কিন্তু বনিয়াদ শক্ত না হইলে চূড়া তাহার উচ্চতা লইয়া কতদিন গর্ব করিতে পারে? যে শিশু একদিন বাল্য কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনের প্রান্তসীমায় পদার্পণ করিবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তো তাহারই জন্য? কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে নিয়তই দেখিতেছি আমাদের বিদ্যার্থীরা বয়সে যতই বাড়িতে থাকুক, বালকত্ব তাহাদের সহজে ঘুচে না। আমাদের উচ্চতর বিদ্যায়তনগুলি কি এই বয়স্ক শিশুগুলির দ্বারাই পূর্ণ হয় না? পূর্বেও বলিয়াছি, পুনরায় বলিতেছি শিক্ষাপদ্ধতির আমূল সংস্কার না হইলে এই সমস্যার সমাধান সহজ হইবে না, অথচ সে পথেও বিস্তর বাধা। তাই বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব কতদিন? সেই জন্যই এই সাহিত্যের পথ ধরিয়া পরীক্ষার কথা বলিতেছি। এ পরীক্ষায় কোনো বিপত্তির সম্ভাবনা নাই, পরীক্ষা ব্যর্থ হইবার সংগত কোনো কারণ নাই, আর ব্যর্থ হইলেই বা ক্ষতিটা কি?

আমার প্রস্তাবটা এমন কিছু গুরুতর নয়। যাহারা আমার গৃহের আলো, আমার নয়নের মণি, আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার পরমতম পরিণতি, যাহাদের মধ্যে আমাদের হৃদয়ের দেবতাটিকে প্রত্যক্ষ করিতে চাই, যাহাদের স্মিতমুখে তাঁহাকেই প্রতিভাত দেখিয়া মানুষকে দেবতার মর্যাদা দিতে পারি, শুধু তাহাদের কথা একবার ভাবিতে হইবে। শিশুদের চিরজাগ্রত জ্ঞান-পিপাসা মিটাইবার কতটুকু শক্তি কয়জন পিতামাতার আছে? শিশুরা কাঁদিলে শ্রমিক নারীরা নাকি তাহাদের আফিম খাওয়াইয়া রাখে। শিক্ষিত পিতামাতারা আফিম দেন না, দেন রংওয়ালা লজঞ্জুস আর রঙিন মলাটওয়ালা যে কোন বই। চিকিৎসকেরা বলেন রংএ অনেক সময় আর্সেনিক বিষ থাকে। দেখিয়া শুনিয়া না লইলে লজঞ্জুস খাইয়া অনেক সময় শিশুর বিপদ ঘটিতে পারে। বইয়েরও বিষয়বস্তুটা দেখিতে হইবে। শুধু রং দেখিলেই কর্তব্য শেষ হইবে না।

কথা উঠিবে শিশু-সাহিত্য-ভাণ্ডারে বাছাই করিবার মত এত বই আছে কি? অনেক নাই সেকথা মানি, কিন্তু অনেক হইবে আর যাহা আছে তাহাও নিতান্ত অল্প নয়। আমরা যদি পুত্রকন্যার মুখ তাকাইয়া একটু ভাবিতে শিখি, কিরূপ

বই তাহাদের উপভোগ্য হইবে, আনন্দের মধ্য দিয়া কোন বই তাহাদের মনের খোরাক জোগাইবে, প্রশংসা যাহার প্রাপ্য তাহার প্রশংসা করিতে যদি বিরত না হই, আর যাহা নিন্দাভাজন তাহাকে নিন্দা করিবার মত সৎসাহস প্রকাশ করি, দেখিবেন বাঙ্গালীর প্রতিভা কি অসাধ্য সাধন করিতে পারে। ইস্কুলের যান্ত্রিক নিয়মে যেটুকু শিক্ষা হয় হউক কিন্তু তাহাকেই একমাত্র অবলম্বন বলিয়া ধরিয়া লইলে চলিবে না। ধাত্রীর কোলে যদি শিশুকে রাখিতেই হয় রাখিব কিন্তু মাতৃস্তন্য হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। বই নির্বাচন করিতে গিয়া যদি একশর মধ্যে একটিও পাই একটি লইব এবং নিরানব্বইটি পরিত্যাগ করিব—নিজের পুত্রকন্যার কথা ভাবিয়া যাহাকে পরিত্যাগের যোগ্য বিবেচনা করিব তাহাকে পরিত্যাগ করিব। নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিব। যাহা তাহা ছেলেমেয়ের হাতে তুলিয়া দিব না, পুরস্কারের উপযোগী বলিয়া শিক্ষাবিভাগের ছাপ মারা থাকিলেও না।

শিশু-পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন সম্বন্ধে আর একটি কথা চিন্তা করিবার আছে। বালকবালিকার সুকুমার মন কাঁচা মাটির মত। তাহাতে দাগ সহজেই পড়ে। সুতরাং বিষয় নির্বাচনে যেমন সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক, ভাষার দিকে অবহিত হওয়াও তেমনি বিশেষ প্রয়োজন। ভাব সাহিত্যের প্রাণ কিন্তু ভাষা তাহার দেহ। দেহের অঙ্গসংস্থান সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান নাই সে মূর্তি রচনা করিবে কেমন করিয়া? তাই সাহিত্যে, শুধু শিশু-সাহিত্যে নয় বয়স্কদের সাহিত্যেও, অনেক সময় ভাষামাতৃকাকে লাঞ্ছিতা হইতে দেখি। বয়স্ক পাঠকদের পক্ষে তাহা কতটা বিপজ্জনক সে আলোচনা এ প্রসঙ্গে অবান্তর, কিন্তু শিশু-পাঠকের পক্ষে যে তাহা কিরূপ মারাত্মক বহু সহস্র ছাত্রছাত্রীর সংস্পর্শে আসিয়া তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছি। এই প্রসঙ্গে বানানের কথাও উল্লেখযোগ্য। আমরা যাহারা শিক্ষিত বলিয়া অহঙ্কার করি সেই আমাদের মধ্যেই বর্ণশুদ্ধি সম্বন্ধে অবজ্ঞা কি কম? এই অবজ্ঞাই পিতা হইতে পুত্রে এবং পুত্র হইতে পৌত্রে সঞ্চারিত হইতেছে। কোনো একদিন কোনো একস্থানে এ পাপচক্র ছিন্ন না করিলে যে উপায় নাই।

ভালমন্দের বিচার হউক বা না হউক আজ শিশু-সাহিত্যের বাজারে বহু

বেরঙের বই-এর অভাব নাই। কিন্তু এমন একদিনও তো ছিল যেদিন শিশুদের চিত্তবিনোদনের জন্য এমন ধারা বই অতি অল্পই প্রকাশিত হইত। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। তিনি যে সব বই দিয়া শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন আমরা ছেলেমেয়েদের হাতে সে বইগুলা একবার দিয়া দেখি না কেন? রামায়ণ মহাভারতের সংক্ষিপ্ত গল্প না পড়িয়া শিশুরা কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত এই দুটা বই সম্পূর্ণ পড়িয়া ফেলুক না। রবীন্দ্রনাথ ছয় বৎসর বয়সে যাহা পড়িয়াছিলেন আমাদের ছেলেরা না হয় আট দশ বৎসর বয়সেই তাহা পড়ুক। পড়িতে তাহারা পারে না এমন নহে, কিন্তু তাহারা যে পড়ে না তাহার কারণ আছে। আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত পিতা-মাতার কাছে তাহারা সে উৎসাহ কমই পায়। সেকালে ঠাকুমা দিদিমার আমলে প্রতি গৃহেই রামায়ণ মহাভারত পাঠের এমন একটা পরিবেশ ছিল যাহা একালে বিরল।

আমরা আমাদের বাল্যকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথামালা পড়িয়াছি, আজকাল তাহার নামও শুনিতে পাই না। শকুন্তলা সীতার বনবাস এ সবই বা কোথায় গেল? পড়ার মনটা একবার প্রস্তুত করিয়া দিলে তাহার পর আপনা-আপনি কাজ চলিতে থাকে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে বালকবালিকা বয়স্ক পাঠ্য গ্রন্থ পড়িয়াও কিছুটা রস উপভোগ করিতেছে। রবীন্দ্রনাথ যখন চৌদ্দ বৎসরের বালক তখন তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী' পরম ঔৎসুক্যের সহিত পড়িয়াছিলেন। আজিকার শিক্ষাবিজ্ঞানীরা কি বলিবেন জানি না কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই কথা বলিতেন যে সাহিত্যকে বয়স্ক পাঠ্য বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখা দরকার নাই। ভাল বই ছেলেমেয়েদেব হাতে ধরিয়া দাও তাহারা পড়িয়া যাক। মন যতটা গ্রহণ করিতে পারে করিবে। চালুনির ফাঁক দিয়া কতটা চলিয়া যায় সেদিকে দৃষ্টি দিও না। যতটুকু থাকিয়া যায় ততটুকুই লাভ। রবীন্দ্রনাথ নিজের শিক্ষকজীবনে এই নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে বয়স বিচার না করিয়া ভাল ভাল বই পড়িয়া শুনাইতেন এবং আমরা জানি সেজন্য তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হয় নাই। কিন্তু মূলকথা সমানই থাকিয়া যায়। সে বই নির্বাচনের ভারও পিতামাতাকে লইতে হইবে তো! বয়স্কপাঠ্য বই দিয়া শিশুদের প্রয়োজন

সম্পূর্ণ মিটিতে পারে না একথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং শিশু-সাহিত্যকে সর্বাঙ্গীণ করিয়া তুলিবার আবশ্যকতা সর্বদাই অনুভূত হইবে।

সাহিত্যের ব্যাপকক্ষেত্রে শিশুসমাজের স্থান ধীরে ধীরে স্বীকৃত হইতেছে, দেশের বালকবালিকাগণ স্বাধীনভাবে সাহিত্যসভা সম্মেলন প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতেছে। ইহা আনন্দের বিষয়। আমাদের উৎসাহ পাইলে তাহাদের এই সকল উদ্যোগ সাফল্যলাভ করিবে। প্রতিভা বিকাশের এই সমস্ত ক্ষেত্র আমাদের যত্নে এবং আগ্রহে যাহাতে উর্বর হইয়া উঠে সেদিকে দৃষ্টি দিবার মত শুভবুদ্ধি আমাদের উদয় হউক।

প্রাচীন ইরানীয়গণের দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্তবিধি

সংসারে বাস করিতে গেলেই মানুষকে কয়েকটি আচার-ব্যবহার রীতি নীতি, বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। আদিম যুগে যখন মানবজাতি সভ্যতার আলোক দেখে নাই, তখন প্রত্যেকেই আপন আপন ইচ্ছামত কাজ করিত। শারীরিক শক্তি যাহার যত বেশী, যথেচ্ছাচারিতাও তাহার সেই পরিমাণে বেশী হইত। কিন্তু যেদিন হইতে মানুষ সমাজের উপকারিতা বুঝিল, সেই দিন হইতেই সে সমষ্টির হিতার্থে ব্যষ্টির স্বাধীনতা কিয়ৎ পরিমাণে খর্ব করিল।

ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় নির্ণয় করিবার কোন চিরন্তন মানদণ্ড নাই। যে ধারণার দ্বারা আমরা ভাল-মন্দ বিচার করি, তাহা পরিবর্তনসহ। হাজার বৎসর পূর্বে যাহা ভাল বলিয়া মনে করা হইত, আজ তাহা যদি মন্দ বলিয়া ভাবি, তাহা হইলে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। আবশ্যক অনাবশ্যক ও হিতাহিত বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধারণার বশবর্তী হয়; এবং ইহারই ফলে মানুষের কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে নানাবিধ বিধি-নিষেধের সৃষ্টি হয়। সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত বুদ্ধির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং বিধিনিষেধও চিরকাল সমান থাকে না, ক্রমশঃ পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হইতে থাকে। কোন জাতির প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ হইতে সেই জাতির প্রাচীন সভ্যতা ও চিৎপ্রকর্ষের পরিচয় পাওয়া সেই জন্যই খুব সহজ হয়। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ঐরূপ একটি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের অংশবিশেষের আলোচনা করিব। যে ধর্মগ্রন্থের কথা বলিতেছি, তাহার নাম অবেস্তা। হিন্দুর নিকটে বেদের যে স্থান, পারসীকগণের নিকটে অবেস্তার স্থান তাহার অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। অবেস্তা বহু অংশে বিভক্ত, বেন্দিদাদ তাহা অন্যতম। এই বেন্দিদাদই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়। বেন্দিদাদ শব্দের অর্থ দেব-বিরোধী বিধান। এ স্থলে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, অবেস্তা ভাষায় দ এ ব (=সং দেব) শব্দের অর্থ দানব।

বেন্দিদাদ বাইশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এই পরিচ্ছেদগুলি একটি অনবচ্ছিন্ন যোগসূত্র দ্বারা সংযুক্ত নহে। কোথাও কোথাও এক বিষয়ের আলোচনা হইতে অন্য প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িয়াছে। মূলতঃ আচার-বিচার, শৌচাশৌচ, বিধি-নিষেধ

প্রভৃতির আলোচনার স্থল হইলেও, বেন্দিদাদের মধ্যে ব্যাধি ও ঔষধের উৎপত্তির ইতিহাস এবং ঔষধ, ভৈষজ্য, সম্মোহন আদির আখ্যায়িকা এবং আরও নানা বিষয় স্থান পাইয়াছে। তথাপি উহাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে:

প্রথম ভাগ	১ম পরিচ্ছেদ	হইতে	৩য় পরিচ্ছেদ		পর্যন্ত।
দ্বিতীয় ভাগ	৪র্থ	„	হইতে ১৮শ	„	পযন্ত।
তৃতীয় ভাগ	১৯শ	„	হইতে ২২শ	„	পর্যন্ত।

প্রথম ভাগে অহুরমজদাব সৃষ্ট ষোলটি দেশ ও তাহার বিরুদ্ধে অঙ্‌রমইন্যু কর্তৃক সৃষ্ট শীতাতপ প্রভৃতি ষোলটি উপদ্রবের কথা, যমের কাহিনী, কৃষিসম্পদ প্রভৃতি বহু বিষয় ও পৌরাণিক আখ্যায়িকার বিবরণ আছে।

দ্বিতীয় ভাগেই (৪র্থ—১৮শ পরিচ্ছেদ) বেন্দিদাদের মূল কথা। এই অংশটিই ইরানীয় স্মৃতিশাস্ত্র। এই অংশে ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ, বিবিধ প্রকারের চুক্তি ও চুক্তিভঙ্গ, আক্রমণ, বলাৎকার, আঘাত এবং ঐ সকল অপরাধেব দণ্ডবিধি, শুদ্ধি-অশুদ্ধি, কুক্কুরাদি জীবের বধজনিত দণ্ড, নৈতিক অপরাধ ও তাহার শাস্তি, গণিকার নিন্দা, ঋতুমতী স্ত্রীর সহিত সংসর্গের প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি বহু বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আছে।

তৃতীয় ভাগে আছে অঙ্‌রমইন্যু এবং বুইত্তির জরথুশ্‌ত্রকে আক্রমণ এবং জরথুশ্‌ত্রের জয়লাভ শবস্পর্শজনিত অশৌচের প্রতিবিধান, মৃত্যুর পর আত্মার গতি। ঔষধ ও ব্যাধির উৎপত্তির কাহিনী, ভৈষজ্য, সম্মোহন প্রভৃতি সম্বন্ধীয় নানা আখ্যায়িকাও এই অংশে স্থান পাইয়াছে।

জরথুশ্‌ত্রের পবিত্র ধর্মের কোন বিধান লঙ্ঘন করাকেই অপরাধ বলিয়া মনে করা হইত; সুতরাং প্রচলিত ধর্মসম্বন্ধীয় তদানীন্তন ধারণার অনুযায়ী তাহার শাস্তি নির্দিষ্ট হইত। যে বিধানটি যত পবিত্র বলিয়া মনে করা হইত, তাহার লঙ্ঘনজনিত শাস্তিও হইত সেই পরিমাণে গুরুতর। একাকী শব বহন করার অপরাধের তুলনায় নরহত্যার অপরাধও তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হইত। শববহনের শাস্তি প্রাণদণ্ড আর নরহত্যার শাস্তি ৯০ উপাজন। একটি মেষপালকের কুকুরকে হত্যা করিলেও নরহত্যার দণ্ড অপেক্ষা গুরুতর দণ্ডের বিধান হইত। নরহত্যার দণ্ড ৯০ উপাজন আর কুক্কুরবধের দণ্ড ৮০০ উপাজন।

প্রাচীন পারসীক ধর্মবিধির অধিকাংশই স্বাস্থ্য ও শুদ্ধির মূল সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। অপবিত্রতাকে হীনতম অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইত; কারণ এই অপবিত্রতা হইতেই রোগ শোকের উৎপত্তি। শুচিতা লঙ্ঘনের শাস্তি সেই জন্যই সর্বাপেক্ষা কঠোর। দণ্ডবিধানে অনুপাতের এইরূপ বৈষম্য বর্তমান যুগে অস্বাভাবিক মনে হইতে পারে; কিন্তু অধ্যাপক ম্যাক্স-মূলারের কথায় বলি, "যতই অযৌক্তিক মনে হউক না কেন, জগতের রীতি-নীতির সব কিছুর পশ্চাতেই একটা কারণ বর্তমান আছে।" তিন হাজার বৎসর পূর্বে যে বিধি প্রবর্তিত ছিল আজ তাহার প্রয়োজন না থাকিতে পারে, কিন্তু প্রবর্তনের কালে সেই বিধির নিশ্চয় কোন না কোন প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। দণ্ডবিধান সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজনের অনুরূপ হয় তো হয় নাই; হয় তো কোথাও অতি গুরু আবার কোথাও বা অতি লঘু হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তথাপি তাহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিক ভাবেও সাধিত হইয়াছে।

জরথুশ্ত্রীয় ধর্মের মূল কথা তিনটি—সুচিন্তা, সদালাপ ও সৎকর্ম। বেন্দিদাদের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে অহুরমজ্দার মুখে শুনি,—"সুচিন্তা, সদালাপ ও সৎকর্ম এই তিন শ্রেয় বস্তু পরিত্যাগ করিও না। কুচিন্তা, কদালাপ ও কুকর্ম এই তিন হেয় বস্তু সর্বদা পরিহার করিও।" পূর্বেই বলিয়াছি, জরথুশ্ত্রীয় ধর্মে শুচিতার স্থান সর্বোপরি। অহুরমজ্দা বলিয়াছেন, পবিত্রতাই তাঁহার ধর্ম। সুচিন্তা, সদালাপ ও সৎকর্ম দ্বারা মানুষ সেই পবিত্রতা প্রাপ্ত হইতে পারে এবং ইহার বিপরীত আচরণ সমস্ত পাপের কারণ।

প্রাচীন ইরানে দণ্ডবিধি বিশেষ জটিল ছিল না বলিয়াই মনে হয়। কয়েকটি বিশেষ স্থল ব্যতীত অধিকাংশ অপরাধের জন্য একই প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। তবে অপরাধের লঘুত্ব বা গুরুত্ব অনুসারে দণ্ডের মাত্রা অল্প বা অধিক হইত। এই দণ্ডের নাম উপাজন। এই শব্দের অর্থ লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতের অনৈক্য দেখা যায়। অধিকাংশের মতে উপাজনের অর্থ আঘাত, এই অর্থই সংগত বলিয়া মনে হয়।

উপাজন প্রযুক্ত হইত দুই প্রকার অস্ত্রের দ্বারা, প্রথম অস্পহে অশ্ত্র, দ্বিতীয় স্রওশাচরণ। অস্পহে অশ্ত্র—ইহার অর্থ অশ্বদণ্ড (বা ঘোড়ার চাবুক) এবং স্রওশাচরণের অর্থ বিনয়দণ্ড, যাহা দ্বারা অবিনয়ীকে বিনীত করা যায়।

অপরাধীর প্রতি যত সংখ্যক উপাজন দণ্ডের বিধান করা হইত, প্রকৃত পক্ষে তাহাকে আঘাত ভোগ করিতে হইত তাহার দ্বিগুণ। যাহাকে পাঁচ উপাজন দণ্ড দিবার আদেশ হইত, তাহাকে অস্পহে অস্ত্র দ্বারা পাঁচ এবং স্রওশাচরণ দ্বারা পাঁচ এইরূপে মোট দশ আঘাত সহ্য করিতে হইত।

প্রাণদণ্ডের বিধান ছিল মাত্র দুইটি অপরাধের জন্য। অহুরমজ্দীয় শুদ্ধিতত্ত্ব বিশেষরূপে না জানিয়া যাহারা অশুচি বা সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির শুদ্ধিসম্পাদন করে প্রাণদণ্ড তাহাদেরই প্রাপ্য। কোন ব্যক্তি একাকী শব বহন করিলেও তাহার প্রাণদণ্ড হইত।

কোন্ কোন্ কর্মের অনুষ্ঠানকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইত তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে তখনকার অপরাধসমূহকে মোটামুটি পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে:

১. নৈতিক
২. স্বত্ব ও অধিকার সম্বন্ধীয়
৩. দৈহিক আঘাতজনিত
৪. ইতর প্রাণীর প্রতি আচরণসম্বন্ধীয়
৫. স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয়

প্রাচীন ইরানে গণিকাবৃত্তি প্রচলিত থাকিলেও অত্যন্ত নিন্দার বিষয় ছিল। বেন্দিদাদে রূপজীবিনীগণকে 'গহি' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। গহি শব্দের অর্থ দানবী। উহাদিগকে কিরূপ ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হইত ইহা হইতেই তাহা বেশ বোধগম্য হয়।

"জরথুশ্ত্র অহুরমজ্দাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আপনাকে গভীরতম শোক দেয়? কে আপনাকে কঠিনতম বেদনা দেয়?"

অহুরমজ্দা উত্তর করিলেন, "হে স্পিতম জরথুশ্ত্র, যে আপন দেহে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী, মজ্দা-উপাসক ও দানব-উপাসক, এবং পাপী ও পুণ্যবান্ সকলের বীজ মিশ্রিত করে, সেই গহি (আমাকে গভীরতম শোক ও কঠিনতম দুঃখ দেয়)।"

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতে চাই যে, বৈদিক সাহিত্যেও রমণীর

পরপুরুষাসক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট নিন্দার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে সাধারণী এবং বাজসনেয়ীসংহিতা, অথর্ববেদ, পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে পুংশ্চলী শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই দুইটি শব্দের মধ্যেই ঘৃণার ভাব সুপরিস্ফুট।

অবিবাহিত কন্যার সহিত সঙ্গমের ফলে যদি সেই কন্যার গর্ভোৎপত্তি হয়, তাহা হইলে ঐ কন্যা এবং পুরুষ উভয়েরই সমান অপরাধ হইবে। অন্তঃসত্ত্বা হইয়া যদি ঐ রমণী গর্ভ নষ্ট করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহার অপরাধের মাত্রা আরও বাড়িয়া যায়। ঔষধাদির দ্বারা যদি কেহ গর্ভপাতের সহায়তা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও স্বেচ্ছাকৃত হত্যা অপরাধে অপরাধী হইবে। ঐ কন্যার পিতামাতা সকল বিষয় অবগত হইয়াও যদি ঐ পাপকর্মে সহায়তা করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও একই অপরাধে অপরাধী হইবেন। অবিবাহিত অবস্থায় গর্ভধারণ করা অত্যন্ত লজ্জাকর বলিয়া পরিগণিত হইত। সেই কারণেই তাহা সকলের অজ্ঞাতে নষ্ট করিয়া ফেলিবার এত প্রয়াস। অসচ্চরিত্রা বৃদ্ধাগণ এই সুযোগ লইয়া নানা প্রকার ঔষধ গোপনে বিক্রয় করিয়া বেশ অর্থ সংগ্রহ করিত। বেন্দিদাদে এই সকল অপরাধের জন্য বেশ গুরু দণ্ডেরই ব্যবস্থা আছে। ঋগ্বেদেও কুমারী মাতার সম্বন্ধে নিন্দোক্তি প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। অবিবাহিত অবস্থায় অন্তঃসত্ত্বা হওয়া যে তদানীন্তন সমাজেও একটা কলঙ্কের কথা ছিল, তাহা 'রহসূ' শব্দ হইতেই বেশ বুঝা যায়। রহসূ শব্দের অর্থ যে গোপনে প্রসব করে।

বেন্দিদাদে দেখা যায় যে কুমারী কন্যার সহিত সঙ্গত হইয়া যে ব্যক্তি গর্ভ উৎপন্ন করে তাহার দায়িত্ব অনেকখানি। অনবধানতা বশতঃ জন্মের পূর্বেই ঐ ভ্রূণ নষ্ট হইলে, ঐ ব্যক্তিকে হত্যাপরাধে অভিযুক্ত করা হইত। জীবিত অবস্থায় শিশুর জন্ম হইলে ঐ ব্যক্তির উপরই তাহার লালনপালনের ভার পড়িত।

প্রাচীন ইরানে নৈতিক চরিত্রের আদর্শ হীন ছিল না। নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধীয় পাপের দণ্ড সেই কারণেই বিশেষ গুরুতর ছিল। কোন কোন অপরাধকে এরূপ ঘৃণা করা হইত যে কোন শাস্তিই সে অপরাধের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে করা হইত না।

প্রাচীন পারসীকগণের মধ্যে অসত্য ব্যবহারকে অত্যন্ত হীন অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইত। এই কারণে অসত্য আচরণের জন্য গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। অর্থ বা ভূমি সম্বন্ধীয় ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহা পরিশোধ না করিলে,

অপরাধীর কঠিন দণ্ড বিধান করা হইত। চুক্তি ভঙ্গ করা মিথ্যারই নামান্তর, সুতরাং চুক্তিভঙ্গের অপরাধকেও ক্ষুদ্র অপরাধ মনে করা হইত না।

চুক্তি ছিল ছয় প্রকারের। মৌখিক, হস্তকৃত, মেষ-পরিমাণ, গো-পরিমাণ, মনুষ্য-পরিমাণ এবং ভূমি-পরিমাণ।

মৌখিক চুক্তির বিশেষ কোন মূল্য ছিল না, অন্ততঃ তৎপরবর্তী যে কোন চুক্তির অপেক্ষা ইহার মূল্য কম ছিল। উপরিউক্ত চুক্তিগুলি ভঙ্গ করিলে যথাক্রমে ৩০০, ৬০০, ৭০০, ৮০০, ৯০০ এবং ১০০০ উপাজন দণ্ড দেওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত অপরাধীর আত্মীয়বর্গকেও ঐ পাপের অংশ গ্রহণ করিতে হইত এবং তাহাদিগকে ৩০০ হইতে ১০০০ বৎসর পর্যন্ত সেই পাপের ফল ভোগ করিতে হইত।

চৌর্যবৃত্তি অত্যন্ত নিন্দনীয় ছিল। চুরি বা দস্যুতা করিলে যে পাপ হয়, কাহারও কোন বস্তু ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া প্রত্যর্পণ না করিলে অধমর্ণেরও সেই পাপ হয়। বেন্দিদাদের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে কুকুরের চরিত্রবর্ণন প্রসঙ্গে চোর ও দস্যুর দুঃস্বভাবের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইহারা অন্ধকারপ্রিয়, নির্লজ্জ এবং অবিশ্বাসী।

দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার নিবারণের জন্য নানা বিধি ছিল। অত্যাচারের স্তরভেদে অপরাধের এবং দণ্ডের গুরুত্ব নির্দিষ্ট হইত। শারীরিক অত্যাচারের মাত্রা অনুসারে অপরাধের কয়েকটি নামও দেওয়া হইয়াছিল। নামগুলি এই :

১. আগেরেপ্ত
২. আবোইরিশ্‌ত
৩. আরেদুশ্‌
৪. খ্‌বর্‌
৫. তচৎবোহুনী
৬. অস্তোবিদ্‌
৭. ক্রজাবওধ

যদি কোন ব্যক্তি অপর কাহাকেও আঘাত করার উদ্দেশ্যে অস্ত্রগ্রহণ করে তাহা হইলে তাহার 'আগেরেপ্ত' অপরাধ হয়। এই অপরাধ একবারমাত্র

করিলে ৫ উপাজন দণ্ড হয়। অপরাধ যত অধিকবার করা হইবে দণ্ডের পরিমাণও তত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। এই অপরাধ আটবার করিলে অপরাধী পেশোতন্থ বলিয়া আখ্যাত হইবে। যে কোন অপরাধেই অপরাধী হউক না কেন পেশোতন্থ আখ্যা পাইলেই তাহার দণ্ড হইবে ২০০ উপাজন। পেশোতন্থর জন্য এই দণ্ড নির্দিষ্ট ছিল।

আবোইরিশ্ত। যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও আঘাত করিবার জন্য অস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারা প্রহার করিতে উদ্যত হয় তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির আবোইরিশ্ত অপরাধ হয়। প্রথমবার এই অপরাধ করিলে দণ্ড হয় দশ উপাজন। তাহার পর অপরাধের সংখ্যার সহিত দণ্ডের পরিমাণ বাড়িতে থাকে এবং সপ্তম বারে অপরাধী পেশোতন্থ হয়।

আরেদুশ। অস্ত্র দ্বারা সত্যসত্যই কাহাকেও আঘাত করিলে যে অপরাধ হয় তাহার নাম আরেদুশ। এই অপরাধের প্রথমবারের দণ্ড ১৫ উপাজন। ৬ বার এই অপরাধ করিলে অপরাধী পেশোতন্থ হইবে।

খ্বর্। আঘাতের দ্বারা ক্ষত উৎপন্ন করিলে প্রথমবারের শাস্তি ৩০ উপাজন। এবং পঞ্চমবারেই পেশোতন্থ আখ্যা লাভ ঘটিবে।

তচৎবোহুনী। আঘাতের দ্বারা কাহারও দেহে রক্তপাত ঘটাইলে যে অপরাধ হয় তাহার নাম তচৎবোহুনী। একবারমাত্র এই অপরাধ করিলে পঞ্চাশ উপাজন দণ্ড হইবে এবং চতুর্থবারে পেশোতন্থ আখ্যা লাভ হইবে।

অস্তোবিদ্। আঘাতের দ্বারা কাহারও অস্থি ভগ্ন করিলে তাহার 'অস্তোবিদ্' অপরাধ হয়। এই অপরাধে প্রথমবারে দণ্ড হয় ৭০ উপাজন এবং তৃতীয়বারে হয় পেশোতন্থর প্রাপ্তি।

ক্রজাবওধ। আঘাতের দ্বারা কাহারও সংজ্ঞালোপ করাইলে প্রথমবারের দণ্ড হয় ৯০ উপাজন এবং দ্বিতীয়বারেই অপরাধী পেশোতন্থ বলিয়া অভিহিত হয়।

আমরা দেখিলাম, মানবদেহে আঘাত করা দূরে থাকুক আঘাতের ইচ্ছায় অস্ত্রগ্রহণ করিলেও প্রাচীন ইরানে তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। মানবজীবনকে ক্ষুদ্রতম বিপদ হইতেও রক্ষা করিবার প্রয়াস যে সমাজের একান্ত

কর্তব্য এ ধারণা বহু প্রাচীন কালেও সে দেশে প্রবেশ করিয়াছিল। সভ্যতার ইতিহাসে পারসীক জাতির স্থান কাহারও পশ্চাতে নহে।

শুধু মানুষ নয়, কুক্কুরাদি ইতর জীব-জন্তুকেও সমূহ বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের চেষ্টার অবধি ছিল না। মানুষের প্রতি মানুষ অত্যাচার করিলে অত্যাচারী কোন না কোন শাস্তি যেমন ভাবেই হউক পাইবে, অন্ততঃ পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী; কারণ বিচারকের দৃষ্টি এড়াইলেও জনসাধারণের দৃষ্টি এড়াইয়া যাওয়া সহজ নয়।

যে অত্যাচরিত—অবশ্য সে যদি সাংঘাতিকভাবে আহত বা একেবারে নিহত না হয়—সেও প্রতিশোধ লইতে পারে। আর সে সম্পূর্ণ অক্ষম হইলে তাহার আত্মীয়স্বজন এবং দলভুক্ত লোকেরাও তো সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে। কিন্তু একটি ইতর প্রাণীকে গোপনে হত্যা করিলে তাহার শাস্তি দিবার কেহ নাই। এই কারণে ধর্মশাস্ত্রে এই অপরাধটাকে খুব গুরুতর বলা হইয়াছে। এই অপরাধ ধরা পড়িলে অপরাধীর প্রতি অতি কঠোর দণ্ড প্রয়োগ করা হইত। বেন্দিদাদের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে নানা প্রকার কুকুরের আবশ্যকতা এবং পবিত্রতার কথা বর্ণিত আছে এবং উহাদিগকে হত্যা বা আঘাত করিলে অপরাধীর কিরূপ পাপ ও দণ্ড হইবে সে সম্বন্ধেও বিস্তৃত বিবরণ আছে।

যে ব্যক্তি বংঘাপর কুকুরকে হত্যা করিবে সে নয় পুরুষ ধরিয়া আত্মহত্যার পাপে লিপ্ত হইবে এবং জীবিতকালে এই ভীষণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিলে মৃত্যুর পরে সে চিন্বদ সেতু উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। এই অপরাধের দণ্ড ১০০০ উপাজন। যে ব্যক্তি কোন মেষপালকের কুকুর, কোন গৃহপালিত কুকুর বা কোন বহুনজ্গ কুকুরকে হত্যা করিবে তাহার আত্মা পরলোকে যাইবার পথে ব্যাঘ্রতাড়িত মেষের অপেক্ষাও অধিক জোরে চীৎকার করিবে। অন্য কোন আত্মা তাহার এই পরলোকগামী আর্ত আত্মাকে সাহায্য করিবে না। সেতু-রক্ষক কুক্কুরগণ সেই আত্মার প্রতি কোন সহানুভূতি দেখাইবে না। যদি কেহ কোন মেষপালকের বা গৃহস্থের পালিত কোন কুকুরের পা বা অন্য কোন অঙ্গ কাটিয়া দিয়া তাহাকে কর্মের অনুপযোগী করিয়া ফেলে, তাহা হইলে সে স্বেচ্ছাকৃত আঘাত করিবার অপরাধে অপরাধী হইবে। ব্যাঘ্র বা চৌর কর্তৃক

ঐ মেষপালক বা গৃহস্থের কোন মেষ হত হইলে ঐ ব্যক্তিকেই (অর্থাৎ যে কুকুরের কোন অঙ্গ কাটিয়া তাহাকে মেষপালক রক্ষার কার্যে অনুপযোগী করিয়াছে তাহাকেই) ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। মেষপালকের কুকুর, গৃহস্থের কুকুর এবং বহুনজ্‌গ কুকুরকে প্রহার করিয়া হত্যা করিলে অপরাধীর যথাক্রমে ৮০০, ৭০০, এবং ৬০০ উপাজন দণ্ড হইবে। ভৌরূণ, গজ, বীজু প্রভৃতি নানাবিধ কুকুর এবং নকুল, শৃগাল প্রভৃতি নানাজাতীয় প্রাণীকে হত্যা করার জন্যও ৫০০ উপাজনের ব্যবস্থা আছে।

কুকুরকে শুধু হত্যা বা আঘাত করিলেই যে অপরাধ হইবে তাহা নহে। উহাকে কুখাদ্য দিলেও যথেষ্ট অপরাধ হইবে। কোন্ কুকুরকে কুখাদ্য দিলে কি পাপ হইবে এবং সেই সেই পাপের দণ্ড কি তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

প্রথম শ্রেণীর গৃহপতিকে কুখাদ্য দিলে যে পাপ হইবে মেষপালকের কুকুরকে কুখাদ্য দিলে সেই পাপ হইবে। অপরাধী পেশোতনু আখ্যা পাইবে অর্থাৎ সে ২০০ উপাজন দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর গৃহস্বামীকে কুখাদ্য দিবার পাপ সেই ব্যক্তির উপর বর্তিবে যে গৃহস্থের কুকুরকে কুখাদ্য দিবে। তাহার দণ্ড ৯০ উপাজন।

পুরোহিতরূপে আগত ধার্মিক ব্যক্তিকে খারাপ আহার্য দিলে যে পাপ ঘটে, বহুনজ্‌গকে খারাপ খাদ্য দিলে অপরাধীর সেই পাপ হইবে এবং তাহার দণ্ড হইবে ৭০ উপাজন।

সৎপিতার ঔরসে ও সুমাতার গর্ভে জাত এবং বুদ্ধিসম্পন্ন যুবককে খারাপ খাদ্য দিলে যে পাপ হয় ভৌরূণ অর্থাৎ অল্পবয়স্ক কুকুরকে খারাপ খাদ্য দিলে সেই পাপ হইবে। এই পাপের দণ্ড ৫০ উপাজন।

কুকুর পাগল হইয়া গেলে তাহাকে বাঁধিয়া রাখা গৃহস্থের কর্তব্য। এই কুকুর যদি কোন গর্তে, কূপে বা নদীতে পড়িয়া কষ্ট পায়, তাহা হইলে ইহার পালক গৃহস্থগণ পেশোতনুর পাপে পাপী হইবে।

উদ্‌বিড়ালকে হত্যা করার অপরাধ অত্যন্ত হীন অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইত। এই পাপ হইতে মুক্ত হইতে হইলে অপরাধীকে শুষ্ক, কঠিন ও সুপরীক্ষিত ১০০০০ কাষ্ঠভার অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া

আঘাতের দণ্ড তো আছেই। তাহারও সংখ্যা বিশ হাজার, ১০০০০ অশ্বায় দ্বারা এবং ১০০০০ স্রওশাচরণ দ্বারা। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক কঠোর দণ্ড তাহার প্রতি প্রযুক্ত হইত। এই সকল শাস্তির বিবরণেই বেন্দিদাদের চতুর্দশ অধ্যায় পূর্ণ।

পূর্বেই বলিয়াছি, পারসীক ধর্মশাস্ত্রে শুচিতার স্থান সর্বোপরি। সেই জন্যই শুচিতার নিয়ম লঙ্ঘন গুরুতর অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইত। ভূমি ও উদ্ভিদের সহিত মৃতদেহের কোন সংস্পর্শ ঘটাইলে অপরাধীকে কঠিন শাস্তি দিবার ব্যবস্থা ছিল। অগ্নি, জল প্রভৃতি মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর মধ্যে অশুচিতা প্রবেশ করিলে তাহা মানবদেহেও অতি সহজে সংক্রামিত হইতে পারে এইরূপ ধারণা প্রাচীন পারসীকগণের মধ্যে ছিল। অবশ্য বর্তমান যুগে আমরা বুঝিয়াছি অগ্নিতে (সর্ব্বপ্রকার না হউক, অন্ততঃ) অধিকাংশ অশুদ্ধিই নাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু জল, ভূমি ও উদ্ভিদের সম্বন্ধে আমরা প্রাচীন পারসীক ধারণারই অনুমোদন করি। কোন রোগের বীজ, কি কোন অনিষ্টকারী বস্তু ইহাদের সহিত সংসৃষ্ট হইলে তাহা বহু লোকের দেহ ও প্রাণ বিপন্ন করিতে পারে। একজন মানুষকে হত্যা করিলে শুধু সেই ব্যক্তিরই জীবন নাশ করা হয়, কিন্তু রোগের বীজ জল, ভূমি প্রভৃতিতে সংক্রামিত করিলে একাধিক লোকের জীবন বিপন্ন করা হয়। সুতরাং দ্বিতীয় অপরাধের শাস্তি প্রথম অপরাধের দণ্ডের তুলনায় অনেক বেশী কঠোর। একের অপেক্ষা বহুর মঙ্গল-সাধনের দিকেই সেযুগে অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া হইত। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা একেকেও উপেক্ষা করিতেন না।

মৃতদেহকে একান্ত অপবিত্র মনে করা হইত। দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হইবামাত্র যে পচন আরম্ভ হয় ইহা তাঁহারা বুঝিতেন ; সেই জন্য মৃত্যুর পর অধিক বিলম্ব না করিয়া শবের সৎকার করার নিয়ম ছিল। পারসীকগণ মৃতদেহকে অগ্নিতে দগ্ধ করিতেন না, ভূমিতে সমাহিত করাকেও তাঁহারা পাপ বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল, এই দ্বিবিধ সৎকারই সাধারণের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

মৃতদেহ অগ্নিতে দগ্ধ করিলে যে সাংঘাতিক পাপ হয় ইরানীয় শাস্ত্র অনুসারে তাহার কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই। মানুষেরই হউক অথবা কুকুরেরই

হউক—যে কোন মৃতদেহ ভূমিতে সমাহিত করিয়া ছয় মাস রাখিলে অপরাধীর দণ্ড হয় ৫০০ উপাজন। এক বৎসরের মধ্যেও যদি সেই মৃতদেহকে উত্তোলিত করা না হয়, তাহা হইলে দণ্ডের মাত্রা দ্বিগুণ হয়। এবং দুই বৎসর পর্যন্ত ঐ অবস্থায় রাখিলে অপরাধীর পাপের সীমা থাকে না। কোন দণ্ডের দ্বারাই তাহার পাপের প্রতিবিধান সম্ভব নহে।

মৃতদেহকে পর্বতের উচ্চতম স্থানে রাখিয়া আসাই ইরানীয় ধর্মশাস্ত্রের নিয়ম। এই ভাবে রাখিলে ঐ শবের মাংসাদি মাংসভোজী পশুপক্ষীরা ভক্ষণ করিয়া ফেলিতে পারে; সুতরাং ঐ দেহ হইতে মাংস বা অস্থিখণ্ড ও তৎসহিত রোগ-বীজ অন্যত্র যাইতে পারে না। কিন্তু ঐ মৃতদেহকে ভাল করিয়া আটকাইয়া না রাখিলে পশুপক্ষীসমূহ ঐ দেহ হইতে অস্থি মাংস মুখে করিয়া লইয়া গিয়া জলে বা বৃক্ষাদির উপরে ফেলিয়া চতুর্দিক বিষাক্ত কবিতে পারে। সেই জন্য নিয়ম আছে যে, মৃতদেহকে পর্বতের উচ্চতম স্থানে লইয়া গিয়া পিত্তল, প্রস্তর বা কর্দম দ্বারা বিশেষরূপে আটকাইয়া রাখিতে হইবে। এই নিয়ম লঙ্ঘনের দণ্ড ২০০ উপাজন।

মৃতদেহকে কোন ব্যক্তি একাকী বহন করিয়া লইয়া গেলে তাহার মৃত্যু-দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। সে ব্যক্তি আজীবন অপবিত্র থাকিবে। যদি অল্পবয়সে সে ঐ পাপ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত জল, অগ্নি ও মজ্‌দা-উপাসকগণের সান্নিধ্য হইতে কিছুদূরে কোন শুষ্ক এবং জনবিরল স্থানে একটি বেড়া দিয়া সেই অবরোধের মধ্যে তাহাকে রাখা হইবে। আহারের জন্য নিকৃষ্ট খাদ্য এবং পরিধানের জন্য অতি জীর্ণ বস্ত্র তাহাকে দেওয়া হইবে। এইরূপে কালাতিপাত করিয়া বার্ধক্যে উপনীত হইলে তাহার শিরশ্ছেদন করিয়া ক্ষুধার্ত পশুপক্ষীর দ্বারা তাহার মৃতদেহটি ভক্ষণ করানো হইবে।

কোন মানুষ বা কুকুর যে গৃহে প্রাণত্যাগ করে, সে গৃহ হইতে অগ্নি এবং ধর্মানুষ্ঠানের দ্রব্যসামগ্রী অন্যত্র সরাইয়া ফেলিতে হইবে এবং গ্রীষ্মকালে নয় রাত্রির পূর্বে ও শীতকালে এক মাসের পূর্বে ঐ অগ্নি ফিরাইয়া আনা চলিবে না। এই নিয়মের লঙ্ঘনে অপরাধীর ২০০ উপাজন দণ্ড হইবে। মৃতদেহকে সমাহিত করিলে যেরূপ পাপ হয়, যে ভূমিখণ্ডের উপর কোন মানুষ বা কুকুর প্রাণত্যাগ করে সেই ভূমিখণ্ডে এক বৎসরের মধ্যে বীজ বপন বা জল সেচন

করিলেও সেইরূপ পাপ হইবে। এই পাপে অপরাধী পেশোতনু আখ্যা পাইবে। কোন মজদাধর্মী সেই ভূমিখণ্ড কর্ষণ করিয়া বীজ বপন ও জল সেচন ইত্যাদি করিবার ইচ্ছা করিলে সে সর্বপ্রথমে মৃতদেহের অস্থি, কেশ, মল-মূত্রাদি অন্বেষণ করিয়া দেখিবে তাহা না করিলে সে পেশোতনু হইবে।

মেদমজ্জাযুক্ত অস্থি—কুকুরেরই হউক অথবা মানুষেরই হউক—ভূমিতে নিক্ষেপ করিলে বিভিন্ন দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। অস্থিখণ্ডের আকারের ক্ষুদ্রত্ব বা দীর্ঘত্ব অনুসারে দণ্ডও লঘু ও গুরু হইত। কনিষ্ঠ, তর্জনী এবং মধ্যমা অঙ্গুলীর সর্বশেষ গ্রন্থির আকারের অস্থিখণ্ড নিক্ষেপের জন্য যথাক্রমে ৩০, ৫০ ও ৭০ উপাজন দণ্ডের ব্যবস্থা দেখা যায়।

একটি পঞ্জর বা অঙ্গুলীর আকারের অস্থিখণ্ড নিক্ষেপের দণ্ড ৯০ উপাজন। অস্থিখণ্ড যদি ঐ আকারের দ্বিগুণ হয় তাহা হইলে দণ্ডের মাত্রা দ্বিগুণের অপেক্ষাও অধিক হইবে এবং অপরাধী পেশোতনু বলিয়া আখ্যাত হইবে। বাহু বা উরুর অস্থির আকারের অস্থিখণ্ড নিক্ষেপের দণ্ড ৪০০ উপাজন। নরকপালের আকারের অনুরূপ অস্থি নিক্ষেপের দণ্ড হইবে ৬০০ উপাজন। কুকুরের বা মানুষের একটি অখণ্ড মৃতদেহ নিক্ষেপের শাস্তি ১০০০ উপাজন।

কোন ব্যক্তি নির্জন স্থানে মৃতদেহ স্পর্শ করিলে তাহার কর্তব্য হইবে মানুষের বাসস্থানের নিকটে আসিয়া কাহাকেও ডাকিয়া নিজের শুদ্ধিবিধান করা। তাহা না করিয়া জল বা বৃক্ষ স্পর্শ করিলে ৪০০ উপাজন দণ্ড হইবে। মজদাধর্মানুমোদিত রীতি না জানিয়া যে ব্যক্তি অশুচির শুদ্ধিবিধান করিতে যায় সে নিকৃষ্টতম পাপী। তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত প্রাণদণ্ড।

মৃতদেহকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিলে পশুপক্ষীর আহারের ব্যাঘাত জন্মানো হয় এবং গলিত মৃতদেহ অধিক দিন ধরিয়া পচিবার সুবিধা পায়। এই জন্য মৃতদেহের উপর কোন প্রকার বস্ত্রাদির আবরণ দেওয়া নিষিদ্ধ। আবরণ দিলে দণ্ডের ব্যবস্থা আছে এবং ঐ আবরণ যত বড় হইবে দণ্ডের পরিমাণও সেই পরিমাণে বেশী হইবে। কেবল পদতল ঢাকিবার উপযোগী এক খণ্ড বস্ত্র মৃত-দেহের উপর নিক্ষেপ করিলে ৪০০ উপাজন, দুইটি পা ঢাকিবার উপযোগী কোন আবরণ দিলে ৬০০ উপাজন এবং সম্পূর্ণ দেহ ঢাকিবার উপযোগী বস্ত্র নিক্ষেপ করিলে ১০০০ উপাজনের ব্যবস্থা আছে।

স্ত্রী-পুরুষের নৈতিক আচরণ সম্পর্কীয় বিধি-বিধান অতিশয় কঠোর ছিল। যজ্ঞানুষ্ঠান, অপকারী জীবজন্তুর প্রাণনাশ এবং জলস্রোতের উপর সেতু নির্মাণ প্রভৃতি জনহিতকর কার্যের দ্বারা ঐ বিবিধ নৈতিক পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান ছিল।

প্রাচীন ইরানের নরনারী সম্বন্ধ

প্রাচীনকালে ইরানদেশে মজদাধর্ম নামে একটি ধর্ম প্রচলিত ছিল। জরথুশ্‌ত্র এই ধর্ম প্রথম প্রচার করেন বলিয়া ইহাকে জরথুশ্‌ত্রীয় ধর্ম, এই নামেও অভিহিত করা হয়। বোম্বায়ের পারসীক সম্প্রদায় এই ধর্মের উপাসক। জরথুশ্‌ত্রীয় ধর্ম সম্বন্ধীয় বিধি-বিধান অবেস্তা নামক প্রাচীন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এই অবেস্তাকে পারসীকদের বেদ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বরং ইহা আরও কিছু বেশী। কারণ, ইহা একাধারে শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ই। অবেস্তা ব্যতীত কয়েকটি প্রাচীন পহ্লবী গ্রন্থেও এই ধর্ম সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়।

প্রাচীন পারস্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল কিনা, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতের বিভিন্নতা দেখা যায়। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের একটি উক্তি হইতে দেখা যায় যে, প্রাচীন পারস্যে অনেকেই একাধিক ধর্মপত্নী গ্রহণ করিতেন এবং তদুপরি কয়েকটি গণিকাও প্রতিপালন করিতেন। অবেস্তার একটি ছত্রে লিখিত আছে যে, "পুণ্যবানের গৃহ পুত্রকলত্রে পরিপূর্ণ।" এ সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছু জানা যায় না। বর্তমানে পারসীক সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত নাই।

প্রাচীন পারস্যের বৈবাহিক সম্বন্ধ কিরূপ ছিল, সে বিষয়েও পাশ্চাত্ত্য ও পারসীক পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদের অবকাশ আছে। তবে এ-কথা বলা যায় যে নিকট সম্বন্ধের মধ্যে বিবাহে কোন বাধা ছিল না। পারসীকগণের মত এই যে, খুল্লতাত বা জ্যেষ্ঠতাত পুত্রের বা অনুরূপ সম্বন্ধযুক্ত আত্মীয়ের সহিত কন্যার বিবাহই প্রশস্ত ছিল। এরূপ বিবাহ পারসীকগণের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে।

ইরানীয় ধর্মে বিবাহের স্থান খুব উচ্চে। উপযুক্ত কালে বিবাহ না করাকে তদানীন্তন সমাজে একরূপ অপরাধ বলিয়াই গণ্য করা হইত। অবিবাহিত পুরুষ বা স্ত্রীলোক দেবতাদের দৃষ্টিতেও নিন্দনীয় ছিল।

বয়স্থা কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ না করিয়া তাহার অপত্যরোধ করিলে পিতাকে পাপভাগী হইতে হইবে—জরথুশ্‌ত্রীয় ধর্মশাস্ত্রে এরূপ নির্দেশ আছে।

বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য পুত্রলাভ। অপুত্রক পুরুষ ও বন্ধ্যা রমণীর জীবন নিষ্ফল। স্বর্গদ্বার তাহাদের জন্য সহজে অবারিত হয় না। দেবতাগণের প্রসাদ হইতে তাহারা চিরদিনের জন্য বঞ্চিত থাকে।

ইরানীয় ধর্মশাস্ত্রে বর-কন্যার বিবাহযোগ্য বয়স পঞ্চদশ বৎসর। পনেরো বৎসর বয়সই যৌবনারম্ভের কাল বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। বিবাহের ব্যবস্থা অভিভাবকগণই করিতেন। কোন কোন রমণী স্বয়ম্বরা হইয়াছেন এরূপ দৃষ্টান্তও নিতান্ত বিরল নয়। কোন যুবক কোন কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হইলে পাত্র স্বয়ং ঘটক দ্বারা সেই কন্যার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইত, এরূপ রীতিও ছিল।

ইরানের আদর্শ স্বামীর অনেক গুণে গুণী হওয়া আবশ্যক। কুমারীর প্রার্থনা মন্ত্রগুলি হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্বান, বুদ্ধিমান, রূপবান, শক্তিশালী, মিষ্টভাষী, সুখদাতা, সুচতুর, ললিত-কলা-নিপুণ, নির্ভীক, তেজস্বী, স্বধর্মনিষ্ঠ, উৎসাহী, দীর্ঘকায়, দীপ্তনেত্র, দীর্ঘবাহু, ক্ষুদ্রগুল্ফ, পৌরুষশালী, স্মরমান, সুমনা, ন্যায়বান এবং মজদা উপাসক হইলে তবেই আদর্শ স্বামী হওয়া যায়। কিন্তু দেহে যৌবন না থাকিলে যত গুণই থাকুক না কেন, সবই ব্যর্থ হইয়া যায়।

পুরুষের নিকটে নারীর যাহা কাম্য সে সম্বন্ধে কিছু বলা হইল। এখন নারীর নিকট হইতে পুরুষ কি চান, তাহা দেখুন। রূপবতীর প্রতি যে আকর্ষণ ছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। তাঁহাদের রূপের আদর্শ আমাদের আদর্শ হইতে বিশেষ স্বতন্ত্র ছিল না, ক্ষীণ কটি, অখর্ব আয়তন, সুগঠিত পয়োধর এবং সুবিন্যস্ত দেহ রমণীর রূপের প্রধান অঙ্গ। সদ্বংশসম্ভবা, অনন্যস্পৃষ্টা এবং মধুর-স্বভাবা কন্যাই পরিণয়যোগ্যা বলিয়া বিবেচিত হইত। গণিকা বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল।

বিবাহিতা রমণীর পক্ষে স্বামীর আনুগত্য, সুচিন্তা, সদালাপ ও সৎকর্মের প্রতি অনুরাগ, দূরদৃষ্টি, স্বধর্মানুশীলন, সৎচরিত্র, গার্হস্থ্য কর্মে মনোযোগ—এইগুলি সদ্‌গুণ বলিয়া বিবেচিত হইত। ধর্মান্তরে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন নিষিদ্ধ ছিল।

পরিণীতা পত্নীর ভরণ-পোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পুরুষের উপরই অর্পিত ছিল।

স্বামীই স্ত্রীর প্রভু, ভর্তা ও গুরু। স্ত্রী স্বামীর সহধর্মিণী, সেবিকা এবং শিষ্যা। পত্নীর প্রতি প্রীতি—স্বামীর পক্ষে প্রশংসনীয় হইলেও স্ত্রৈণতাকে সর্বদা নিন্দা করা হইত।

নারীকে গৃহপত্নী ও পুরুষকে গৃহপতি বলিয়া অভিহিত করা হইত। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, সংসারের সমস্ত দায়িত্ব স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই সমানভাবে বহন করিতে হইত। সেরূপ শক্তি থাকিলে নারীর গৃহকর্ম ব্যতীত অন্য কাজ করিবার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। সম্পত্তির তত্ত্বাবধান এবং ধর্মোপদেশ দান প্রভৃতি যে সকল কাজ একান্ত পুরুষোচিত বলিয়া মনে হয় সে সকল কাজও কোন কোন নারী স্বীয় শক্তিবলে নির্বাহ করিতেন।

পরিণীত জীবনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সমাজহিতৈষীদিগের বিশেষ চেষ্টা ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। ব্যভিচারের প্রতি যে উৎকট ঘৃণার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতেই এই অনুমানের সত্যতা নির্ধারণ করা সম্ভব। গণিকাকে ঘৃণ্যতম জীব বলিয়া মনে করা হইত। জারজ সন্তানের সমাজে স্থান ছিল না। বলপূর্বক সতীত্ব নাশের অপরাধে পুরুষেরই দণ্ড হইত। স্ত্রীলোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এরূপ প্রমাণ পাওয়া গেলে সেই নারীর প্রতি কোনরূপ শাস্তি প্রয়োগ করা হইত না এবং এইরূপ নারীকে সমাজে গ্রহণ করার পক্ষে সম্ভবতঃ কোন বাধা হইত না।

ব্যভিচারের দণ্ড নরনারী উভয়কে সমান ভাবেই গ্রহণ করিতে হইত। পরলোকেও শাস্তির ভয় ছিল।

ব্যভিচারের নিন্দা প্রসঙ্গে আরও বলা হইয়াছে যে, যে নারী ব্যভিচারিণী, তাহার চক্ষু পড়িলে ফলবান বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া যায়, তাহার বাক্য শ্রবণ করিলে পুণ্যবান ব্যক্তির পুণ্যরাশি অন্তর্হিত হয়। তাহার দৃষ্টির তাপে স্রোতস্বিনীর ধারা শুকাইয়া যায়।

ইরানীয় ধর্মশাস্ত্রে শুচিতার স্থান ছিল সর্বোচ্চ। শুচিতার প্রতি শাস্ত্রকারদের মনোযোগের পরিচয় সর্বদা পরিলক্ষিত হয়। শুচিতার সহিত স্বাস্থ্যের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, একথা তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন।

বাংলা বানান

বাংলা বানানে অজস্র অসংগতি আছে—একথা সকলেই মানেন। যাঁহারা বানানে ভুল করিয়া থাকেন, তাঁহারা তো মানেনই যাঁহারা করেন না তাঁহারাও।

বানানে অসংগতি সত্ত্বেও সাবধান হইলে শুদ্ধ বানান লেখা চলে, আবার অসতর্ক হইলে বানানপদ্ধতির অতিশয় সুসংগতি সত্ত্বেও লেখক এবং লেখাকে বাঁচাইতে পারে কাহার সাধ্য ?

বানানে অসংগতি আছে। কেহ 'গরিব' লেখেন, আবার কেহ-বা লেখেন 'গরীব'। 'সরবত, শরবত, শরবৎ'—তিন রকম বানান দেখিতে পাই। 'সরবৎ' দেখিয়াছি কি না মনে করিতে পারিতেছি না; তাহা হইলে আরও একটা রূপ বাড়ে। 'সোণা' না 'সোনা' ? 'গাড়ী' না 'গাড়ি' ? 'পাখী' না 'পাখি' ? 'চুণ' না 'চূন' না 'চুন' ? 'মাসী-পিসী' না 'মাসি-পিসি' ? মশলা 'বাটা' না 'বাঁটা' ? আগা থেকে কোথা পর্যন্ত ? 'গোড়া' না 'গোঁড়া' ? 'পুজো' না 'পূজো' ? 'পূজারিণী' না 'পুজারিনি' ? না আর কিছু ? 'রাণী' না 'রানি' ? নাকি 'রানী' ? 'কেরাণী' সম্বন্ধেও ঐ প্রশ্ন ? 'কাজ, জাঁতা, জো, জোড়' না 'কায যাঁতা যো যোড়' ? কাল (black) না কালো ? 'ভাল' (good) না 'ভালো' ? 'মত' (ন্যায়) না 'মতো' ? 'কোন্' (which) না 'কোন' ? 'কোন' (any) না 'কোনো'। না কোন ? 'এতো ততো যতো' না 'এত তত যত' ? 'তো হয়তো না 'ত হয়ত' ? 'রং' না 'রঙ' ? 'সং' না 'সঙ' ? 'ভাঙা' না 'ভাঙ্গা' ? 'আঁশ' এবং 'আঁষ' দুই চলিবে কি ? 'ফরসা ফরশা' 'উসখুস উশখুশ', 'তোশক তোষক', 'মুনশী মুন্সী,' 'সহিদ শহিদ শহীদ,' 'সোরগোল শোরগোল', 'বারকোশ বারকোষ', 'হুঁশ হুঁস', 'হুঁশিয়ার হুঁসিয়ার', 'শেমিজ সেমিজ', 'নকশা নক্সা', 'লশকর লস্কর', 'শামিয়ানা সামিয়ানা', 'শাবাস সাবাস', 'শখ সক সখ', 'সৌখিন শৌখিন শৌখীন', 'দুশমন দুষমন', মুশকিল মুস্কিল', 'রেজেস্টারি রেজেস্ট্রী', 'শয়তান সয়তান', 'শরম সরম'—লিখিতে বসিলেই ভাবিতে হয়, কোন্‌টা লিখি ?

যে ভাষাতেই এরূপ সংশয়ের স্থান আছে, সেই ভাষাকেই ত্রুটিসম্পন্ন বলিতে হইবে। বাংলা ভাষায় এ ত্রুটি অনেক। তাই সংস্কারের কথা উঠে। কি ভাবে সংস্কার করা যাইবে, অনেকে তাহার অনেক রকম প্রস্তাব করেন। রবীন্দ্রনাথ একাধিকার নিজের রচনায় বানান সংস্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় একটি সমিতি গঠন করিয়া সেই সমিতির হাতে বানান সংস্কারের ভার দেন। সে-সমিতি বানান সংস্কারের যে প্রস্তাব রচনা করেন, তাহা মোটামুটি মানিয়া লওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র তাহা অনুমোদন করেন। শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে তাহা অনুসৃত না হইলেও রবীন্দ্র-রচনাবলীতে ঐ পদ্ধতি প্রায় সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয়। দুই-একটি পত্র-পত্রিকাও ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। আমার মনে আছে, নরেন্দ্র দেব সম্পাদিত 'পাঠশালা' পত্রিকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানান গ্রহণ করা হইয়াছিল। কোন কোন লেখক নিজ নিজ রচনায় ঐ বানান অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। অধিকাংশই এ বিষয়ে মনোযোগ দেন নাই। বড় ডাক্তার নিজের হাতে সিরিঞ্জ ধরেন না—তাঁহার ফী বত্রিশ-চৌষট্টি—ইঞ্জেকশন দেয় ২ টাকা মূল্যের নূতন পাশ-করা ডাক্তার অথবা কম্পাউণ্ডার—ছুঁচ মোটা কি সরু, ভাঙা কি গোটা, সেটা দেখিবার দায়িত্ব তাহারই। বড ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখিয়াই খালাস। বড় লেখকেরাও প্রেস-প্রকাশক প্রুফ-রীডারের হাতে পাণ্ডুলিপি তুলিয়া দিয়াই হাঁফ ছাড়েন। তাঁহারা ভাবেন, মাঝে মাঝে বলেনও, অতঃপর অথবা ইতঃপূর্বে তাঁহাদের করণীয় বা চিন্তনীয় আর কিছুই নাই। এতৎসত্ত্বেও কোন কোন পুস্তক বিনা ভুলে বাহির হইয়া আসে, সে কেবল লেখকের এবং পাঠকের অদৃষ্ট।

অসংগতি এক জিনিস, ভুল আর এক। একবার 'রাণী চুণ শরম শয়তান মাষ্টার ষ্টেশন' লিখিয়া পরক্ষণেই যদি 'রানী চুন সরম সয়তান মাস্টার স্টেশন' লিখি, তাহা হইলে লেখককে অসংগতির জন্য দোষ দিব। কিন্তু তিনি যদি সমগ্র রচনার মধ্যে বরাবর 'উজ্জল উচিৎ কুৎসিৎ পৌরহিত্য' লিখিয়া যান, তাহা হইলে শিক্ষিত চিন্তাশীল সমাজ তাঁহাকে ক্ষমা করিবে না। ইহাকে বানান ভুল বলে—এবং বানান ভুলকে অনেকে সুশিক্ষার পরিচায়ক বলিয়া মনে করেন না।

বানান সংস্কারের প্রস্তাব সমীচীন প্রস্তাব এবং বানান সংস্কারের অবকাশ এখনও অবশ্যই আছে—বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তের পরেও আছে—তাহা মানি। কিন্তু আমরা যে বানান ভুল করিয়া থাকি, সুসংস্কৃত বানানপদ্ধতির অভাবই তাহার একমাত্র কারণ নয় বলিয়া আমার বিশ্বাস। এবং নূতন করিয়া বানান সংস্কার করিয়া দিলেই যে লেখকদের কলমে শুদ্ধরূপ ঝরিয়া পড়িবে—এমন কথা ভাবিতেও ভরসা হয় না। শুধু লেখককেই বা দোষ দিই কেন? সারা দেশটা ভুল বানান লিখিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া আছে। সর্বস্বত্ব সংরক্ষণে যাঁহারা সর্বাধিক তৎপর, তাঁহাদের কয়জন 'স্বত্ব' বানানটা ঠিক করেন? 'স্বত্ব' তো আর লেখকের নয়। সকল 'সত্ব' যাঁহারা শোষণ করেন, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি।

পৌরোহিত্য যাঁহাদের পেশা ছিল, তাঁহারা এখন বেকার। এবং নবতম যজমানের দল নূতনতর অনুষ্ঠানে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হইতে রাজ্যপাল পর্যন্ত মাতব্বরদের ধরিয়া 'পৌরহিত্য' করাইয়া লইতেছে।

"উচিত বলিব, বন্ধু বিগাড়ে বিগাড়ুক।"—আগে অনেকের সে সাহস ছিল। আজকাল উচিত বলিতে লোকে ভয় পায়। কিন্তু উচিত লিখিতে ভয়টা কোথায়? তবু তো উচিত লেখে না, লেখে 'উচিৎ'। রঞ্জিৎ নামধারী অনেক বালকের খাতা দেখিতে পাই, নামের বানান কাটিলে পাছে পুত্রের পিতা অসন্তুষ্ট হন, এই ভয়ে হাত দিই না।

একবার কবি ও শাব্দিক বিজয়চন্দ্র মজুমদারের মুখে একটি গল্প শুনিয়া ছিলাম। এক ভদ্রলোকের নাম জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন—শ্রীবিশকেশন বসু! কি? আবার বলিলেন—বিশকেশন বসু। বিশকেশন? হিন্দী কিষণ বা কিষেণ কি ঐরকম কিছু হইবে বোধ হয়। কিন্তু তাহাই বা কেমন করিয়া হয়—ভদ্রলোক যে খাঁটি বাঙালী, আবাল্য বাস বাংলা দেশেই। বাবা নামটি দিয়াই স্বর্গে গিয়াছেন। কিন্তু তাহার পূর্ব পর্যন্ত এই দেশেই ছিলেন। যাহাই হউক, বিশকেশনবাবু তো গেলেন, কিন্তু এমন একটি শব্দব্রহ্ম ছাড়িয়া গেলেন যে শাব্দিকের মাথায় তাহা বন বন করিয়া ঘুরিতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে অমরসিংহ হাতের কাছেই ছিলেন, তাই রক্ষা। বোঝা গেল, 'বিষ্বক্‌সেনো জনার্দনঃ'—বিষ্ণুর এক নাম বিষ্বক্‌সেন। 'উচ্ছাস, উত্যক্ত, পুঙ্খানুপুঙ্খ, সম্মান,

জ্যোতীন্দ্র, লক্ষ্মীমান, পঙ্ক, সন্থোত্থিন্ন, পৈত্রিক, উৎপাৎ, কৌতুক, কৌতুহল, প্রজ্জলিত, স্তুপ, লজ্জাস্কর'—এ ধরণের বানান তো যখন তখন দেখা যায়। এ সকল ক্ষেত্রে ভুল হয় কেন? এ কি ভাষার দোষ? উচ্ছ্বাস=উৎ+শ্বাস। এখানে ব লোপের তো কোন উপায় নাই। কোন বৈয়াকরণ কোন কালে এস্থলে ব লোপের বিকল্প বিধান করেন নাই। উত্যক্ত=উৎ+ত্যক্ত। কেন তুমি একটা ত লিখিয়া বাংলা ভাষার প্রতি করুণা বর্ষণ করিবার স্পর্ধা দেখাইবে? পুঙ্খ শব্দের অর্থ বাণমূল। এ শব্দের মানে-বানান তোমার জানিবার কথা নয়। পুঙ্খানুপুঙ্খ যদি লিখিতেই হয়, অভিধান দেখিয়া লও। তাহাও দেখিবে না অথচ পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ লিখিবে এবং বানানপদ্ধতির অসংগতির জন্য বাংলা ভাষার প্রতি কটূক্তি করিবে! 'আকাঙ্ক্ষা' যে 'কাঙ্ক্ষ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন, তাহা সকলে জানিবে, এমন আশা কে করে? কিন্তু 'আকাঙ্ক্ষা' লিখিবার সময় কাহাকেও একবার জিজ্ঞাসা করিয়া লও না কেন? যে জানে, সে বলিয়া দিবে, এ বানানে কোন অসংগতি নাই। আকাঙ্ক্ষাই শুদ্ধ বানান এবং একমাত্র বানান, আর যাহা কিছু লিখিবে, তাহাই ভুল। স্ত্রীলোকের নামের গোড়ায় 'শ্রীমতি' যাঁহারা লেখেন, তাঁহাদের মতি লইয়াই মতিভ্রম। শ্রীমতীতে মতি নাই। 'শ্রীমৎ' শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ অথবা ঈ প্রত্যয় করা হইয়াছে। দেশের বড়লোকেরা নিজের পুত্রকন্যাদের মেম সাহেবের স্কুলে তুলিয়া দিয়া মধ্যে মধ্যে সভামঞ্চে উঠিয়া সংস্কৃত ভাষাকে 'লিঙ্গুয়াফ্রাঙ্কা' করিবার 'আওয়াজ তুলেন'। কাজের বেলায় সংস্কৃতের প্রতি সকলের সমান দরদ। সুতরাং শ্রীমতী শব্দের ব্যুৎপত্তি জানিয়া লোকে 'শ্রীমতী' বানান করিবে, এমন আশা করিবে কে? যে লিখিবে, সে বানান শিখিবে, মুখস্থ করিয়া শিখিবে, খাতায় বার বার লিখিয়া বানান অভ্যাস করিবে। diarrhoea, phthisis, bronchitis-এর কথা না-হয় ছাড়িয়া দিলাম কিন্তু receive, believe, please, leisure, rough, ought, awful এসব বানান কি করিয়া শিখি? ব্যুৎপত্তি বিচার করিয়া নিশ্চয় নয়। তবে বাংলার বেলায়ই বা অবহেলা করিব কেন, অনবহিত হইব কেন?

বাংলা বানান সংস্কারের প্রয়োজন আছে—একথা আবার বলি। কিন্তু সংস্কার হয় নাই বলিয়াই যে আমরা ভুল করিয়া থাকি তাহা সত্য নয়—এই

কথাটাও আর একবার স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিই। ভাষার যে সকল শব্দের বানান সর্বজনস্বীকৃত, যেখানে ভুল করিবার কোন সংগত কারণ নাই, সেখানেও ভুল করি অজ্ঞতাবশতঃ। ইংরেজীর বানানে অজ্ঞতা বাহির হইলে লজ্জা পাই, বাংলায় পাই না।

এখন ছাই ফেলিতে একটি—একটি নয় দুইটি—ভাঙা কুলা সর্বদাই ব্যবহৃত হয় দেখিতে পাই। এক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—স্বর্গে গিয়াও তাঁহার নিস্তার নাই। আর এক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—নৈর্ব্যক্তিক প্রতিষ্ঠান। এখন যেই ভুল করুক না কেন ধরিয়া দিলেই হয়, বলে রবীন্দ্রনাথের বানান, নহিলে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান।—একজন বিদেহী, আর একজন বহুদেহী। মানহানির অভিযোগ করিবে কে?

প্রেস কাপি

মুদ্রণের সমস্ত দায়িত্ব মুদ্রাকরের নয়, প্রকাশকেরও নয়—লেখকদের এই কথাটা সাধারণতঃ মনে থাকে না। তাঁহাদের ধারণা, প্রকাশকের হাতে পাণ্ডুলিপিটা তুলিয়া দিলেই তাঁহাদের দায় চুকিয়া গেল, তাহার পর কলে কাজ হইয়া যাইবে। কলে কাজ কিছুটা হয় সত্য, কিন্তু সে অতি সামান্যই, বেশির ভাগ ছাপার কাজ—বিশেষত বাংলা বই ছাপার কাজ—হয় মানুষের হাতেই। আর ইহার মধ্যে গ্রন্থকারের অংশ কম নয়। গ্রন্থকারের অনেকটা গলদ অন্যকে সারিতে হয়, তাহাতে বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হয়। তৎসত্ত্বেও ছাপার দোষ থাকিয়া যায়।

পাণ্ডুলিপি—ছাপাখানার পরিভাষায় কাপি, লেখকের পরিভাষায় প্রেস কাপি অর্থাৎ প্রেসে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত কাপি—মুদ্রণীয় পুস্তকের প্রথম এবং প্রধান উপকরণ। এই উপকরণটি ভাল হইলে ছাপার কাজ অনেক সুকর হইয়া যায়।

বাংলা টাইপরাইটার এখনও ইংরেজীর ন্যায় ব্যবহারযোগ্য হয় নাই। ইংরেজী টাইপরাইটারের সাহায্যে যে বাংলা বইয়ের কাপিও প্রস্তুত করা সম্ভব, তাহা বলিতে গেলে দেশের শিক্ষিত লোকেরা অট্টহাস্য করিয়া উঠিবেন। অগত্যা বাংলা বইয়ের কাপি হাতেই লিখিতে হয়। কাজেই হাতের লেখাটি মুক্তার মত সুন্দর না হয় না হউক, স্পষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক। কম্পোজিটার লেখাই যদি পড়িতে না পারিল তো টাইপ সাজাইবে কি করিয়া? সে নিত্যনৈমিত্তিককে 'নিত্যধন মিত্তির' করিয়া বসিল। কেমন করিয়া করিল তাহা নিম্নলিখিত ক্রমবিবর্তনের ধারাটি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে: নিত্যনৈমিত্তিক > নিত্য টন মিত্তিক > নিত্যধন মিত্তক > নিত্যধন মিত্তির। প্রকাশকরা আজকাল অধিকাংশই শিক্ষিত। তাঁহাদের কেহ কেহ বড় বড় মাসিক পত্রিকার সম্পাদক; গল্পলেখক এবং ঔপন্যাসিকের সংখ্যাও কম নয়। তাঁহারা অত্যন্ত সতর্ক। শেষ প্রুফ তাঁহারা—প্রুফরীডার থাকিলেও—নিজেরা যত্ন করিয়া দেখেন, তবে প্রিন্ট অর্ডার দেন। আর যাঁহাদের প্রুফরীডার নাই (এবং অধিকাংশেরই এই অবস্থা) তাঁহাদের তো কথাই নাই। এখন প্রকাশক

অর্ডারপ্রুফ হাতে লইয়া 'নিত্যধন মিত্তির' দেখিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। উপন্যাসের মধ্যে যতজন মিত্র আছেন তাঁহাদের একজনও অপভ্রষ্ট হন নাই, তবে নিত্যধনের অধঃপতন হইবে কেন? তিনি মিত্তির কাটিয়া মিত্র করিয়া দিলেন—মিত্রদের সহিত সংগতি রক্ষা হইল।

তাই বলিতেছিলাম কাপিটা পরিষ্কার রাখা ভাল, তাহা হইলে নিত্য-নৈমিত্তিক নিত্যধন মিত্র হইতে পায় না।

অনেক নামকরা পণ্ডিত আছেন যাঁহাদের কাপি লইয়া কম্পোজিটারদের মধ্যে ঝগড়া বাধে, তাঁহাদের কাপি প্রত্যেকেই অন্যের ঘাড়ে চাপাইতে চায়।

কাপির লেখা শুধু স্পষ্ট হইলেই চলিবে না, পরিচ্ছন্ন হওয়াও আবশ্যক। এক আকারের কাগজে উপরে ও বাঁ পাশে একটু করিয়া ফাঁক (মার্জিন) রাখিয়া লেখা উচিত। লিখিত লাইনের দৈর্ঘ্য একরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠার লাইনের সংখ্যাও একরূপ হওয়া ভাল।

ধরুন, আপনি রুলটানা এক্সারসাইজ বুকে লিখিতেছেন। এক্সারসাইজ বুকগুলি সাধারণত দৈর্ঘ্যে ৮½", এবং প্রস্থে ৬½" হইয়া থাকে, আর উহার লাইনের সংখ্যাও হয় সাধারণত কুড়ি। এরূপ খাতার প্রতি পাতার (উপরে ও বামে এক ইঞ্চি করিয়া বাদ দিয়া লিখিলে) পৃষ্ঠায় ৫½" দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ২০ লাইন লেখা ধরিবে।

মনে করুন ১০০ পৃষ্ঠার উপন্যাসের একটি কাপি লইয়া প্রকাশকের নিকট উপস্থিত হইলেন। লেখক হিসাবে বাজারে আপনার নাম থাকিলে প্রকাশক আপনাকে আপ্যায়ন করিয়া বসাইবেন, তাহার পর বইয়ের বাজারের 'বর্তমান' দুরবস্থার কাহিনী করুণ মর্মস্পর্শী ভাষায় বিবৃত করিয়া আপনার কাপিটি রাখিয়া যাইতে বলিবেন। আপনি অভিজ্ঞ লেখক, আপনি প্রকাশকের সব কথায় সায় দিয়া যাইবেন এবং তাঁহারা যে নিজের স্বার্থ সম্পূর্ণ ভুলিয়া শুধু দেশের স্বার্থে বই ছাপাইয়া যাইতেছেন তাহা অম্লানবদনে স্বীকার করিবেন। অনন্তর সাহিত্য, সিনেমা, সাহিত্যিকের মোটরগাড়ি, সেকেণ্ডারি বোর্ড এবং পাঠ্যপুস্তকের সিলেবাস সম্পর্কে আলোচনা শেষ করিয়া—শেষ করিয়া ঠিক নয়, মুলতুবি রাখিয়া—উঠিবার সময় বইটার প্রথম সংস্করণের দরুন শ-পাঁচেক টাকা আগাম চাহিয়া বসিবেন।

প্রকাশক অগ্রিম টাকার কথা শুনিয়া আপনার মূঢ়তার জন্য প্রথমে বিস্ময় প্রকাশ করিবেন। কিন্তু তাঁহার গরজ প্রবল এবং আপনার অধ্যবসায় অদম্য হইলে শেষ পর্যন্ত একটা রফা হইবে। তিনি আপনাকে দুই-শ টাকার একটি চেক দিয়া বইয়ের কপি-রাইট চিরকালের মত কিনিয়া লইতে চাহিবেন। আপনার বাজারদর যতই চড়া হউক না কেন, দুইটি কন্যা ক্লাসে উঠিয়াছে, নূতন বই কিনিতে হইবে। স্কুলের মাহিনা আর তাহার সহিত ঐ যে সেসন্‌স চার্জ না কি বলে তাহা দিতে হইবে। সরস্বতীপূজার চাঁদাও আছে কয়েকদফা ইস্কুলে কলেজে এবং বারোয়ারিতে। তাহাদেরও অনেক দল, কাহাকেও রুষ্ট করা চলিবে না। ছেলে বি. এ. পরীক্ষা দিবে, ডিসেম্বর হইতে মে মাস পর্যন্ত ছয় মাসের মাহিনা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ফী। চিন্তা করিলে চিত্ত চমৎকৃত হয়। গৃহিণীর গোল্ডকোটেড ব্রোঞ্জের চুড়ি ক-গাছায় টান পড়িয়াছে, আপনি আর কতক্ষণ পারিবেন? বলিলেন,—তা ভাই কপিরাইটটা বরাবরের জন্য লইবে লও, কিন্তু টাকাটা পুরা পাঁচ-শই দাও।

তখন কথা উঠিবে, বইটা কত বড় হইবে? প্রকাশকের পরিভাষায় কয় ফর্মা? যতগুলি পৃষ্ঠা একসঙ্গে ছাপা যায় তাহার নাম ফর্মা। এক তা কাগজে সাধারণত আট পৃষ্ঠা ও ষোল পৃষ্ঠা ছাপা হয়।

যে কাগজে বই ছাপা হয় তাহার ভিন্ন ভিন্ন আকার অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। কয়েকটি নাম ও মাপ নীচে দেওয়া হইল:

ক্রাউন	—	১৫″×২০″
ডবল ক্রাউন	—	২০″×৩০″
ইম্পিরিয়াল	—	২২″×৩২″
ডিমাই	—	১৭½″×২২½″
রয়াল	—	২৫″×২০″

পুরা তা কাগজের উপর ছাপা পড়ে, তাহার পর বাঁধাইবার সময় তাহা ভাঁজ করা হয়। এক তা ডবল ক্রাউন কাগজের আকার ২০″×৩০″। উহাকে আড়াআড়ি কাটিয়া দু-ভাগ করিয়া লইলে ১৫″×২০″ আকারে দুই শীট কাগজ হয়। এই কাগজগুলির প্রত্যেটিকে দুইবার আড়াআড়ি ভাঁজ করিয়া লইলে প্রত্যেকটি হইতে ৫″×৭½″ সাইজের ১৬টি করিয়া পৃষ্ঠা পাওয়া যাইবে।

এইরূপ ষোল পৃষ্ঠা ছাপা (এবং ভাঁজকরা) কাগজখণ্ডকে প্রেসের পরিভাষায় বলা হইবে ডবল ক্রাউন ষোল পেজী ১ ফর্মা।

(এক রীম কাগজ বলিতে পাঁচ-শ তা কাগজ বুঝায়। সুতরাং এক রীম কাগজে ডবল ক্রাউন ষোল-পেজী ফর্মার সংখ্যা হইবে এক হাজার।)

বইয়ের বাজারে ডবল ক্রাউন ষোল-পেজী আকারটাই সর্বাধিক প্রচলিত। অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকই এই আকারে ছাপা। এই আকারের অতি পরিচিত একটি বই আমার হাতের কাছে আছে—শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর চলন্তিকা, ষষ্ঠ সংস্করণ। ইহার আরম্ভ হইতে শেষ পযন্ত—পরিশিষ্ট ধরিয়া—৬৮০ পৃষ্ঠা। এতদ্ব্যতীত টাইটেল, সূচী ও সংকেতে ৸০ অর্থাৎ আরও ১২ পৃষ্ঠা, মোট ৬৯২ পৃষ্ঠা। প্রকাশক ও ছাপাখানার পরিভাষায় উহার আয়তনের সংকেত—ডবল ক্রাউন ষোল-পেজী সওয়া তেতাল্লিশ ফর্মা। ডবল ক্রাউন ষোল-পেজী বইয়ের পৃষ্ঠার আকার ৭½×৫" হওয়ার কথা কিন্তু বাঁধাইবার সময় তিন পাশ ছাঁটিয়া দেওয়া হয় বলিয়া মাপটা একটু কমিয়া যায়। আমার এই বইখানির পৃষ্ঠার আকার ৭"×৪⅞"। সকল আকারের বইই কাটার দরুন একটু ছোট হইয়া যায়।

ইম্পিরিয়াল ষোল-পেজী আকারের বইয়ের প্রচলনও কম নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত আই. এ.-বি.এ-র পাঠ্য বইগুলি প্রায় সবই ঐ আকারে ছাপা।

রয়াল আট-পেজী সাইজের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রবীন্দ্র-রচনাবলী। ডিমাই সাইজের অন্তত একখানি বই সকল শিক্ষিত বাঙালীর ঘরে থাকার কথা, রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা।

এখন আপনার বইয়ের ফর্মা হিসাব করিতে হইবে। বইয়ের দাম নির্ভর করে বইয়ের আকারের উপর, আপনার পারিশ্রমিকও। আপনার ১০০ পৃষ্ঠার হস্তলিখিত কাপি মুদ্রিত হইলে কত পৃষ্ঠা হইবে তাহা হিসাব করিয়া ফেলা যায়। এ হিসাব অবশ্য আনুমানিক, শতকরা পাঁচ ছয় পাতার তফাত হইতে পারে। কাপি যত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইবে এবং সংশোধন সংযোজন যত অল্প থাকিবে হিসাব ততই নিখুঁত হইবে। বাংলাদেশে অন্তত এমন একজন লেখক আছেন যিনি নিজের কাপি ধরিয়া কাগজের অর্ডার দেন। বই

ছাপা হইলে দেখা যায় এক দিস্তা কাগজও কম বেশী হয় নাই। লেখা যাঁহাদের পেশা তাঁহাদের বলি, রাজশেখর বসু মহাশয়ের কোনো রচনার প্রেস কাপি দেখিবার যদি সুযোগ পান তো তাহা যেন না ছাড়েন।

ফর্মা হিসাবের মোটামুটি নিয়ম এই : কয়েকটি পৃষ্ঠার প্রথম দশ লাইনের শব্দসংখ্যা গুনিয়া ফেলুন। মনে করুন, ৭ম পৃষ্ঠার প্রথম দশ লাইনের শব্দসংখ্যা গুনিয়া দেখা গেল ৮২। ১০৭এর পৃষ্ঠার প্রথম দশ লাইনের শব্দসংখ্যা হইল ৭৮। ঐরূপ ২০৭ পৃষ্ঠায় গুনিলেন, শব্দসংখ্যা হইল ৮০। তাহা হইলে তিরিশ লাইনের মোট শব্দসংখ্যা পাইলেন ৮২+৭৮+৮০=২৪০, ইহাকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে লাইন পিছু শব্দসংখ্যাব হার হইল ৮। পূর্বেই বলা হইয়াছে আপনার কাপির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭০০ এবং পৃষ্ঠাপ্রতি লাইনের সংখ্যা ২০। কাজেই সম্পূর্ণ কাপির শব্দসংখ্যা হইবে ৭০০×২০×৮=১১২০০০। এই সংখ্যাটি আপনার কাপির বস্তু-পরিমাণের পরিচায়ক।

এখন ১১২০০০ শব্দের কাপি হইতে নানা আকারের এবং বিভিন্ন পৃষ্ঠাসংখ্যার বই হইতে পারে। পৃষ্ঠার আকার, টাইপের আকার, পৃষ্ঠাপ্রতি লাইনের সংখ্যা এবং লাইনের দৈর্ঘ্য—এই চারটি জিনিসের উপর বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা নির্ভর করে।

ধরিলাম, আপনার বইয়ের ফর্মার আকার হইবে ডবল ক্রাউন ষোল-পেজী এবং টাইপ ব্যবহার করিবেন পাইকা, আর ধরিয়া লইলাম প্রতি পৃষ্ঠায় লাইন ধরিবে ২০ এবং প্রতি লাইনে শব্দ ধরিবে গড়ে ৬। তাহা হইলে পৃষ্ঠাপ্রতি শব্দসংখ্যা হয় ২০×৬=১২০। ১১২০০০÷১২০=৯১৬ ভাগশেষের জন্য আরও ১, মোট ৯১৭ পৃষ্ঠা। ৯১৭কে ১৬ দিয়া ভাগ দিলে ভাগফল হয় ৫৮, ভাগশেষের জন্য ১—মোট ৫৯ ফর্মা।

আবার এক পৃষ্ঠায় স্মল পাইকা ২৯ লাইন এবং লাইনপিছু ১০টা শব্দ ধরাইয়া অনায়াসে ১১২০০০ শব্দকে ৩৮৭ পৃষ্ঠা অর্থাৎ ২৫ ফর্মার মধ্যে পুরিয়া দেওয়া যায়। আপনার বইটির আয়তন কয় ফর্মা হইবে তাহা কাপি দেখিয়াই নির্ণয় করা যাইবে। কিন্তু কাপি ভাল না হইলে নির্ণয় করা কঠিন। আপনি কাপির কিয়দংশ লিখিলেন ফুলস্ক্যাপ কাগজে, কিয়দংশ লিখলেন চিঠির প্যাডে আর কিছুটা লিখিলেন পুরাতন ডায়রির অব্যবহৃত পাতায়। কোনো

পাতায় লেখা হইল ১৭ লাইন, কোনটায় হইল ৫৭। কোনো লাইনের দৈর্ঘ্য হইল তিন ইঞ্চি, কোনোটার আট।—এ অবস্থায় শব্দসংখ্যা গণনা করিতে হইলে প্রত্যেক পৃষ্ঠার শব্দ গুনিয়া যাইতে হইবে। সেটা সহজ কাজ নয়।

পৃষ্ঠা গণনার এই যে গাণিতিক নিয়মের কথা বলিলাম ইহাও সম্পূর্ণ ত্রুটিশূন্য নয়। পরিচ্ছেদের গোড়ায় ও শেষে দুই চারি লাইন করিয়া ফাঁক পড়া স্বাভাবিক। আবার যে পৃষ্ঠায় এক পরিচ্ছেদ শেষ হইল সে-পৃষ্ঠায় অন্য পরিচ্ছেদ আরম্ভ না হইলে আরও অনেক ফাঁক থাকিয়া যাইবে। সে ক্ষেত্রে পৃষ্ঠাসংখ্যা হিসাবের উপর আরও কিছু বাড়িবে। তাহাতে তারতম্য খুব বেশী না হইতে পারে, কিন্তু চেষ্টা করিলে তারতম্যের পরিমাণ অনেক কমানো সম্ভব।

গ্রন্থকারের মাথায় যদি স্বহস্তে বই ছাপাইবার খেয়াল চাপে তাহা হইলে অদৃষ্ট ও অনুমানের উপর কিছুমাত্র নির্ভর করা উচিত হইবে না। লোকসান করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া কতগুলি টাকা তিনি বিনিয়োগ করিতে প্রস্তুত, প্রথমেই তাহার নিখুঁত হিসাবটি করিয়া লওয়া ভাল। তাঁহাদের বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে বলি টাইটেল, হাফ টাইটেল, ভূমিকা, মুখবন্ধ, সূচীপত্র (বাংলা উপন্যাসে অনেক সময় সূচীপত্র দেওয়া হয় না) এবং শেষের দিকে গ্রন্থকারের পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থের বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্রাদি হইতে উদ্ধৃত সমালোচনা প্রভৃতিতে আরও ফর্মাখানেক লাগিয়া যাইতে পারে। একটু হিসাব করিয়া চলিলে এই অংশটা কমাইয়া আধ ফর্মাতেও ধরাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু সে অংশের কাপিও আগে হইতেই প্রস্তুত করিতে হইবে।

প্রেসে পাঠাইবার পূর্বে কাপিটা অন্তত দুইবার মন দিয়া পড়া উচিত। দুইচার লাইনে যোগবিয়োগ করিবার থাকিলে কাপিতেই তাহা করিয়া লওয়া আবশ্যক। প্রথম পাঠের সময় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পড়িতে হইবে। দ্বিতীয় পাঠের সময় বানান, ছেদচিহ্ন, প্যারাবিভাগ, পরিচ্ছেদবিভাগ, পরিচ্ছেদের শিরোনাম প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। প্রুফের জন্য ইহার কিছুই ফেলিয়া রাখা উচিত নয়। কোনো উদ্ধৃতি অথবা অন্য কোনো অংশ ইনডেণ্ট (indent) করিবার থাকিলে—অর্থাৎ বাম দিকের মার্জিনের পরিমাণ কিছু বেশী রাখিবার প্রয়োজন হইলে—এবং কোনো অংশে বিশেষ কোনো ধরনের টাইপ দিবার ইচ্ছা থাকিলে তাহাও কাপিতে চিহ্নিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ইনডেণ্ট করার অর্থ কি এই প্যারাটি দেখিলে তাহা বুঝা যাইবে। এই প্যারাটি যে টাইপে ছাপা তাহার নাম 'বর্জাইস্'। সমগ্র বই 'স্মলপাইকা' টাইপে ছাপা।

যাঁহারা 'উচিৎ, প্রজ্জ্বলিত, মূহুর্ত্ত, সুধি, পৌরহিত্য' লিখেন অর্থাৎ বানান না জানার জন্য ভুল করেন, তাঁহাদের পক্ষে কাপিটা একবার আর কাহাকেও দিয়া দেখাইয়া লওয়া উচিত। যাঁহারা র স্থানে ড ও ড় স্থানে র লিখিতে অভ্যস্ত আর যাঁহারা চন্দ্রবিন্দুর স্থানাস্থান বিচার করিতে অক্ষম তাঁহাদেরও কাপিটা কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা পড়াইয়া লওয়া ভাল।

কেহ কেহ শুদ্ধ বানানের একাধিক রূপ ব্যবহার করেন। বাড়ি বাড়ী, গাড়ী গাড়ি, রাণী রানী, সরবত শরবত শরবৎ, জিনিস জিনিষ, কর্ত্তব্য কর্তব্য, প্রভৃতি বিকল্প রূপের ব্যবহার একই লেখকের লেখায় অনেক সময় দেখা যায়। তাঁহাদের পক্ষে প্রথমেই একটা বানান ঠিক করিয়া লইয়া সর্বত্রই সেই বানান অনুসৃত হইয়াছে কিনা দ্বিতীয় পাঠের সময় তাহা মনঃসংযোগ করিয়া দেখা আবশ্যক। কাপিতে সব কয়টি ছেদচিহ্ন বিশেষ অবধান সহকারে লেখা উচিত। নহিলে হাইফেনটা ড্যাশ হইয়া ছাপা হইবে, ড্যাশ হইয়া যাইবে হাইফেন; আপনি কোলন চিহ্ন দিতে চান, কিন্তু ফুটকিগুলা শূন্যের মত লিখিয়াছেন, কম্পোজিটার বিসর্গ বসাইয়া দিল। আপনার ইচ্ছা বিস্ময়চিহ্ন দেওয়ার কিন্তু আপনি দাঁড়ির নীচে বিন্দুটা খেয়াল করিয়া দিলেন না, কাজেই তাহা দাঁড়ি হইয়া ছাপা হইয়া গেল।

দুই শব্দের মধ্যে কোথায় ফাঁক থাকবে, আর কোথায় বা দুই শব্দ একেবারে গায়ে গায়ে বসিবে তাহা গ্রন্থকার দ্বিতীয় পাঠের সময়ই কাপিতে ঠিক আছে কি না দেখিবেন; না থাকিলে ঠিক করিয়া দিবেন। একবার দোল-দুর্গোৎসব একবার দোল দুর্গোৎসব আর একবার দোলদুর্গোৎসব লেখা উচিত নয়।

প্রুফে ভুল সংশোধন হয় সত্য, কিন্তু অনেক ভুল থাকিয়া যায়। অধিকাংশ বাঙ্গলা ছাপাখানায় ভাল প্রুফরীডার নাই। প্রুফ দেখার দায়িত্ব সাধারণত অশিক্ষিতপটু লেখকের উপরেই বর্তায়। তিনি নিজের বই ছাড়া অন্য কোনো বইয়ের প্রুফ কখনও দেখেন নাই। প্রুফ দেখায় ঐ অভিজ্ঞতা লইয়া তিনি যে প্রুফ দেখিবেন তাহাতে ভুল থাকিয়া গেলে তাঁহাকে দোষ দিব কি করিয়া?

ঠিকা প্রুফরীডার দিয়া যে প্রুফ দেখানো হয় তাহাতে "সর্ব্ব সত্ত্ব সংরক্ষিত" না হইয়া পারে না। তাঁহারাই "রামলক্ষ্মণৌ ভবতঃ" থাকিলে "রামলক্ষ্মণৌ ভবতঃ" করিয়া দেন। 'সকল কারণ তুমি তুমি সে কারণ' যখন ছাপা হয় 'সবল

কাবল ভুবি ভুষি সে কাবল', তখন দোষ দিব কাহার ? দোষ কি শুধু লেখকের হস্তাক্ষরের ? প্রুফরীডারও অংশতঃ দায়ী বই কি ?

আর একটি কথা, কাপির সহিত সর্বদাই একটি নির্দেশপত্র দেওয়া ভাল। মুদ্রণ সম্পর্কে লেখকের যদি কোনো বিশেষ বক্তব্য থাকে তাহা ঐ নির্দেশপত্রে লিখিয়া দিবেন।

ধরুন, আপনার ইচ্ছা আপনি পুস্তকের সর্বত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানান প্রয়োগ করিতে চান। ঐ নির্দেশপত্রে সে কথা লিখিয়া দিন। কাপিতে বানানে সর্বত্র সংগতি না থাকিলেও ভাল প্রেস আপনার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিবার চেষ্টা করিবে। মনে করুন প্রত্যেক পরিচ্ছেদের প্রথম অক্ষরটি আপনি বড় অক্ষরে বা মোটা অক্ষরে ছাপিতে চান; অথবা আপনার ইচ্ছা হইল পুস্তকের পৃষ্ঠাঙ্ক উপরে না দিয়া পৃষ্ঠার নীচে দিবেন। কিংবা আপনি ইচ্ছা করিলেন পৃষ্ঠার উপরের মার্জিন অপেক্ষা নীচের মার্জিন বেশী রাখিবেন। নির্দেশপত্রে সে কথা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিলে প্রেসের অনেক হাঙ্গামা বাঁচিয়া যায়, আপনিও অনেক নিবাষ বিরক্তির হাত হইতে রক্ষা পান।

প্রেস কাপি—তা সে বইয়ের কাপিই হউক অথবা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরণীয় গল্প প্রবন্ধের কাপিই হউক—সর্বদাই সাবধানে প্রস্তুত করা আবশ্যক। আপনি কি চান তাহা নিজের মনে-মনেই আগে ঠিক করিয়া লউন। ইংরাজী-বাংলা দেশী-বিদেশী পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকা আজকাল কত যে ছাপা হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সেগুলির পাতা উল্টাইয়া দেখিলেই আপনার মনে একটা সুস্পষ্ট ধারণার উদয় হইবে, এইগুলিই আপনার দিগ্‌দর্শনের সহায়ক হইবে।

কাপির কাজ শেষ হইলে আরম্ভ হইবে প্রুফ দেখার কাজ। কিন্তু তাহার এখনও বিলম্ব আছে। ইতিমধ্যে কম্পোজিটারের কাজ চলিতে থাকুক।

অবেস্তা

প্রাচীন পারসীকগণের ধর্মগ্রন্থের নাম অবেস্তা। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ঐ ধর্মগ্রন্থের ভাষাকে 'জেন্দ' বলিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ঐ ভাষাকে 'জেন্দ' বলিলে ভুল হয়। পারসীক পণ্ডিতগণ ঐ অর্থে সাধারণতঃ জেন্দ শব্দের প্রয়োগ করেন না।

প্রকৃতপক্ষে অবেস্তাগ্রন্থের যে ভাষা তাহার কোনো নির্দিষ্ট নাম পাওয়া যায় না। জেন্দ শব্দটি কেবল পহ্লবী টীকা টিপ্পনী ও অনুবাদ অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। পারসীক কোনো ধর্মপুস্তকেই 'জেন্দ' শব্দটির দ্বারা অবেস্তার ভাষাকে লক্ষ্য করা হয় নাই। অবেস্তা শব্দটি প্রাচীন ভাষায় লিখিত ধর্ম-শাস্ত্রকেই বুঝায়। কোন স্থানেই শুধু ভাষা বুঝাইতে অবেস্তা শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। অবেস্তার ভাষার কোনো নির্ধারিত নাম না পাওয়ায় বর্তমান কালের পণ্ডিতগণ অবেস্তা শব্দটিকে অবেস্তার ভাষা অর্থেও ব্যবহার করিতেছেন। ইহাতে অবেস্তা শব্দটির অর্থ আরও ব্যাপক হইয়াছে। জেন্দ শব্দের দ্বারা যে পহ্লবী ভাষার প্রতি নির্দেশ করা হয় প্রাচীন অবেস্তার ভাষার সহিত তাহার সম্বন্ধ বিশেষ ঘনিষ্ঠ নয় বলিয়া অবেস্তা ভাষা বুঝাইতে জেন্দ শব্দের প্রয়োগকে একটি অপপ্রয়োগ বলা যাইতে পারে। সুতরাং অবেস্তা শাস্ত্র বা অবেস্তা ভাষা উভয়ের কোনোটিরই প্রতিশব্দ জেন্দ হইতে পারে না।

কেহ কেহ ঐ প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকে 'জেন্দ অবেস্তা' এই নামেও সাধারণভাবে অভিহিত করেন। কিন্তু এই নামকরণও নির্দোষ নহে। পহ্লবী ভাষায় 'অবিস্তক ব-জন্দ' এই কথাটির বিশেষ প্রচলন আছে। ইহার অর্থ অবেস্তা ও তাহার টীকা টিপ্পনী। জেন্দ অবেস্তা এই নামটি পহ্লবী 'অবিস্তক-ব-জন্দ' ইহারই অনুবাদ, সুতরাং কেবলমাত্র ধর্মশাস্ত্র অর্থে ইহার ব্যবহার সংগত নয়।

অবেস্তা ভাষা।—অবেস্তার ভাষা অতি প্রাচীন। ইহার কোনো কোনো অংশ ঋগ্বেদের সমকালীন এবং কোনো অংশ তৎপরবর্তীকালের। ঋগ্বেদের ভাষা ও অবেস্তার ভাষার মধ্যে একটি সুপরিস্ফুট সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়, যদিচ ইহাদের প্রত্যেকটিরই একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। উভয় ভাষার মধ্যে প্রধান

বিভেদ ব্যাকরণে নয়; উহাদের স্বাতন্ত্র্য মূলতঃ ধ্বনিগত। ধ্বনিতত্ত্বের কয়েকটি নিয়ম প্রয়োগ করিলে স্বচ্ছন্দে যে কোন সংস্কৃত শব্দকে অবেস্তায় পরিণত করা যায় এবং অবেস্তা শব্দকেও ঐভাবে সংস্কৃত রূপ দেওয়া যায়। যথা,—

অবেস্তা	সংস্কৃত	অর্থ
জন্তারেম্	হন্তারম্	আঘাতকারী
অরেজইতি	অর্হতি	উপযুক্ত
বৱৎ	অভবৎ	হইয়াছিল
হকেরেৎ	সকৃৎ	একবার
পন্তানেম্	পন্থানম্	পথ
উশ্ত্রেম্	উষ্ট্রম্	উষ্ট্র
হইথ্যো	সত্যঃ	সত্য
ফ্র	প্র	পূর্ব
চরইতি	চরতি	বিচরণ করিতেছে
হ্বফ্নেম্	স্বপ্নম্	নিদ্রা
কতারো	কতরঃ	দুজনের মধ্যে কে
গরেমো	ঘর্মঃ	গরম
হউর্বম্	সর্বম্	সমগ্র
তউরুনেম্	তরুণম্	তরুণ
অইর্য়ো	আর্যঃ	আর্য

অবেস্তার বর্ণমালা —অবেস্তার ভাষা ও বর্ণমালা সমকালীন নহে। ভাষা অপেক্ষা বর্ণমালা অনেক আধুনিক। সাসানীয় বংশের রাজত্বকালে এই ধর্মগ্রন্থটি সংগৃহীত এবং সম্পাদিত হইয়া লিখিত হয়। সুতরাং যে অক্ষরে তখন অবেস্তা লিখিত হইয়াছিল তাহার সহিত সাসানীয় পহ্লবীর বর্ণমালার যোগ সহজেই অনুমান করা যায়। ফারসী ও উর্দুর মত অবেস্তা ভাষা দক্ষিণ হইতে বামদিকে পঠিত হয়। অবেস্তার আদি বর্ণমালা কিরূপ ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

অবেস্তার ভাষা আদ্যন্ত সমান নয়। ইহার কিয়দংশ প্রাচীন এবং অধিকাংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। প্রাচীনতম অংশের নাম 'গাথা'। এই 'গাথা'গুলিই

জরথুশ্‌ত্রের বাণী বলিয়া পরিচিত। বৈদিক সংস্কৃতের সহিত লৌকিক সংস্কৃতের যে সম্বন্ধ, গাথার ভাষার সহিত অপেক্ষাকৃত নূতন অবেস্তার সম্বন্ধ ঠিক সেইরূপ। শুধু নূতন পুরাতন বলিয়াই ঐ দুই ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা নহে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কথিত হইবার জন্যও উভয়ের আকৃতি ভিন্ন হইতে পারে। অবেস্তার প্রাচীন অংশগুলির মধ্যে ভ্রম প্রমাদ একরূপ দেখা যায় না। ছন্দোবদ্ধ অংশগুলি সম্পূর্ণ নির্দোষ বলা যায়। ত্রুটি যদি কিছু ঘটিয়া থাকে তো তাহা লেখকের দোষ।

অবেস্তা শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। Anquetil Duperron এর মতে সংস্কৃত বচ্‌ ধাতু হইতে এই শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। জার্মান পণ্ডিত Muller বলেন, অব + স্থা হইতে অবেস্তা শব্দের উৎপত্তি। Haugh বলেন, বিদ্‌ ধাতু হইতে অবেস্তা শব্দের ব্যুৎপত্তি হওয়া সম্ভব। তিনি এইরূপ ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করেন :—আ + বিদ্‌ + ত + আ = আবিত্তা। সংস্কৃত 'ত্ত' অবেস্তায় 'স্ত' হইয়া যায়। এইরূপে সংস্কৃত 'আবিত্তা, প্রথমে আবিস্তা হইয়া পরে অবেস্তা হইয়াছে। জনৈক ফরাসী পণ্ডিত পজন্দ ভাষার 'অবস্তা' শব্দকে অবেস্তারই রূপান্তর বলিয়া মনে করেন। অবেস্তা ভাষায় 'অ ফ্‌ স্ম' এই শব্দটি শ্লোক অর্থে ব্যবহৃত হয় দেখিয়া Spiegel মনে করেন 'অ ফ্‌ স্ম' হইতেই অবেস্তা শব্দের ব্যুৎপত্তি। নেরয়োসিঙ্ঘ নামক জনৈক পণ্ডিত অবেস্তার সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহার মতে অবেস্তা শব্দের অর্থ নির্মল শ্রুতি। তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করেন, "অবস্তা ইতি অবেজস্তা, অবেজস্তা ইতি নির্মল শ্রুতিরিত্যর্থঃ।' এস্থলে বলা আবশ্যক যে অবেস্তা শব্দের পাঠান্তর 'অবস্তা' পারসীদের রচনায় দেখা যায়। দস্তুর কৈকোবাদের মতে সংস্কৃত অভ্যস্ত শব্দটি অবেস্তা হইতে আগত। অবেস্তা ধর্মগ্রন্থে অইব্যাস্ত এই শব্দটি অধীত বা অভ্যস্ত অর্থে পাওয়া যায়। এই অইব্যাস্ত শব্দ হইতে অবেস্তা শব্দটি আসিয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন। অইব্যাস্ত শব্দটি সংস্কৃত ক্ত প্রত্যয়ান্ত অভ্যস্ত শব্দের অনুরূপ হইলেও বিশেষ্যরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। তখন ইহার অর্থ হইবে যাহা অধ্যয়ন বা অভ্যাস করা যায় এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত 'শ্রুত' শব্দটি তুলনীয়। সাসানীয় যুগের পহ্লবী ভাষায় 'অবিস্তাক' শব্দটি 'জ্ঞান' 'জ্ঞানের পুস্তক' এইরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইত। তদনন্তর

উহার অর্থ প্রসারলাভ করিয়া 'মূল ধর্মপুস্তক' 'শাস্ত্র' 'বিধান গ্রন্থ' প্রভৃতি বুঝায়। ঐ 'অবিস্তাক' শব্দ হইতেই অবেস্তা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে ইহাও অনেক পণ্ডিতের মত।

জরথুশ্ত্রীয় ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ এই অবেস্তা। ইরানের পুরাতন ধর্ম-বিশ্বাস তদানীন্তন রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার এ সকলের পরিচয় এই প্রাচীন গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়, এই জন্যই ইহা আমাদের নিকট এত মূল্যবান্। এই ধর্মপুস্তকের জন্মস্থান ইরান। জরথুশ্ত্রীয় ধর্ম একদিন সমগ্র ইরানের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের আক্রমণে ইহার প্রভূত ক্ষতি হয় এবং অনেক ধর্মগ্রন্থ নষ্ট হইয়া যায়। তাহার পরেও এই ধর্ম আবার মাথা তুলিয়া পূর্ব গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল এমন সময় মুসলমানগণ পারস্য আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণই পারসীক ধর্মের সর্বনাশ করিল। অত্যাচারে অবিচারে পারসীকগণ ক্রমশঃ নিজেদের ধর্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল এবং ধীরে ধীরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। যে ধর্মের নামে একদিন সমস্ত ইরান মস্তক নত করিত আজ মাত্র ৯০,০০০ নব্বই হাজার লোক লইয়া সেই ধর্ম কোন রকমে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছে। মুসলমান আক্রমণে শুধু যে জরথুশ্ত্রীয় ধর্মের ক্ষতি করিয়াছে তাহা নহে এই অভিযানের ফলে ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহারও অধিকাংশ বিনষ্ট হইয়া গেল। বর্তমানে আমরা অবেস্তার যেটুকু পাই তাহা মূল অবেস্তার এক-চতুর্থাংশও হয় কিনা সন্দেহ।

প্রাচীন লেখকদের গ্রন্থাদি হইতে বেশ ধারণা করা যায় যে মূল অবেস্তা বর্তমান গ্রন্থ অপেক্ষা অনেক বৃহৎ ছিল। দিনকর্দ নামক প্রাচীন পহ্লবীপুস্তক হইতে জানা যায় যে, মূল অবেস্তা একুশ খণ্ডে বিভক্ত ছিল। আলেকজাণ্ডার এবং মুসলমান আক্রমণের পর যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা অতি সামান্য।

প্রাচীন অবেস্তার যে একুশটি খণ্ড ছিল এই খণ্ডগুলিকে নস্ক্ নামে অভিহিত করা হইত। প্রত্যেকটি নস্কের বিষয় অনুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ নাম ছিল। নিম্নে নস্ক্গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

১। সু দ্ ক র। ইহার অর্থ মাঙ্গল্যবিধান। ঈশ্বরের আরাধনা, পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান, ধর্ম-সাধন, জ্ঞাতি ও আত্মীয়বর্গের মধ্যে সংযোগ স্থাপন প্রভৃতি

সম্পর্কে মানবজাতির প্রতি উপদেশ এই খণ্ডের বিষয়বস্তু। এই খণ্ড দ্বাবিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত।

২। বর্‌শ্‌তমন্‌সর। ইহার অর্থ শুভমন্ত্র। মনোযোগ, ঐকান্তিকতা এবং সশ্রদ্ধ বিশ্বাসের সহিত স্বীয় ধর্ম পালনের উপকারিতা কি, জরথুশ্‌ত্রের মহিমা কীর্তন এবং তাঁহার উদ্দেশে স্তবস্তুতি করিলে কি ফল লাভ হয়, জরথুশ্‌ত্রের আবির্ভাবের প্রাক্কালে কোন কোন ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং ভবিষ্যৎ-কালে কি কি ঘটনা ঘটিবে এইরূপ নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা এই খণ্ডে স্থান পাইয়াছে। বর্‌শ্‌তমন্‌সরের অধ্যায়-সংখ্যা বাইশ।

৩। বকো। মজ্‌দা ধর্মের বিবরণ, অহুরমজদার বাণী, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস এবং বিচার-বিবেচনার সহিত ধর্ম পালন, বিচারকের কর্তব্য, মারের আক্রমণ হইতে মানবের আত্মরক্ষা, আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনায় এই খণ্ড পূর্ণ ছিল। এই খণ্ডের একুশটি অধ্যায়।

৪। দামদাদ। আত্মা স্বর্গলোকে, সদসৎ, পার্থিব জগৎ, ভূমি, আকাশ, জল, অহুরমজদার সৃষ্ট যাবতীয় পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ মানুষ বৃক্ষলতা প্রভৃতির বিবরণ, পরলোকের কথা, চিন্বদ সেতু, পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার এবং আরও নানা বিষয়ের বর্ণনা এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই খণ্ডের অধ্যায় সংখ্যা বত্রিশ।

৫। নদার। এই খণ্ডে গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, তারকা, উহাদের গতিপথ, কক্ষ, গ্রহাদির শুভাশুভ ফল প্রভৃতির বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল। এই খণ্ডের অধ্যায়সংখ্যা পঁয়ত্রিশ।

৬। পাজক। মেষাদি চতুষ্পদ জীবকে কিরূপে বধ করা উচিত, কোন্ কোন্ জীবের মাংস খাদ্যের পক্ষে উপযোগী, কোন্ কোন্ জীবের মাংস ভক্ষণ করা বিধানবহির্ভূত, পুরোহিত এবং ধার্মিক ব্যক্তিদের কিরূপ দান করা উচিত, ধর্মশীল আত্মীয়কে বস্ত্রাদি দানের কি ফল এই সকল বিষয়ে এই খণ্ড পূর্ণ। পাজকের অধ্যায়-সংখ্যা বাইশ।

৭। রতোশ্‌তাঈতী। রাজসেবা, অধীন কর্মচারীকে আদেশ দান, রাজাজ্ঞাপালন, পুরোহিত এবং বিচারকের আদেশ পালন, রাজ্য ও নগরাদি রক্ষার কৌশল, অহুরমজ্‌দা ও অহ্‌রিমনের সৃষ্ট যাবতীয় জীবজন্তুর পরিচয়,

নদ নদী পর্বত সমুদ্র প্রভৃতির পরিচয় এবং আরও অনেক বিষয় এই খণ্ডে লিপিবদ্ধ ছিল। ইহার পঞ্চাশটি অধ্যায় ছিল।

৮। ব রি শ। নৃপতিবর্গের রাজ্যশাসনপ্রণালী, ধর্মোপদেষ্টৃগণের বিধি ব্যবস্থা, লোকরক্ষা, নগরনগরীর উন্নতিসাধন, মিথ্যাবাদী ও অধর্মচারীর বিবরণ এইরূপ নানাবিধ বিষয় এই বরিশ নামক নস্কে সন্নিবেশিত ছিল। এই নস্ক্ ষাট অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ছিল, কিন্তু আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পর মাত্র বারটি অধ্যায়ের অধিক অবশিষ্ট ছিল না।

৯। ক শ্ কী স্রো বো। এই নস্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ছিল: প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির কথা, সন্তান জন্মের কারণ, শুদ্ধিচর্যা, সত্যকথন, মানব-জাতিকে অশুচিতা ও পাপের পথ হইতে শুচিতা ও পুণ্যের পথে পরিচালন, রাজসন্নিহিত ব্যক্তির উন্নতি, রাজা ও স্বজনের নিকটে মিথ্যা কথনের কারণ ইত্যাদি। এই নস্কের ষাটটি অধ্যায়ের মধ্যে আলেকজাণ্ডারের অভিযানের পর মাত্র পনেরটি অবশিষ্ট ছিল।

১০। বি শ্ তা স্প্-স স্ তো। গুশ্তাস্পের রাজত্বের বিবরণ, জরথুশ্ত্র স্পিতম যে অহুরমজ্দার নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিয়া তাঁহা ই আদেশে প্রথম মজ্দা ধর্ম প্রচার করেন এবং গুশ্তাস্পের চেষ্টায় এই ধর্ম পৃথিবীতে প্রচলিত হয়, এই সকলের ইতিহাস এবং আরও নানাবিধ বিষয় এই নস্কের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মূল বিশ্তাস্প্-স স্তো নস্ক ষাট অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পর দশটি মাত্র অবশিষ্ট ছিল।

১১। ব শ্ তি বা দা দ ক। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিবরণ ছিল: অহুরমজ্দার মাহাত্ম্য উপলব্ধি, জরথুশ্ত্রীয় ধর্মসম্বন্ধে সংশয় দূরীকরণ, ধর্মনির্দিষ্ট সর্ববিধ পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান, পাপাচরণ হইতে বিরতি, রাজার আদেশ পালন, রাজার বৃত্তি গ্রহণ এবং নৃপতির নিকট হইতে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা, ঋণদান, পাপপুণ্য, সৃষ্টিতত্ত্ব, কৃষিকর্ম, মনুষ্য ও গোমহিষাদির শক্তির উৎস, ধার্মিক ব্যক্তির প্রতি বিনয়, মানুষের শ্রেণী বিভাগ—বিভাগ চারিটি যথা—(ক) রাজা, পুরোহিত, বিচারক প্রভৃতি জ্ঞানিগণ (খ) অস্ত্রশস্ত্রাদির দ্বারা যাহারা শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করে (গ) কৃষিজীবী (ঘ) বুদ্ধিজীবী ব্যবসায়ী।

উল্লিখিত বিষয়গুলি ব্যতীত ঐরূপ আরও নানাবিধ বিষয় উহাতে সন্নিবেশিত ছিল। মূল নস্কটি বাইশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ছিল। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পর ছয়টির অধিক পাওয়া যায় নাই।

১২। চিদ্রশ্তো। ইহাতে মোটামুটি এইগুলি আছে: মানবের জন্মতত্ত্ব, কত শিশু মৃত অবস্থাতেই জন্মগ্রহণ করে, যাহারা জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় তাহাদের কতগুলি বাঁচিয়া থাকিবে, ইহাদের মধ্যে কে রাজা বা পুরোহিত হইবে, কে মহাপুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইবে, কে নগণ্য অবস্থায় জীবন কাটাইবে, মানবজীবনে এইরূপ পার্থক্য ঘটে কেন।—এই নস্ক বাইশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ।

১৩। স্পেন্দ্। এই নস্কে জরথুশ্ত্রের জন্মকাল হইতে দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবনবৃত্তান্ত, নানাবিধ ধর্মোপদেশ এবং নস্ক-মাহাত্ম্য বর্ণিত ছিল। মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, যে ধর্মযাজক এই নস্ক কণ্ঠস্থ করিয়া অনবরত পাঠ করিবে তাহার নিজের অথবা তাহার যজমানের সকল প্রকার বাসনা সিদ্ধ হইবে। স্পেন্দ্ নস্কের ষাটটি অধ্যায়।

১৪। বগান যস্তো। অহুরমজ্দার বিবরণ, তাহার মাহাত্ম্য, উপাসনার উপযুক্ত কাল, উপাসনার বিধি, অহুরমজ্দার নিকট হইতে বরলাভ, অমেশ স্পেন্দের আবির্ভাব প্রভৃতি নানা বিষয় এই নস্কে লিপিবদ্ধ ছিল। অহুরমজ্দা শিক্ষা, সত্য, শ্রী, জ্ঞান প্রভৃতির অধিষ্ঠাতারূপে ছয়টি দেবতা সৃষ্টি করেন। তাহাদের নাম অমেশস্পেন্দ। এক কথায় এই নস্কটিকে অহুরমজ্দা এবং অমেশ স্পেন্দের স্তবগাথা বলা যাইতে পারে। ইহার সতেরটি অধ্যায়।

১৫। নীকাদুম। ধন সঞ্চয়, হস্তের দ্বারা দৈর্ঘ্য এবং মুষ্টির দ্বারা পরিমাণ নির্ণয়, অহুরমজ্দার নির্দিষ্ট সর্বপ্রকার নির্দোষ ও নিষ্পাপ বিষয়, নরক হইতে ত্রাণ, পুণ্যাচরণ, মানুষের অন্তরে কি আছে এবং শরীরে কি আছে—এইরূপ নানাবিধ আলোচনায় এই নস্ক পূর্ণ। এই নস্কের অধ্যায় সংখ্যা চুয়ান্ন।

১৬। দুবাস্রূদ। কোন্ কোন্ সম্বন্ধস্থলে পুত্রকন্যার বিবাহ দেওয়া সংগত এই নস্কে সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা ছিল। এই নস্ক পঁয়ষট্টি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ।

১৭। হু স্ পা র ম্। ধর্মবিষয়ক উপদেশ, পাপীর শাস্তি, পুণ্যবানের পুরস্কার, সৎকর্মের অনুষ্ঠান, অসৎকর্মের নিষেধ এই সমস্ত বিষয় লইয়া এই অংশ রচিত। এই নস্ক্ পঁয়ষট্টি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ।

১৮। স কা দূ ম্। আদেশ দান এবং ক্ষমতা পরিচালনার প্রণালী, দৈত্য দানবগণের দুষ্কৃতি এবং ঐরূপ দুষ্কৃতকারীর পরিণাম—এই সমস্ত বিষয়ে এই নস্ক্ পূর্ণ। এই নস্কের অধ্যায়-সংখ্যা বাষট্টি।

১৯। বী কৃ দে ব্ দা দ্। শুদ্ধিতত্ত্বের আলোচনা, শুচি ও অশুচি নির্ণয়। মৃতদেহের অপবিত্রতা, শবের সৎকার প্রভৃতি নানা বিষয় এই খণ্ডে স্থান পাইয়াছে। ইহাই বেন্দিদাদ নামে খ্যাত। একুশটি নস্কের মধ্যে এই নস্কৃটি মাত্র সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে। অন্য যে কয়টি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের কোনটিই অখণ্ড নয়। ইহার বাইশটি অধ্যায় আছে। অন্যত্র এই নস্ক্ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

২০। হা দো খ তো। এই নস্ক্ ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিমাত্রেরই পঠনীয়। যে এই নস্ক্ আবৃত্তি করে অহ্রিমান (মার) তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে এবং সে অহুরমজ্দার নিকটবর্তী হয়। এই নস্ক্ ত্রিশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ।

২১। স্তু দ্ য স্তো। অহুরমজ্দার মাহাত্ম্য বর্ণন এবং তাঁহার স্তব স্তুতি এইসব লইয়াই এই নস্ক্ রচিত। ইহাতে বলা আছে যে, যে ধার্মিক ব্যক্তি এই নস্কৃটি টীকা সহিত আবৃত্তি করিবে অমেশস্পেন্দগণ তাহার নিকটে আবির্ভূত হইবে। ইহার তেত্রিশটি অধ্যায়।

মূল অবেস্তা একুশ নস্কে সম্পূর্ণ ছিল কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থের ধ্বংসশেষ যে অংশটুকু বর্তমানে আমরা দেখিতে পাইতেছি তাহা আদিগ্রন্থের তুলনায় অত্যন্ত অল্প। তাহার মধ্যেও কেবল একটি মাত্র নস্ক্ সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে বাকিগুলি খণ্ডাংশ মাত্র। বর্তমানে অবেস্তা বলিতে আমরা যতটুকু পাইয়াছি তাহাকে স্থূলতঃ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:

১। য শ্ ন
২। বী স্প র
৩। খোরদহ্ অবেস্তা এবং তদন্তর্গত যশ্ত্

৪। স্নাইশ, গাহ, প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনা
৫। বেন্দিদাদ অর্থাৎ আদি গ্রন্থের উনবিংশ নস্‌ক্
৬। হাদোখ্‌ত্‌ নস্‌ক্ প্রভৃতির খণ্ডিত অংশ

১। য শ্‌ ন। বর্তমান অবেস্তার যতগুলির অংশের কথা উল্লিখিত হইয়াছে যশ্‌নই তন্মধ্যে বৃহত্তম। অবেস্তায় যশ্‌ন শব্দের অনেক প্রয়োগ আছে। ইহার অর্থ;—অর্চনা, উপাসনা, স্তবস্তুতি ইত্যাদি। যশ্‌ন শব্দের সহিত সংস্কৃত যজ্ঞ শব্দের শুধু আকৃতিগত নয় ব্যুৎপত্তি- ও অর্থগত মিলও আছে। যশ্‌নের বাহাত্তরটি পরিচ্ছেদ। এই পরিচ্ছেদগুলিকে হাইতি (সংক্ষেপে হা) বলা হয়। হাইতি শব্দের অর্থ বিভাগ। এই হাইতির সংখ্যা অনুসারে পারসীকগণ বাহাত্তর গাছা সূত্রে নির্মিত উপবীত পরিধান করেন। হাইতিগুলিকে পারসীকগণ সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করেন। কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে এগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করাই শ্রেয়। প্রথম ১—২৭, দ্বিতীয় ২৮—৫৫, এবং তৃতীয় ৫৬—৭২। অবেস্তার প্রাচীনতম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা গাথা এই যশনের সতেরটি হাইতিতে সম্পূর্ণ। অনুষ্ঠানের সময় পুরোহিত যশ্‌ন পাঠ করেন।

২। বী স্প র দ্‌ বা বী স্পে রে দ্‌। বীস্পেরত্তবো (সংস্কৃত—বিশ্বে ঋতবঃ) এই শব্দ হইতে উপরিউক্ত শব্দটি আগত। সুতরাং বীস্পেরেদ্‌ শব্দের অর্থ সকলের প্রভু, অর্থাৎ সমস্ত জগতের যিনি অধিপতি তাঁহার উদ্দেশে এই অংশে স্তব করা হইয়াছে। বীস্পরদ্‌কে পৃথক্ একটি অংশ না বলিয়া যশ্‌নেরই পরিশিষ্ট বলিয়া ধরা বিধেয়। বীস্পরদকে স্বতন্ত্রভাবে পাঠ করা হয় না, যশ্‌ন আবৃত্তি করার পর এই অংশ আবৃত্তি করা হয়। বীস্পরদের পরিচ্ছেদগুলির নাম কর্দ। মূল অবেস্তায় এই শব্দটি ছিল করতি।

৩। খো র দ হ বা খু র দে অ বে স্তা কতকগুলি মন্ত্রের সমষ্টি। যশ্‌ত্‌ ইহারই অন্তর্গত। যশ্‌ত্‌ একুশটি শ্লোকে সম্পূর্ণ। যশ্‌ন্‌ এবং যশ্‌ত্‌ এই উভয় শব্দের সঙ্গেই সংস্কৃত যজ্‌ ধাতুর যোগ আছে। এবং ঐ দুই শব্দের অর্থও প্রায় সমান। যশ্‌ন সাধারণতঃ পুরোহিতগণ পাঠ করিয়া থাকেন কিন্তু যশ্‌ত্‌ গৃহস্থদের পাঠ্য। অহুরমজ্‌দা, অমেশস্পেন্দ অর্থাৎ অহুরমজ্‌দার অনুচর সপ্তদেব,

স্বর্গীয় দেব দেবতা, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদির স্তুতি এই অংশে স্থান পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহার মধ্যে অনেক প্রাচীন ইরানীয় আখ্যায়িকা পাওয়া যায়।

৪। ন্যাইশ, গাহ, সীরোজ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনাগুলি আর কিছুই নহে। এগুলি নিত্য অথবা নৈমিত্তিক আবৃত্তির জন্য রচিত কয়েকটি স্তব স্তোত মাত্র।

৫। বেন্দীদাদ (পহ্লবী বীকদেবদাদ মূল গ্রন্থের উনবিংশ নস্ক)। মূল শব্দটি হইতেছে বি দ এ ব দা ত অর্থাৎ দেববিরোধী বিধান। সংস্কৃত দেব শব্দের অর্থ অবেস্তায় 'দানব'। ইহাতে বাইশটি পরিচ্ছেদ আছে। এই পরিচ্ছেদগুলির নাম ফর্‌গদ্। বেন্দিদাদের কয়টি পরিচ্ছেদ এক সময়ের রচিত নয়। ইহার কতক অংশ বেশ পুরাতন এবং অনেক অংশ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের। ইহাতে সৃষ্টিতত্ত্ব, যমের উপাখ্যান, আচার, নিয়ম, শৌচাশৌচ, বিধি নিষেধ, শবস্পর্শ জনিত অশৌচ এবং তাহার প্রতিবিধান ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে। এককথায় বেন্দীদাদকে প্রাচীন ইরানের স্মৃতিশাস্ত্র বলা যায়।

৬। হাদোখ্‌ত্ নস্ক্ এবং অন্যান্য কয়েকটি নস্কের কতকগুলি খণ্ডিত রচনা। এই রচনাগুলি বেশ প্রাচীন। প্রাচীন অবেস্তার ইতিহাস প্রণয়নের উপাদান স্বরূপ এই নিতান্ত ক্ষুদ্র রচনাগুলিরও মূল্য সামান্য নহে।

প্রাচীনকালে জরথুশ্‌ত্র ধর্ম সম্বন্ধে লোকের কোনরকম সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। পাশ্চাত্ত্যদেশে এই ধর্মকে মগীদের ধর্ম বলিয়া বলা হইত। মগী শব্দের উল্লেখ বাইবেলেও দৃষ্ট হয়। গ্রীক্ লেখকদের বিবরণ হইতে জানা যায় যে জরথুশ্‌ত্রীয় ধর্মের পুরোহিতগণকে মগী বলা হইত। জরথুশ্‌ত্রীয় ধর্ম সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ দেখা যায় হেরোদোতাস এর বিবরণ। হেরোদোতাসের আবির্ভাব কাল খ্রীষ্ট পূর্ব ৪৫০ অব্দ। এতদ্ব্যতীত বহু পর্যটকের ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে জরথুশ্‌ত্রীয় ধর্মের খণ্ড খণ্ড বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু সে সকল যেমন অসম্পূর্ণ তেমনই অস্পষ্ট।

জরথুশ্‌ত্রীয় ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের ইতিহাস উদ্ধারে প্রথমে সুশৃঙ্খল ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করেন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ। অবেস্তা সম্বন্ধে আমরা

বর্তমানকালে যতটুকু জ্ঞানলাভ করিয়াছি তাহা কেবল ঐ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণেরই অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফলে।

Anquetil Duperron নামক জনৈক ফরাসী পণ্ডিত সর্বপ্রথম অবেস্তার ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদ পুস্তক ১৭৭১ সালে প্রকাশিত হয়। ইহার সত্তর বৎসর পূর্বে Hyde নামক জনৈক ইংরাজ পণ্ডিত ইরানের ধর্ম সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকখানিই Anqketil Duperron-এর মনে অবেস্তা ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগায় Anquetil Duperron ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী ফ্রান্স হইতে যাত্রা করিয়া ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে পণ্ডিচেরিতে পদার্পণ করেন এবং ঐ বৎসরই সুরাটে গিয়া দস্তুর দারাবের নিকট অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার অনুবাদগ্রন্থ বাহির হয়। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে Burnouf নামক আর একজন ফরাসী পণ্ডিত যশ্‌নের অনুবাদ ও টীকা টিপ্পনী প্রকাশিত করেন। Burnouf-এর সমসাময়িক পণ্ডিত Bopp ও অবেস্তা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার আলোচনার ধারা ছিল স্বতন্ত্র। ভাষাতত্ত্বের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি ছিল অধিক। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে Burnouf এর মৃত্যু হয়। তাহার অনতিকাল পরেই Westergaard কর্তৃক অবেস্তার সম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিছুদিনের মধ্যে প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত Spiegel বেন্দিদাদ বীস্পরদ এবং যশ্‌নের একটি সংস্করণ বাহির করেন। এই সংস্করণে পহ্লবী টীকা প্রদত্ত হইয়াছিল এবং সম্পূর্ণ অবেস্তার জার্মান অনুবাদও এই সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছিল। পহ্লবী অনুবাদসমূহের অধিকাংশই জনশ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই জনশ্রুতির মূল্য কতটুকু? একদল পণ্ডিত প্রাচীন জনশ্রুতির উপর অত্যধিক শ্রদ্ধা আরোপ করিলেন। Spiegel ও Justi এই দলের মধ্যে প্রধান। Harlez এবং Geiger এই মত কিছু কিছু সমর্থন করিলেন। Benfey ও Roth প্রমুখ পণ্ডিতগণ কিন্তু এই মত স্বীকার করিলেন না। Haug দ্বিতীয় দলের মতানুবর্তী ছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে আসিয়া এদেশীয় পণ্ডিতদের সহিত আলোচনা করিয়া তিনি মত পরিবর্তন করিলেন। তিনি বুঝিলেন ইরানীয় ধর্মশাস্ত্রের চর্চার সময় জনশ্রুতিকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। Haug-এর প্রবন্ধগুলি তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। Windischmann দুই দলের মধ্যবর্তী।

ইতিমধ্যে, ইতিপূর্বে এবং অতঃপর আরও অনেক পণ্ডিত এ বিষয়ের চর্চা ও অনুসন্ধান করিয়া নানা জটিল সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। প্রাচীন ইরানীয় ধর্মের ইতিহাস উদ্ধারে অক্লান্ত কর্মী ও বিদ্যানুরাগী পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের দান কেবল পারসীকগণ নহে বিশ্বের বিদ্বজ্জনমণ্ডলী চিরকাল ধরিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবেন।

—শেষ—